প্রবন্ধ

সংগীতচিন্তা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

2021

সূচিপত্র

- ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লিখিত 3
- জানকীনাথ বসুকে লিখিত 7
- অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তীকে লিখিত পত্র 8
- ‘ জনগণমনঅধিনায়ক’ 11
- সুধারানী সেনকে লিখিত 13
- সংযোজন 14
- সংগীত ও ভাব 54
- সংগীতের মুক্তি 67
- আমাদের সংগীত 90
- বাউল গান 94
- বিশ্ববিদ্যালয়ে সংগীতশিক্ষা 97
- শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে সংগীতের স্থান 103
- কথা ও সুর 110
- অভিভাষণ 113
- ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ 116
- নিখিলবঙ্গসংগীতসম্মেলন 118
- গীতালি 122

- আলাপ- আলোচনা 125
- ছিন্নপত্রাবলী 162
- জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত পত্র 185
- ইন্দিরাদেবীকে লিখিত 186
- পথে ও পথের প্রান্তে 188
- নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লিখিত পত্র 189
- দিলীপকুমার রায়কে লিখিত 190

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লিখিত

১

খড়দহ। দেওয়ালি। ১৩৩৯। ১৯৩২

সংগীতের সঙ্গে কাব্যের একটা জায়গায় মিল নেই। সংগীতের সমস্তটাই অনির্বচনীয়। কাব্যে বচনীয়তা আছে সে কথা বলা বাহুল্য; অনির্বচনীয়তা সেইটেকেই বেষ্টন করে হিল্লোলিত হতে থাকে, পৃথিবীর চার দিকে বায়ুমণ্ডলের মতো। এপর্যন্ত বচনের সঙ্গে অনির্বচনের, বিষয়ের সঙ্গে রসের গাঁঠ বেঁধে দিয়েছে ছন্দ। পরস্পরকে বলিয়ে নিয়েছে–'যদেতদ্ হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব'। বাক্ এবং অবাক বাঁধা পড়েছে ছন্দের মাল্য-বন্ধনে।

২

শান্তিনিকেতন। ৮ অক্টোবর ১৯৩৭

গানে কথা ও সুরের স্থান নিয়ে কিছুদিন থেকে তর্ক চলেছে। আমি ওস্তাদ নই, আমার সহজ বুদ্ধিতে এই মনে হয় এ বিষয়টা সম্পূর্ণ তর্কের বিষয় নয়; এ সৃষ্টির অধিকারগত, অর্থাৎ লীলার। জপতপ করে মন্ত্রতন্ত্র আউড়িয়ে হয়তো কৃচ্ছ্রসাধক যথানিয়মে ভবসমুদ্র পার হতে পারে, কিন্তু যে সরল ভক্তির মানুষ বলে ' ভজন পূজন জানি নে, মা, জানি তোমাকেই' সেই হয়তো জিতে যায়। সে আইনকে ডিঙিয়ে গিয়ে মানে লীলাকে, ইচ্ছাকে–সেই বলে 'ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন'। সে বলে সকলের উপরে আছেন যিনি, তিনি নিজে হতে যাকে বেছে নেনে তার আর ভাবনা নেই। যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে এখানে সেই সকলের উপরওয়ালা হচ্ছে সৃষ্টির আনন্দ। এই আনন্দ যখন রূপ নেয় তখন সেই রূপেই তার সত্যতার প্রমাণ হয়, আইনকর্তার দণ্ডবিধিতে নয়। উড়ুক্ষু পাখির পালকওয়ালা ডানা থাকে জানি, কিন্তু সৃষ্টির বড়ো খেয়ালীর মর্জি অনুসারে বাদুড়ের পালক নেই–শ্রেণীবিভাগওয়ালা তাকে যে শ্রেণীভুক্ত করে যে নামই দিন সে উড়বেই। প্রাণীবিজ্ঞানের কোঠায় তিমিকে মাছ নাই বলা গেল, আসল কথা হচ্ছে সে জলে ডুবসাঁতার দিয়ে বেড়াবেই। অন্যান্য লক্ষণ অনুসারে তার ডাঙায় থাকাই উচিত ছিল, কিন্তু সে থাকে নি, সে জলেই রয়ে গেল। সৃষ্টিতে এমন অনেক অভাব্য ভাবিত হয়ে থাকে, হয় না জড়ের কারখানায়। কথা ও সুরে মিলে যদি সুসম্পূর্ণ সৃষ্টি হয়ে থাকে তবে যেটা হয়েছে

বলেই তার আদর, সেই হওয়ার গৌরবেই সৃষ্টির গৌরব। এই মিলিত সৃষ্টিতে যে রস পাই তর্কের দ্বারা তাকে যে যা বলে বলুক সেটা বাহ্য, কিন্তু সৃষ্টির খাতির উড়িয়ে দিয়ে তর্কের খাতিরে যারা বলে বসে 'রসই পেলুম না', এমনতরো অভ্যাসগ্রস্ত আড়ষ্টবোধসম্পন্ন মানুষের অভাব নেই কী সাহিত্যে, কী সংগীতে, কী শিল্পকলায়। অভ্যাসের মোহ থেকে, আইনের পীড়ন থেকে, তারা মুক্তিলাভ করুক এই কামনা করি–কিন্তু সেই মুক্তি হবে 'ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন'।

তেলে জলে যেমন মেলে না, কথা ও সুর তেমনতরো অমিশুক নয়–মানুষের ইতিহাসের প্রথম থেকেই তার পরিচয় চলেছে। তাদের স্বাতন্ত্র্য কেউ অস্বীকার করে না, কিন্তু পরস্পরের প্রতি তাদের সুগভীর স্বাভাবিক আসক্তি লুকোনো নেই। এই আসক্তি একটি শক্তিবিশেষ, বিশ্ববিধাতার দৃষ্টান্তে গুণীরাও এই প্রবল শক্তিকে সৃষ্টির কাজে লাগিয়ে দেন–এই সৃষ্টির ভিতর দিয়ে সেই শক্তি মনকে বিচলিত করে তোলে। এর থেকেই উদ্ভূত হয় বিশ্বের সব চেয়ে প্রবল রস, যাকে বলে আদিরস। এই যুগলমিলন-জাতীয় সৃষ্টি উচ্চশ্রেণীর কি না হিন্দুস্থানী কায়দার সঙ্গে মিলিয়ে তার বিচার চলবে না, তার বিচার তার নিজেরই অন্তর্গূঢ় বিশেষ আদর্শের উপর। মাদুরার মন্দিরে স্থাপত্যের ও ভাস্কর্যের প্রভূততানমানসম্পন্ন যে ঐশ্বর্যের পরিচয় পাই তারই নিরন্তর পুনরাবৃত্তিতেই স্থাপত্যসাধনার চরম উৎকর্ষে নিয়ে যাবে তা বলতে পারি নে, তার চেয়ে অনেক সহজ সরল শুচি আদর্শ আছে যার বাহুল্যবর্জিত শুভ্র সংযত রূপ হৃদয়ের মধ্যে সহজে প্রবেশ করে একখানি গীতিকাব্যেরই মতো। যেমন চিস্তির শ্বেতমর্মরের সমাধিমন্দির। মাদুরার মতো তার মদ্যে বারংবার তানের উৎক্ষেপ বিক্ষেপ নেই বলেই তাকে নীচের শ্রেণীতে ফেলতে পারব না। আনন্দ সম্ভোগ করবার সহজ মন নিয়ে কৃত্রিম কৌলীন্যের মেলবন্ধন না মেনে সৃষ্টির রসবৈচিত্র্য স্বীকার করে নিতে দোষ কী?

রসসৃষ্টির রাজ্যে যাদের মনের বিহার তাদের মুশকিল এই যে, 'রসস্য নিবেদন'টা রুচির উপর নির্ভর করে, সেই রুচি তৈরি হয়ে ওঠে ব্যক্তিগত বা শ্রেণীগত অভ্যাসের উপর। এই কারণে শ্রেণীবিচার সহজ, রসবিচার সহজ নয়।

নিয়তি নিয়মকে রক্ষা করবার খবরদারিতে বাঁধা পথে বারংবার স্টীম রোলার চালায়, ইতিমধ্যে সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টির ঝরনাকে বইয়ে দিতে থাকেন তারই স্বকীয় গতিবেগের বিচিত্র শাখায়িত পথে–এই পথে কথার ধারা একলা যাত্রা করে, সুরের ধারাও নিজের শাখা ধরে চলে, আবার সুর ও কথার স্রোত মিলেও যায়। এই মিলে এবং অমিলে দুয়েতেই রসের প্রবাহ–এর

মধ্য যাঁরা কম্যুনাল বিচ্ছেদ প্রচার করেন সেই শ্রেণীমাহাত্ম্যের ধ্বজাধারীদেরকে সৃষ্টিবাধাজনক শান্তিভঙ্গের উৎপাত থেকে নিরস্ত হতে অনুরোধ করি।...

এত বড়ো চিঠি লিখে ভাঙা শরীরের বিরুদ্ধে যথেষ্ট অপরাধ করেছি। কিন্তু রোগদৌর্বল্যের আঘাতের চেয়েও বড়ো আঘাত আছে, তাই থাকতে পারলুম না। কথাও সুরকে বেগ দেয়, সুরও কথাকে বেগ দেয়, উভয়ের মধ্যে আদান-প্রদানের সম্বন্ধ আছে; রসসৃষ্টিতে এদের পরিণয়কে হেয় করতে হবে যেহেতু সাংগীতিক মনুসংহিতায় একে অসবর্ণ বিবাহ বলে, আমার মতো মুক্তিকামী এটা সইতে পারে না। সংগীতে চিরকুমারদের আমি সম্মান করি যেখানে সম্মানের তারা যোগ্য, কিন্তু কুমার-কুমারীদের সুন্দর রকম মিলন হলে আনন্দ করতে আমার বাধে না। বিবাহে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা নষ্ট হয়ে শক্তি হ্রাস করে এ কথা সত্য হতেও পারে, না হতেও পারে, এমন হতেও পারে এক রকম শক্তিকে সংযত করে আর-এক রকম শক্তিকে পূর্ণতা দেয়।

সাহানাদেবীকে লিখিত

সেদিন মণ্টুর১ গান অনেকগুলি ও অনেকক্ষণ ধরে শুনেছি।... "হে ক্ষণিকের অতিথি" মণ্টু সেদিন গেয়েছিল-সুরের মধ্যে কোনও পরিবর্তন ঘটায় নি। তার মধ্যে ও যে ধাক্কা লাগিয়েছিল সেটাতে গানের ভাবের চাইতে ভঙ্গি প্রবল হয়ে উঠেছিল। দেখলুম শ্রোতাদের ভালো লাগল। গানের প্রকাশ সম্বন্ধে গায়কের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অগত্যা মানতেই হবে-অর্থাৎ গানের দ্বারা গায়ক নিজের অনুমোদিত বিশেষ ভাবের ব্যাখ্যা করে-যে ব্যাখ্যা রচয়িতার অন্তরের সঙ্গে না মিলতেও পারে-গায়ক তো গ্রামোফোন নয়। তুমি যখন আমার গান করো শুনলে মনে হয় আমার গান রচনা সার্থক হয়েছে-যে গানে যতখানি আমি আছি ততখানি ঝুনুও আছে-এই মিলনের দ্বারা যে পূর্ণতা ঘটে সেটার জন্যে রচয়িতার সাগ্রহ প্রতীক্ষা আছে। আমি যদি সেকালের সম্রাট হতুম তাহলে তোমাকে বন্দিনী করে আনতুম লড়াই করে কেননা তোমার কণ্ঠের জন্যে আমার গানের একান্ত প্রয়োজন আছে।...ইতি ৪। ৪। ৩৮

-রম্যবীণা, ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, ১৩৬৬
পৃ. ১-২

১ দিলীপকুমার রায়।

৩

কালিম্পঙ। ২৯ এপ্রিল ১৯৩৮

বিশ্বসৃষ্টিতে রসবৈচিত্র্যের সীমা নেই, কবির মন তার সকল দিকেই স্পর্শসচেতন– কেবলমাত্র একটা প্রেরণাতেই, তা সে যত বড়োই হোক, যেন তার রাগরাগিণী নিঃশেষিত না হয়।...

ইতিমধ্যে মণ্টু বিখ্যাত গায়িকা কেসরবাইকে এনেছিল আমাকে গান শোনাবার জন্যে। আশ্চর্য তার সাধনা, কণ্ঠে মাধুর্য আছে, যেমন তেমন করে সুর খেলাতে এবং সুরে খেলাতে এবং সুরে মোচড় দিতে তার অসমান্য নৈপুণ্য।

এ'কে ভালো বলতে বাধ্য, কিন্তু ভালো লাগতে নয়। সংগীত যখন রূপঘনিষ্ঠ প্রাণবান দেহ নেয় তখন তার যত খুশি টেনে বাড়ানো, ছেঁটে কমানো, তাকে আছড়ানো, মোচড়ানো, কলাতত্ত্ববিরোধী। পুরুভুজজাতীয় আদিম জীব অবয়বহীন, ইংরেজিতে যাকে বলে amorphous, তাকে দুখানা করলেও যা সাতখানা করলেও তা। পূর্ণ অভিব্যক্ত জীবে এই অত্যাচার খাটে না। তার স্বভাবসীমাকে কিছুদূর অতিক্রম করা চলে, কিন্তু বেশি দূর নয়। এইজন্যে কেসরবাইয়ের গানকে কান তারিফ করলেও মন স্বীকার করছিল না। যারা ওস্তাদি-নেশা-গ্রস্ত তাদের এই কলাতত্ত্বের সহজ কথা বুঝিয়ে দেওয়া শক্ত। কেননা, নেশার সীমা নেই, ভোজের আছে। 'ঢাল্ ঢাল্ সুরা আরো ঢাল্' এটাকে মাৎলামি বলে হাসতে পারি, কিন্তু দই ক্ষীর সন্দেশের বেলা যথাস্থানে থামার দ্বারাই তাকে সম্মান দেওয়া হয়–না থামালেই সেটা বীভৎস হয়ে ওঠে। কেসরবাই যে জাতীয় গান গায়, শারীরিক ক্লান্তি ছাড়া তার থামবার এমন কোনোই সুবিহিত প্রেরণা নেই যা তার অন্তর্নিহিত। তাতে কেসরবাইকে অপরাধী করি নে, এইজাতীয় সংগীতকেই করি। কেসরবাইয়ের গাওয়াতে কেবল যে সাধনার পরিচয় আছে তা নয়, বিধিদত্ত ক্ষমতারও পরিচয় আছে–যা ওস্তাদের নেই। কিন্তু ততঃ কিম্! এই শক্তি ভুল বাহন নিয়ে ব্যর্থ হয়েছে, নন্দনবনে যে অপ্সরার যোগ্যস্থান ছিল সুন্দরবনে তার মান বাঁচানো সহজ হয় না।

জানকীনাথ বসুকে লিখিত

শান্তিনিকেতন। ২০ ডিসেম্বর, ১৯৩৮

আমার গান তাঁর ইচ্ছামত ভঙ্গি দিয়ে গেয়ে থাকেন, তাতে তাদের স্বরূপ নষ্ট হয় সন্দেহ নেই। গায়কের কণ্ঠের উপর রচয়িতার জোর খাটে না, সুতরাং ধৈর্য ধরে থাকা ছাড়া অন্য পথ নেই। আজকালকার অনেক রেডিয়োগায়কও অহংকার করে বলে থাকেন তাঁরা আমার গানের উন্নতি করে থাকেন। মনে মনে বলি পরের গানের উন্নতি সাধনে প্রতিভার অপব্যয় না করে নিজের গানের রচনায় মন দিলে তাঁরা ধন্য হতে পারেন। সংসারে যদি উপদ্রব করতেই হয় তবে হিটলার প্রভৃতির ন্যায় নিজের নামের জোরে করাই ভালো।

অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তীকে লিখিত পত্র

শান্তিনিকেতন। ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৯

সুরের-বোঝাই-ভরা তিনটে নাটিকার মাঝিগিরি শেষ করা গেল। নটনটীরা যন্ত্রতন্ত্র নিয়ে চলে গেল কলকাতায়। দীর্ঘকাল আমার মন ছিল গুঞ্জনমুখরিত। আনন্দে ছিলুম। সে আনন্দ বিশুদ্ধ, কেননা সে নির্বস্তুক (abstract)। বাক্যের সৃষ্টির উপরে আমার সংশয় জন্মে গেছে। এত রকম চলতি খেয়ালের উপর তার দর যাচাই হয়, খুঁজে পাই নে তার মূল্যের আদর্শ।...

এই টলমলে অবস্থায় এখনকার মতো দুটো পাকা ঠিকানা পেয়েছি আমার বানপ্রস্থের–গান আর ছবি। এ পাড়ায় এদের উপরে বাজারের বস্তাবন্দীর ছাপ পড়ে নি। যদিও আমার গান নিয়ে বচসার অন্ত নেই, তবু সেটা আমার মনকে নাড়া লাগায় না। তার একটা কারণ, সুরের সমগ্রতা নিয়ে কাটাছেঁড়া করা চলে না। মনের মধ্যে ওর যে প্রেরণা সে ব্যাখ্যার অতীত। রাগরাগিণীর বিশুদ্ধতা নিয়ে যে-সব যাচনদারেরা গানের আঙ্গিক বিচার করেন, কোনোদিন সেই-সব গানের মহাজনদের ওস্তাদিকে আমি আমল দিই নি; এ সম্বন্ধে জাতখোয়ানো কলঙ্ককে আমি অঙ্গের ভূষণ বলে মেনে নিয়েছি। কলার সকল বিভাগে আমি ব্রাত্য, বিশেষভাবে গানের বিভাগে। গানে আমার পাণ্ডিত্য নেই এ কথা আমার নিতান্ত জানা–তার চেয়ে বেশি জানা গানের ভিতর দিয়ে অব্যবহিত আনন্দের সহজ বোধ। এই সহজ আনন্দের নিশ্চিত উপলব্ধির উপরে বাঁধা আইনের করক্ষেপ আমাকে একটুও নাড়াতে পারে নি। এখানে আমি উদ্ধত, আমি স্পর্ধিত আমার আন্তরিক অধিকারের জোরে। বচনের অতীত বলেই গানের অনির্বচনীয়তা আপন মহিমায় আপনি বিরাজ করতে পারে, যদি তার মধ্যে থাকে আইনের চেয়ে বড়ো আইন। গান যখন সম্পূর্ণ জাগে মনের মধ্যে তখন চিত্ত অমরাবতীতে গিয়ে পৌঁছয়। এই-যে জাগরণের কথা বলছি তার মানে এ নয় যে, সে একটা মস্ত কোনো অপূর্ব সৃষ্টি-সহযোগে। হয়তো দেখা যাবে সে একটা সামান্য-কিছু। কিন্তু, আমার কাছে তার সত্য তার তৎসাময়িক অকৃত্রিম বেদনার বেগে। কিছুদিন পরে তার তেজ কমে যেতে পারে, কিন্তু যে মানুষ সম্ভোগ করেছে তার তাতে কিছু আসে যায় না, যদি না সে অন্যের কাছে বক্‌শিশের বাঁধা বরাদ্দ দাবি করে। নতুন রচনার আনন্দে আমি পদে পদে ভুলি, গাছ যেমন ভোলে তার ফুল ফোটানো। সেইজন্যে অন্যেরা যখন ভোলে, সে আমি টেরও পাই নে। যে ছন্দ-উৎস বেয়ে অনাদিকাল ধরে ঝরছে রূপের ঝর্না

তারই যে-কোনো একটা ধারা এসে যখন চেতনায় আবর্তিত হয়ে ওঠে, এমন-কি ক্ষণকালের জন্যেও, তখন তার জাদুতে কিছু-না রূপ ধরে কিছু-একটার, সেই জাদুর স্পর্শ লাগে কল্পনায়-যেন ইন্দ্রলোকের থেকে বাহবা এসে পৌঁছয় আমার মর্ত্যসীমানায়-সেই দেবতাদের উৎসাহ পাই যে দেবতারা স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা। হয়তো সেই মুহূর্তে তাঁরা কড়ি-মূল্য দেন, কিন্তু সে স্বর্গীয় কড়ি।

...গানেতে মনের মধ্যে এনে দেয় একটা দূরত্বের পরিপ্রেক্ষণী। বিষয়টা যত কাছেরই হোক সুরে হয় তার রথযাত্রা; তাকে দেখতে পাই ছন্দের লোকান্তরে, সীমান্তরে; প্রাত্যহিকের করস্পর্শে তার ক্ষয় ঘটে না, দাগ ধরে না।

আমার শ্যামা নাটকের জন্যে একটা গান তৈরী করেছি ভৈরবী রাগিণীতে–

জীবনের পরম লগন কোরো না হেলা
হে গরবিনী

এই গরবিনীকে সংসারে দেখেছি বারংবার, কিন্তু গানের সুর শুনলে বুঝবে এই 'বারংবারে'র অনেক বাইরে সে চলে গেছে। যেন কোন্ চিরকালের গরবিনীর পায়ের কাছে বসে মুগ্ধ মন অন্তরে অন্তরে সাধনা করতে থাকে। সুরময় ছন্দোময় দূরত্বই তার সকলের চেয়ে বড়ো অলংকার। এই দূরবিলাসী গাইয়েটাকে অবাস্তবের নেশাখোর বলে যদি অবজ্ঞা করো, এই গরবিনীকে যদি দোক্তা খেয়ে পানের পিক ফেলতে দেখলে তবেই তাকে সাঁচ্চা বলে মেনে নিতে পারো, তবে তা নিয়ে তর্ক করব না–সৃষ্টিক্ষেত্রে তারও একটা জায়গা আছে, কিন্তু সেই জায়গা-দখলের দলিল দেখিয়ে আমার সুরলোকের গরবিনীকে উচ্ছেদ করতে এলে আমি পেয়াদাকে বলব, 'ওকে তাড়িয়ে তো কোনো লাভ নেই, কেননা, আঁচলে পানের পিকের ছোপ -লাগা মেয়েটা জায়গা পেতে পারে এমন কোনো ঘোর আধুনিক ভৈরবী রাগিণী হাল আমলের কোনো তানসেনের হাতে আজও তৈরি হয় না।'কথার হাটে হতে পারে, কিন্তু সুরের সভায় নয়। এই সুরে যে চিরদূরত্ব সৃষ্টি করে সে অমর্ত্য লোকের দূরত্ব, তাকে অবাস্তব বলে অবজ্ঞা করলে বাস্তবীকে আমরা তাঁদের অধিকার স্বচ্ছন্দে ছেড়ে দিয়ে যাব, এবং গির্জেতে গিয়ে প্রার্থনা করব ত্রাণকর্তা এদের যেন মুক্তি দেন।

গানে আমি রচনা করেছি শ্যামা, রচনা করেছি চণ্ডালিকা। তার বিষয়টা বিশুদ্ধ স্বপ্নবস্তু নয়। তীব্র তার সুখদুঃখ, ভালোমন্দ; তার বাস্তবতা অকৃত্রিম এবং নিবিড়। কিন্তু, এগুলোকে পুলিস

কেসের রিপোর্টরূপে বানানো হয় নি–গানে তার বাধা দিয়েছে–তার চার দিকে যে দূরত্ব বিস্তার করেছে তাকে পার হয়ে পৌঁছতে পারে নি যা-কিছু অবান্তর, যা অসংলগ্ন যা অনাহূত আকস্মিক। অথচ জগতে সব-কিছুর সঙ্গেই আছে অসংলগ্ন অর্থহীন আবর্জনা। তাদেরই সাক্ষ্য নিয়ে তবেই প্রমাণ করতে হবে সাহিত্যের সত্যতা, এমন বেআইনি বিধি মানতে মনে বাধছে। অন্তত গানে এ কথা ভাবতেই পারি নে। আজকালকার য়ুরোপে হয়তো সুরের ঘাড়ে বেসুর চড়ে বসে ভূতের নৃত্য বাধিয়েছে। আমাদের আসরে এখনো এই ভূতে-পাওয়া অবস্থা পৌঁছয় নি—কেননা আমাদের পাঠশালায় য়ুরোপীয় গানের চর্চা নেই। নইলে এতদিনে বাংলায় নকল বেতালের দল কানে তালা ধরিয়ে দিতে কসুর করত না।

যাই হোক, যখন বাস্তব সাহিত্যের পাহারাওয়ালা আমাকে তাড়া করে তখন আমার পালাবার জায়গা আছে আমার গান। একেই হয়তো এখনকার সাইকলজি বলে এস্‌কেপিজ্‌ম্‌ !

‘জনগণমনঅধিনায়ক’

পুলিনবিহারী সেনকে লিখিত

২০ নভেম্বর ১৯৩৭

জনগণমনঅধিনায়ক গানটি কোনো উপলক্ষ্য-নিরপেক্ষ ভাবে আমি লিখেছি কিনা তুমি জিজ্ঞাসা করেছ। বুঝতে পারছি এই গানটি নিয়ে দেশের কোনো কোনো মহলে যে দুর্বাক্যের উদ্ভব হয়েছে তারই প্রসঙ্গে প্রশ্নটি তোমার মনে জেগে উঠল।... তোমার চিঠির জবাব দিচ্ছি কলহের উষ্মা বাড়াবার জন্যে নয়, ঐ গান রচনা সম্বন্ধে তোমার কৌতূহল মেটাবার জন্যে।

একদিন আমার পরলোকগত বন্ধু হেমচন্দ্র মল্লিক বিপিন পাল মহাশয়কে সঙ্গে করে একটি অনুরোধ নিয়ে আমার কাছে এসেছিলেন। তাঁদের কথা ছিল এই যে, বিশেষভাবে দুর্গামূর্তির সঙ্গে মাতৃভূমির দেবীরূপ মিলিয়ে দিয়ে তাঁরা শারদীয়া পূজার অনুষ্ঠানকে নূতনভাবে দেশে প্রবর্তিত করতে চান, তার উপযুক্ত ভক্তি ও উদ্দীপনা-মিশ্রিত স্তবের গান রচনা করবার জন্যে আমার প্রতি তাঁদের ছিল বিশেষ অনুরোধ। আমি অস্বীকার করে বলেছিলুম এ ভক্তি আমার আন্তরিক হতে পারে না; সুতরাং এতে আমার অপরাধের কারণ ঘটবে। বিষয়টা যদি কেবলমাত্র সাহিত্যক্ষেত্রের অধিকারগত হত তা হলে আমার ধর্মবিশ্বাস যাই হোক আমার পক্ষে তাতে সংকোচের কারণ থাকত না; কিন্তু ভক্তির ক্ষেত্রে, পূজার ক্ষেত্রে, অনধিকার প্রবেশ গর্হণীয়। আমার বন্ধুরা সন্তুষ্ট হন নি। আমি রচনা করেছিলুম ‘ভুবন-মনোমোহিনী’, এ গান পূজামণ্ডপের যোগ্য নয় সে কথা বলা বাহুল্য। অপর পক্ষে এ কথাও স্বীকার করতে হবে যে, এ গান সর্বজনীন ভারতরাষ্ট্রসভায় গাবার উপযুক্ত নয়, কেননা এ কবিতাটি একান্তভাবে হিন্দুসংস্কৃতি আশ্রয় করে রচিত। অহিন্দুর এটা সুপরিচিত ভাবে মর্মঙ্গম হবে না।

আমার ভাগ্যে অনুরূপ ঘটনা আর-একবার ঘটেছে। সে বৎসর ভারত সম্রাটের আগমনের আয়োজন চলছিল। রাজসরকারের প্রতিষ্ঠাবান আমার কোনো বন্ধু সম্রাটের জয়গান রচনার জন্যে আমাকে বিশেষ করে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। শুনে বিস্মিত হয়েছিলুম, সেই বিস্ময়ের সঙ্গে মনে উত্তাপেরও সঞ্চার হয়েছিল। তারই প্রবল প্রতিক্রিয়ার ধাক্কায় আমি জনগণমনঅধিনায়ক গানে সেই ভারতভাগ্যবিধাতার জয়ঘোষণা করেছি, পতনঅভ্যুদয়বন্ধুর পনথায় যুগযুগধাবিত যাত্রীদের যিনি চিরসারথি, যিনি জনগণের অন্তর্যামী পথপরিচায়ক-সেই

যুগ যুগান্তরের মানবভাগ্যরথচালক যে পঞ্চম বা ষষ্ঠ বা কোনো জর্জ্ই কোনোক্রমেই হতে পারেন না সে কথা রাজভক্ত বন্ধুও অনুভব করেছিলেন। কেননা তাঁর ভক্তি যতই প্রবল থাক্, বুদ্ধির অভাব ছিল না। আজ মতভেদবশত আমার প্রতি ক্রুদ্ধ ভাবটা দুশ্চিন্তার বিষয় নয়, কিন্তু বুদ্ধিভ্রংশটা দুর্লক্ষণ।

এই প্রসঙ্গে আর-এক দিনের ঘটনা মনে পড়ছে, সে বহুদিন পূর্বের কথা। তখনকার দিনে আমাদের রাষ্ট্রনায়কদের অঞ্জলি তোলা ছিল রাজপ্রাসাদের দুর্গম উচ্চ শিখর থেকে প্রসাদকণাবর্ষণের প্রত্যাশায়। একদা কোনো জায়গায় তাঁদের কয়েকজনের সান্ধ্য বৈঠক বসবার কথা ছিল। তাঁদের দূত ছিলেন আমার পরিচিত এক ব্যক্তি। আমার প্রবল অসম্মতি সত্ত্বেও তিনি বারবার করে বলতে লাগলেন আমি না গেলে আসর জমবে না। শেষ পর্যন্ত ন্যায্য অসম্মতিকেও বলবৎ রাখবার শক্তি বিধাতা আমাকে দেন নি। যেতে হল। ঠিক যাবার পূর্বক্ষণেই আমি নিম্নোদ্ধৃত গানটি রচনা করেছিলেম–‘আমায় বোলো না গাহিতে’ ইত্যাদি। এই গান গাবার পরে আর আসর জমল না। সভাস্থগণ খুশি হন নি।

সুধারানী সেনকে লিখিত

শান্তিনিকেতন [২৯ মাচ ১৯৩৯]

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

তুমি যে প্রশ্ন করেছ এ রকম অদ্ভুত প্রশ্ন পূর্বেও শুনেছি।

পতন অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থা / যুগ যুগ ধাবিত যাত্রী,
হে চিরসারথি তব রথচক্রে / মুখরিত পথ দিনরাত্রি–

শাশ্বত মানব-ইতিহাসের যুগযুগধাবিত পথিকদের রথযাত্রায় চিরসারথি ব'লে আমি চতুর্থ বা পঞ্চম জর্জের স্তব করতে পারি, এরকম অপরিমিত মূঢ়তা আমার সম্বন্ধে যাঁরা সন্দেহ করতে পারেন তাঁদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আত্মাবমাননা।

ইতি ২৯| ৩| ২৯(?)

সংযোজন

সুর ও সংগতি

রবীন্দ্রনাথ ও ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পত্রালাপ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

তোমার অধ্যাপকীয় চিত্তবৃত্তি আমার কাছে ক্রমশই সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে। কুঁড়েমি জিনিসটার উপর তোমার কিছুমাত্র দয়ামায়া নেই। কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করাবেই এই তোমার কঠিন পণ। কিন্তু, সম্প্রতি এমন মানুষের সঙ্গে তোমার বোঝাপড়া চলবে, যে চিরকাল ইস্কুল-পালানে, কুঁড়েমি যার সহজ ধর্ম। বাল্যকাল থেকে কত কর্তব্যের দাবি আমাকেই আক্রমণ করেছে, প্রতিহত হয়েছে বারবার। নইলে আজ তোমাদের মতো এম. এ. পাস ক'রে নাম করতে পারতুম, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভুয়ো উপাধি নিয়ে লজ্জা রক্ষা করতে হত না। তুমি বলছ সংগীত সম্বন্ধে অনতিবিলম্বে আড়াইশো -পাতা-ব্যাপী আনাড়িতত্ত্ব প্রকাশ করা আমার কর্তব্য। সেটা যে ঘটবে না তার প্রথম ও প্রধান কারণ আমার সমুদ্ধত কুঁড়েমি। যারা কর্তব্যের তাড়া খেয়ে খেটে মরে তারা তো মজুর শ্রেণীর। তাদের কেউ বা বৈশ্যজাতীয়, কর্তব্যসাধনে যাদের মুনফা আছে; কেউ বা পরের ফরমাশে কর্তব্য করে, তারা শূদ্র; কেউ বা কর্তব্যটাকে গদাস্বরূপ ক'রে হন্যে হয়ে বেড়ায়, তারা ক্ষত্রিয়। আবার কেউ বা কর্তব্য করে না, কাজ করে-যে কাজে লোভ নেই, লাভ নেই, যে কাজে গুরুমশায়ের শাসন বা গুরুর অনুশাসন নেই; তাদের জাতই স্বতন্ত্র। যখন তুমি বৌদ্ধিক অর্থনীতি সম্বন্ধে বই লিখবে তখন আমার এই তত্ত্বকথাটা চুরি করে চালিয়ো নালিশ করব না। যে-সব বই লিখেছি তার চেয়ে অনেক বেশি বই লিখি নি; সংগীত সম্বন্ধে আমার মাস্টার্‌পীস্‌টা সেই অলিখিত রচনারত্নভাণ্ডাগারে রয়ে গেল। আমার সব মত যদি নিজেই স্পষ্ট করে লিখে দিয়ে যাব তবে যারা থীসিস্ লিখে খ্যাতি অর্জন করবে তাদের যে বঞ্চিত করা হবে। সেই-সব অনাগতকালের থীসিস্‌রচয়িতার কল্পচ্ছবি আমার মনের সামনে ভাসছে, তারা একাগ্রচিত্তে অতীতের আবর্জনাকুণ্ড থেকে জীর্ণ বাণীর ছিন্ন অংশ ঘেঁটে বের ক'রে তার ঘণ্ট তৈরি

করছে–যে অংশ পাওয়া যাচ্ছে না সেইটেতেই তাদের মহোল্লাস। আমি তাদের আর্শীবাদভাজন হতে চাই। ইতি ১০ মাঘ ১৩৪১

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

ধূর্জটি, তোমাকে লেখা একটা পুরোনো চিঠির প্রতিলিপি আমি রেখে দিয়েছিলাম, হঠাৎ চোখে পড়ল। দেখতে পাচ্ছি তোমাকে নানা পত্রে গান সম্বন্ধে আমার মত জানিয়েছি। আবার নতুন করে আমাকে তাগিদের দ্বারা চিঠিয়ে তুলছ কেন? এ সম্বন্ধে আমার মত সর্বসাধারণে বিজ্ঞাপিত করলে বাঙালির সংস্কৃতিসমুন্নতির সবিশেষ সহায়তা করবে ব'লে দুরাশা মনে রাখি নে। পত্রনিহিত মতগুলি সংগ্রহ করে বা তদ্দারা কীটপালনে যদি তোমার আগ্রহ থাকে আমার অসম্মতি নেই। জীবনে অনেক কথাই বলেছি, কিন্তু অনুচ্চারিত রয়েছে ততোধিক পরিমাণে– হয়তো বা ভাবীকাল তাদের জন্যেই বেশি কৃতজ্ঞ থাকবে।

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

...বাংলাদেশে সংগীতের প্রকৃতিগত বিশেষত্ব হচ্ছে গান, অর্থাৎ বাণী ও সুরের অর্ধনারীশ্বর রূপ। কিন্তু, এই রূপকে সর্বদা প্রাণবান করে রাখতে হলে হিন্দুস্থানী উৎসধারার সঙ্গে তার যোগ রাখা চাই। আমাদের দেশে কীর্তন ও বাউল গানের বিশেষ একটা স্বাতন্ত্র্য ছিল, তবুও সে স্বাতন্ত্র্য দেহের দিকে; প্রাণের দিকে ভিতরে ভিতরে রাগরাগিণীর সঙ্গে তার যোগ হয় নি। বর্তমানে এর অনুরূপ আদর্শ দেখা যায় আমাদের বাংলা সাহিত্যে। য়ুরোপীয় সাহিত্যের সঙ্গে এর আন্তরিক যোগ বিচ্ছিন্ন হলে এর স্রোত যাবে মরে; অথচ খাতটা এর নিজের, এর প্রধান কারবার নিজের দুই পারের ঘাটে ঘাটে। অতি বাল্যকাল থেকে হিন্দুস্থানী সুরে আমার কান এবং প্রাণ ভর্তি হয়েছে, যেমন, হয়েছে য়ুরোপীয় সাহিত্যের ভাবে ও রসে। কিন্তু, অনুকরণ করলেই নৌকাডুবি, নিজের টিকি পর্যন্ত দেখা যাবে না। হিন্দুস্থানী সুর ভুলতে ভুলতে তবে গান রচনা করেছি। ওর আশ্রয় না ছাড়তে পারলে ঘরজামাইয়ের দশা হয়, স্ত্রীকে পেয়েও তার স্বত্বাধিকারে জোর পৌঁছয় না। তাই ব'লে স্ত্রীকে বজায় না রাখলে ঘর চলে না। কিন্তু, স্বভাবে ব্যবহারে সে স্ত্রীর ঝোঁক হওয়া চাই পৈতৃকের চেয়ে শ্বাশুরিকের দিকে, তবেই সংসার হয় সুখের।

আমাদের গানেও হিন্দুস্থানী যতই বাঙালি হয়ে উঠবে ততই মঙ্গল, অর্থাৎ সৃষ্টির দিকে। স্বভবনে হিন্দুস্থানী স্বতন্ত্র, সেখানে আমরা তার আতিথ্য ভোগ করতে পারি—কিন্তু বাঙালির ঘরে সে তো আতিথ্য দিতে আসবে না-সে নিজেকে দেবে, নইলে উভয়ের মিলন হবে না। যেখানে পাওয়াটা সম্পূর্ণ নয় সেখানে সে পাওয়াটা ঋণ। আসল পাওয়ার ঋণের দায় ঘুচে যায়-যেমন স্ত্রী, তাকে নিয়ে দেনায় পাওনায় কাটাকাটি হয়ে গেছে। হিন্দুস্থানী সংগীত সম্বন্ধে আমার মনের ভাবটা ঐ। তাকে আমরা শিখব পাওয়ার জন্যে, ওস্তাদি করবার জন্যে নয়। বাংলা গানে হিন্দুস্থানী বিধি বিশুদ্ধ ভাবে মিলছে না দেখে পণ্ডিতেরা যখন বলেন সংগীতের অপকর্ষ ঘটছে, তখন তাঁরা পণ্ডিতী স্পর্ধা করেন-সেই স্পর্ধা সব চেয়ে দারুণ। বাংলায় হিন্দুস্থানীর বিশেষ পরিণতি ঘটতে ঘটতে একটা নূতন সৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে; এ সৃষ্টি প্রাণবান, গতিবান, এ সৃষ্টি শৌখিন বিলাসীর নয়-কলাবিধাতার। বাংলায় সাহিত্যভাষা সম্বন্ধেও তদ্রূপ। এ ক্ষেত্রে পণ্ডিতির জয় হলে বাংলা ভাষা আজ সীতার বনবাসের চিতায় সহমরণ লাভ করত। সংস্কৃতের সঙ্গে প্রণয় রেখেও বন্ধন বিচ্ছিন্ন করেছে ব'লেই বাংলা ভাষায় সৃষ্টির কার্য নব নব অধ্যবসায়ে যাত্রা করতে প্রবৃত্ত হয়েছে। বাংলা গানেও কি তারই সূচনা হয় নি? এই গান কি একদিন সৃষ্টির গৌরবে চলৎশক্তিহীন হিন্দুস্থানী সংগীতকে অনেক দূরে ছাড়িয়ে যাবে না? ইতি ১৩ই আগস্ট ১৯৩২

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

আমি বারবার দেখেছি বর-ঠকানে প্রশ্ন তুলে আমাকে আক্রমণ করতে তোমার যেন একটা সিনিস্‌টর্‌ আনন্দ আছে। এবারে কিন্তু সময় খারাপ। ভিন্‌গাঁয়ে যেতে হবে, লেকচার দেবার ডাক পড়েছে। মনের মধ্যে কথা বয়ন করবার যে তাঁতটা ছিল, এতকাল সে ফরমাশ খেটেছে বিস্তর; এখন ঘনঘন টানা-পোড়েন আর সয় না, কথায় কথায় সুতো যায় ছিঁড়ে।

তুমি যে প্রশ্ন করেছ তার উত্তর সেদিনকার বকুনির মধ্যে কোনো-একটা জায়গায় ছিল ব'লে মনে হচ্ছে। বোধ হয় যেন বলেছিলুম ঘরবাড়ি বালাখানা আপন-খেয়াল-মত বানানো চলে, কিন্তু যে ভূতলের উপর তাকে খাড়া করতে হবে সেই চিরকেলে আধারের সঙ্গে তার রফা

করাই চাই। তুমি জানো সংগীতে আমি নির্মমভাবে আধুনিক, অর্থাৎ জাত বাঁচিয়ে আচার মেনে চলি নে।

কিন্তু একেবারেই ঠাই বজায় না রাখি যদি তবে সেটা পাগলামি হয়ে দাঁড়ায়। শিশুকালে শিশুবোধে দেখেছি প্রেয়সীকে পত্র লেখবার বিশেষ পাঠ ও রীতি বেঁধে দেওয়া ছিল, সেটাতে তখনকার কালের প্রবীণদের সম্মতি ছিল সন্দেহ নেই। তর্কের ক্ষেত্রে ধরে নেওয়া যাক, প্রেমলিপি লেখবার সেই ছাঁদ যথার্থই অত্যন্ত মনোহর–কিন্তু, কালান্তর ঘটতেই, অর্থাৎ যৌবনকাল উপস্থিত হতেই দেখা যায় সে ভাষায় কোনো পক্ষের মেজাজ সায় দেয় না। তখন স্বতই যে ভাষা দেখা দেয় তার মধ্যে পিতৃপিতামহদের অনুমোদিত ধ্রুবনির্দিষ্ট শব্দলালিত্য ও রচনানৈপুণ্য না থাকতে পারে, ব্যাকরণের বিশেষত বানানের ভুলচুক থাকাও অসম্ভব নয়, দুটো-একটা ইংরেজি শব্দও তার মধ্যে হয়তো অগত্যা ঢুকে পড়ে, কিন্তু শুচিবায়ুগ্রস্ত মুরব্বিরা যাই বলুন-না কেন তার মধ্যে যে সহজ রসসঞ্চার হয় তাকে অবজ্ঞা করা চলবে না। সেই মুরুব্বিরাই যদি ষোড়শী চতুর্থপক্ষীয়ার দিকে দুর্নিবার ধাক্কায় ঝুঁকে পড়েন, তবে হঠাৎ দেখা যাবে তাঁদের ভাষাও শিকল ছিঁড়েছে। কিন্তু, তৎসত্ত্বেও মূল ভাষাটা বাংলা, সেখানে সেকাল একালের নাড়ীর যোগ। এই ভাষা বহু শতাব্দীর বহু নরনারীর বিচিত্র ভাবনা কামনা ও বেদনার নিরন্তর অভিঘাতে বিশেষভাবে প্রাণময় চিন্ময় দীপ্তিময় হয়ে উঠেছে, বিশেষভাবে বাঙালির চিন্তা ও ইচ্ছাকে রূপ দেবার জন্যেই তার সৃষ্টি। এইজন্যে, কোনো বাঙালির যতই প্রতিভার জোর থাক্, বিদেশী ভাষার ভূমিতে সাহিত্যের কীর্তিস্তম্ভ সে স্থায়ীভাবে গড়ে তুলতে পারে না। আমাদের বাংলা ভাষায় রূপ বদল হচ্ছে নিয়তই, বদল হতে যে পারে তার মহৎ গুণ–কিন্তু, সমস্ত বদল হবে তার আদি প্রকৃতির উপর ভর দিয়ে।

গান সম্বন্ধেও এই কথাই খাটে। ভারতবর্ষের বহু-যুগের-সৃষ্টি-করা যে সংগীতের মহাদেশ, তাকে অস্বীকার করলে দাঁড়াব কোথায়? পশ্চিম মহাদেশেও বাসযোগ্য স্থান নিশ্চিত আছে, কিন্তু সেখানে ভাড়াটে বাড়ির ভাড়া জোগাব কোথা থেকে? বাংলাদেশে আমার নামে অনেক প্রবাদ প্রচলিত; তারই অন্তর্গত একটি জনশ্রুতি আছে যে, আমি হিন্দুস্থানী গান জানি নে, বুঝি নে। আমার আদিযুগের রচিত গানে হিন্দুস্থানী ধ্রুবপদ্ধতির রাগরাগিণীর সাক্ষী-দল অতি বিশুদ্ধ প্রমাণ সহ দূর ভাবীশতাব্দীর প্রত্নতাত্ত্বিকদের নিদারুণ বাদবিতণ্ডার জন্যে অপেক্ষা করে আছে। ইচ্ছা করলেও সংগীতকে আমি প্রত্যাখ্যান করতে পারি নে; সেই সংগীত থেকেই আমি প্রেরণা লাভ করি এ কথা যারা জানে না তারাই হিন্দুস্থানী সংগীত জানে না। হিন্দুস্থানী গানকে আচারের

শিকলে যাঁরা অচল করে বেঁধেছেন, সেই ডিক্‌টেটারদের আমি মানি নে। যাঁরা বলেন ভারতীয় গানের বিরাট ভূমিকার উপরে নব নব যুগের নব নব যে সৃষ্টি স্বপ্রকাশ তার স্থান নেই –ঐখানে হাতকড়ি-পরা বন্দীদের পুনঃ পুনঃ আবর্তনের অনতিক্রমণীয় চক্রপথ আছে মাত্র এমনতর নিন্দোক্তি যাঁরা স্পর্ধা-সহকারে ঘোষণা করে থাকেন তাঁদেরই প্রতিবাদ করবার জন্যই আমার মতো বিদ্রোহীদের জন্ম-সেই প্রতিবাদ ভিন্ন প্রণালীতে কীর্তনকাররাও করে গেছেন। ইতি ৭ই জানুয়ারি

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কল্যাণীয় ধূর্জটি,

কাল পর্যন্ত গেল বসন্ত-উৎসবের আয়োজন। আগামী কাল চলেছি কলকাতায়। এরই মাঝখানে এক-টুকরো অবকাশ-সংক্ষেপে সারতে হবে তোমার ফরমাশ। তোমাদের ওখানে গানের মজলিশে ছায়ানট গাওয়া হয়েছিল। ঘড়ি দেখি নি, কিন্তু অন্তরে যে ঘড়িটা রক্তের দোলায় চলে তাতে মনে হল এক ঘণ্টা পেরোলো বা। ছায়ানটের যত রূপারূপান্তর আছে, তানকর্তব সারেগম, যত রকম লয়ে-বিলয়ে তাকে উল্‌টানো পাল্‌টানো যেতে পারে, তার কিছুই বাদ পড়ে নি। আমার অভিমত কী জানতে চাও–সময় খারাপ, বলতে সাহস করি নে। তোমাদের মেজাজ ভালো নয়। মতবিরোধ নিয়ে তোমরা যাকে যুক্তি বলো আমরা তাকে বলি গাল–ঘাঁটাতে ভয় করি। তা হোক, গীত-আলোচনায় যদি তোমার কানের সঙ্গে আমার কানের প্রভেদ দেখতে পাও তা হলে এই ব'লে তার কারণ নির্ণয় কোরো যে তুমিই বিজ্ঞ, আমি অনভিজ্ঞ; তারও ঊর্ধ্বে উঠে লোকবিশ্রুত উদারকর্ণসম্পন্ন জীবের উপমা ব্যবহার কোরো না–এরকম সাহিত্যরীতিতে আমরা অভ্যস্ত নই।

জানতে চেয়েছ ভালো লাগল কিনা। লেগেছে বইকি, কিন্তু ভালো লাগাই শেষ কথা নয়। বেঙ্গল স্টোর্সে গিয়ে যখন অসংখ্য রকম দামী কাপড় সারা প্রহর ধরে ঘেঁটে বেড়াই, ভালো লাগে, আরো ভালো লাগে, থেকে থেকে চমক লাগে, সংগ্রহের তারিফ করতে হয়। কিন্তু, সুন্দরীর গায়ে যখন মানানসই একখানি মাত্র শাড়ি দেখি, বলি: বাস্‌! হয়েছে! বলি নে ক্রমাগত সব কটা শাড়ি ওর গায়ে চাপালে ভালোর মাত্রা বাড়তেই থাকবে। সব কাপড়গুলোই

সমজদারের চোখে চমৎকার ঠেকতে পারে, যত সেগুলো উলটে-পালটে নেড়ে-চেড়ে দেখে ততই তারা বলে ওঠে: ক্যা তারিফ! সোভান আল্লা! ঠিক্‌ঠাক্ বলতে পারে কোন্‌টাতে কত ভরি সোনার জরি, আঁচলার কাজ কাশ্মীরের না মাদুরার। মাঝের থেকে চাপা পড়ে যায় স্বয়ং সুন্দরী। ইংরেজি ভাষায় বলতে পারি, যদি ক্ষমা করো: Art is never an exhibition but a revelation | Exhibition এর গর্ব তার অপরিমিত বহুলত্বে, revelation এর গৌরব তার পরিপূর্ণ ঐক্যে। সেই ঐক্যে থামা ব'লে একটা পদার্থ আছে, চলার চেয়ে তার কম মূল্য নয়। সে থামা অত্যন্ত জরুরি। ওস্তাদী গানে সেই জরুরি নেই, সে কেন যে কখনোই থামে, তার কোনো অনিবার্য কারণ দেখি নে। অথচ সকল আর্টেই সেই অনিবার্যতা আছে, এবং উপাদানপ্রয়োগে তার সংযম ও বাছাই আছে। বস্তুত ছায়ানটের ব্যাপক প্রদর্শনী আর্ট্ নয়– বিশেষ গানে বিশেষ সংযমে বিশেষ রূপের সীমাতেই ছায়ানট আর্ট্ হতে পারে। সে রূপটাকে তানে-কর্তবে তুলো ধুনে দিতে থাকলে বিশেষজ্ঞসম্প্রদায়ের সেটা যতই ভালো লাগুক-না, আমি তাকে আর্টের শ্রেণীতে গণ্যই করব না। স্যাকরার দোকানে ঢুকলে চোখ ঝল্‌মলিয়ে যাবে; কিন্তু, দোহাই তোমাদের, প্রেয়সীকে দিয়ে স্যাকরার দোকানের শখ মিটিয়ো না–সেই প্রেয়সীই আর্ট্, সেই'ই সম্পূর্ণ, সেই'ই আত্মসমাহিত। প্রোফেশনালের চক্ষে প্রেয়সীকে দেখো না, দেখো প্রেমিকের চক্ষে। প্রোফেশনাল বড়োবাজারে খুঁজলে মেলে, প্রেমিক বাজারের তালিকায় পাই নে, তিনি থাকেন বাজারের বাইরে–'ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন'। এইবার গাল শুরু করো। আমি চললুম। ইতি ২১শে মার্চ [১৯৩৫]

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

চিঠিখানা পেয়েছ শুনে আরাম পেলুম। সামান্য কারণে মনটা বিদ্রোহী হয়ে উঠছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে।

চাঞ্চল্য দূর হল। কিন্তু, তুমি আমাকে সংগীতের তর্কে টেনে বিপদে ফেলতে চাও কেন? তোমার কী অনিষ্ট করেছি? এর পরেও যদি টিঁকে থাকি তা হলে হয়তো ছন্দের প্রশ্ন পাড়বে।

আমার যা বলবার ছিল সংক্ষেপে বলেছি। বিস্তারিত বললে শরসন্ধানের লক্ষ্য বাড়িয়ে দেওয়া হয়। তা ছাড়া অত্যন্ত সহজ কথা কী করে বৃহদায়তন অত্যন্ত বাজে কথা করে তোলা যায় আমি জানি নে। আমি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা সাহিত্যের বক্তৃপদ ছেড়ে দিয়েছি, বাক্-বাহুল্যের অভ্যাস বেশিদিন টিঁকল না।

বিষয়টা truism অর্থাৎ নেহাত-সত্যের অন্তর্গত। আমি তোমাকে আর্টের সর্বজনবিদিত লক্ষণের কথা বলেছি–বলেছি আকার নিয়ে, কলেবর নিয়ে, তার ব্যবহার। তোমরা যদি বলো হিন্দুস্থানী সংগীত রাগরাগিণীর প্রটোপ্লাজ্‌ম্‌, অর্থাৎ ওর আয়তন আছে, অসম্ভব রকমের স্থিতিস্থাপক প্রাণও আছে, সে প্রাণ পরিবর্তনহীন আদিতম যুগেরও বটে, রস-রসায়নের বিশ্লেষণের দ্বারা ওর বিশেষ উপাদানেরও তালিকা বের করা যেতে পারে, কিন্তু ওর মধ্যে কোনো পরিমিত আকৃতির তত্ত্ব নেই, ও যথেচ্ছ ফুলে উঠতে পারে, লম্বা হতে পারে, চওড়া হতে পারে, চ্যাপ্টা হয়ে এগোতে এগোতে তিন চার পাঁচ ঘণ্টাকে আপনার তলায় সম্পূর্ণ চাপা দিতে পারে, তবে আমি তোমাদের কথাটা মেনে নিতে বাধ্য হব, কারণ আমি ওস্তাদ নই–কিন্তু, বলব তা হলে ওটা আর্টের কোঠায় পড়ে না। তোমরা বলবে নাম নিয়ে মারামারি করে লাভ নেই, আমাদের ভালো লাগে এবং ভালো লাগে ব'লেই যত বেশি পাই ততই স্ফূর্তি লাগে। যখন দেখি যথেচ্ছ পরিমাণ পাওনা-বিস্তারে তোমাদের কোনো আপত্তি নেই তখন স্পষ্ট বুঝতে পারি তোমাদের ভালো লাগার প্রকৃতি কী। তোমাদেরই মতো আমারও ভালো লাগে, সেটা লোভীর ভালো লাগা। আর্টিস্ট অলুব্ধ। সে স্বাদগ্রহণের উৎকর্ষের প্রতি লক্ষ ক'রে ভালো লাগার অমিতাচারকে অশ্রদ্ধা করে। সোনা জিনিসটা উজ্জ্বল, তার সু-বর্ণটা মনোহর, দুর্লভ খনিজ বলে তার দাম আছে। বসুন্ধরা আপন রত্ন বের করে দেওয়া সম্বন্ধে মিঞাসাহেবদের চেয়ে কম কৃপণ নন। এক তাল সোনা এনে ধরা হল, তুমি বললে 'বহুৎ আচ্ছা'। আর-এক তাল এল, তুমি বললে 'সোভান আল্লা'। সংগীতের যক্ষভাণ্ডার থেকে তালের পর তাল আসতে লাগল দুন চৌদুন বেগে, বাহবা দিতে দিতে তোমার গলা যায় ভেঙে। মূল্যের কথা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না; কিন্তু সে মূল্য যক্ষরাজের খাতাঞ্চিখানার। সে মূল্যের গাণিতিক অঙ্কে 'আরো' 'আরো' 'আরো' চাপিয়ে যাওয়া চলে। সরস্বতীর কমলবনে সোনার পদ্ম আছে; সেখানে লোভীর মতো 'encore' 'encore' করে চীৎকার চলে না। বেনের দল যতই দুঃখিত হোক, শতদলের উপর আর-একটা

পাপড়ি চাপানো চলবে না। সে আপন সম্পূর্ণতার মধ্যে থেমেছে ব'লেই সে অপরিসীম। ভাণ্ডারের ধনে আরো'র ফরমাশ চলে কিন্তু আনন্দের ধনের দিকে তাকিয়ে বলে থাকি–'নিমেষে শতেক যুগ বাসি'। রামচন্দ্র সোনার সীতা বানিয়েছিলেন। সোনার প্রাচুর্য নিয়ে যদি তার গৌরব হত তা হলে দশটা খনি উজাড় করে যে পিণ্ডটা তৈরি হত তার মতো সীতার শোকাবহ নির্বাসন আর-কিছু হতে পারত না। রামচন্দ্রকে 'থামো' বলতে হয়েছে। কিন্তু ছায়ানটের অক্লান্ত প্রগল্‌ভতার মুখে 'থামো' বলবার সাহস আমাদের জোগায় না, তাতে ভুজবলের প্রয়োজন হয়। এই বার এই তর্ক সম্বন্ধে 'থামো' বলবার সময় হয়েছে, অন্তত আমার তরফে। ইতি ১৬ই চৈত্র ১৩৪১

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পরম পূজনীয়েষু,

আপনি লিখেছিলেন–'আমি বারবার দেখেছি বর-ঠকানে প্রশ্ন তুলে আমাকে আক্রমণ করতে তোমার যেন একটা সিনিস্‌টর্‌ আনন্দ আছে'। কিন্তু সে রাতের আসরের পর আমাকে আপনি যে-দুটি সাংঘাতিক প্রশ্ন করেছিলেন তাদের এবং এই চিঠি-দুটির যথাযথ উত্তর দেবার অক্ষমতা লক্ষ্য করে আপনার ভাষাই আপনার ওপর নিক্ষেপ করতে ইচ্ছে হচ্ছে। এখন আমি বুঝলাম আপনি যে ব্যারিস্টার হন নি সেটা কেবল নৃপেন্দ্র সরকারের ভাগ্য-জোরে, আপনার নিজের কৃতিত্ব তাতে বেশি নেই। আজ তিন-চার সপ্তাহ ধরে কী উত্তর দেব ভাবছি। যা জুটেছে তাই গুছিয়ে লিখছি।

মনে হয়–কোথায় আমরা একমত প্রথমে জেনে রাখলে কোথায় এবং কতটুকু আমাদের পার্থক্য সহজেই ধরা পড়বে। আর্টের প্রকৃতি revelation এবং revelation-এর গৌরব তার পরিপূর্ণ ঐক্যে এই মন্তব্যের পর আপনি লিখেছেন, 'সেই ঐক্যে থামা ব'লে একটা পদার্থ আছে, চলার চেয়ে তার কম মূল্য নয়।'এই বাক্য থেকে আপনি সংগীতে গতির আনন্দ বাদ দিতে চান না, উপভোগই করতে চান পরিষ্কার বোঝা যায়। সেদিনকার একাগ্রতায় এবং বিশেষত প্রথম চিঠির মারফত ধ্রুবপদ্ধতি সম্বন্ধে মতপ্রকাশে –উচ্চসংগীতের প্রতি আপনার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা–তার মহিমা গাম্ভীর্য ও মাধুর্য ভোগ করবার আগ্রহ ও ক্ষমতাই প্রমাণিত হয়। অতএব আমার সিদ্ধান্তই ঠিক।

যে পথ চলাতেই আনন্দ পায় সে কখনো গতিকে উপেক্ষা করতে পারে না। যে চিরজীবন গতানুগতিকের স্থাণুতার বিপক্ষে বিদ্রোহ করে এল তার পক্ষে রাগিণীর চলিষ্ণু রূপউদ্‌ঘাটনে অসহিষ্ণু হওয়া অসম্ভব। থামতে আপনার ধর্মে বাধে–তাই এই সেদিনও ‘পুনশ্চ’ ও ‘চার অধ্যায়’ লিখলেন। আমিও আপনার সমধর্মী, এইখানেই আমাদের যথার্থ মিল। মিলের জোরে আমরা উভয়েই হিন্দুস্থানী সংগীতের একান্ত ভক্ত হয়েও তার চিরাচরিত পদ্ধতির মুক্তি চাই। মুক্তি, মৃত্যু নয়–কারণ, বাঁচা মানেই চলা। অনুকৃতির শিকল ক’রে বন্দীরাই খুঁড়িয়ে হাঁটে। স্বাধীন দেশের উপযুক্ত সংগীত মন্ত্র আওড়ানোর মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না। আমি মুক্তি চাই ব’লেই আপনার সংগীতরচনার ঐতিহাসিক সার্থকতা ও অধিকার স্বীকার করি। সে মুক্তি আমাদেরই মুক্তি জানি ব’লে আপনার রচনাকে বিদেশী সংগীতের সঙ্গে তুলনা করি না; আমাদেরই পরিচিত অন্য সংগীতের পাশে বসাই, তারই সঙ্গে যোগসূত্র খুঁজি। যখন নূতনের সঙ্গে পুরাতনের গরমিল দেখি তখন মাত্রা গরমিলের জন্যই নূতনকে অবহেলা করি না; আমাদের সংগীত-পদ্ধতির শ্রীক্ষেত্রে তাঁকে ঠাঁই দিই, হরিজন বলে তার প্রবেশ নিষিদ্ধ করি না। আমার বিশ্বাস আপনার সংগীতকে সংগীতের হরিজন বললেও তার অপমান করা হয় না। ভারতীয় কৃষ্টিরক্ষার ভার যদি এতদিন কেবল পুরোহিতসম্প্রদায়ের হাতেই থাকত, তা হলে সংস্কৃতির ধারা এতদিন মরুতেই সারা হত। কিন্তু–হয় নি, হয় নি গো, হয় নি হারা। এই হরিজনেরাই পাণ্ডাপূজারীর হাতের বাইরে গিয়েই সৃষ্টির সামর্থ্য অর্জন করেছে। আমাদের সংস্কৃতির ধারা যদি এখনো নৌবাহ্য থাকে তো ঐ হরিজনেরই কৃপায়। লোকসংগীতই মার্গ ও দরবারী সংগীতের কালান্তরে নিজের রক্ত দিয়ে প্রাণসঞ্চার করে এসেছে। পরে, অকৃতজ্ঞও হয়েছে সনাতনপন্থীরা। ইতিহাসেও প্রমাণ আছে–আকবর বাদশাহের দরবারে গোয়ালিয়র অঞ্চলের চাল, অর্থাৎ নবপ্রবর্তিত ধ্রুপদ শুনে আবুল ফজল আফসোস জানিয়েছিলেন। সেকালের ধ্রুপদ নাকি হরিজন-সংগীত–অর্থাৎ দরবারের অনুপযুক্ত বিবেচিত হত! মাদ্রাজের বড়ো বড়ো পণ্ডিত ও ওস্তাদ এখনো তানসেন-প্রবর্তিত উত্তর-ভারতীয় গায়কি-পদ্ধতিকে অহিন্দু যবনদুষ্ট ও ভ্রষ্ট বলে থাকেন, আমি নিজ কানে শুনেছি। বলা বাহুল্য আমরা উত্তরভারতীয়রা ঐ মতে সায় দিই না। ডাঃ সুনীতিকুমারের মতো হিন্দুও তানসেন সম্বন্ধে প্রবাসীতে উচ্চপ্রশংসাপূর্ণ প্রবন্ধ লেখেন! আমাদের মধ্যে অনেকেই তানসেনকে সংগীতের অবতার গণ্য করেন। আপনি

কয়েক শতাব্দী পরে ঐ রকম পদে অধিষ্ঠিত না'ও হতে পারেন। কিন্তু, আপনার সংগীতরচনায় ও সংগীতে মুক্তিদানের যুক্তির বিপক্ষে মন্তব্য কখনো কখনো ধ্রুপদের বিপক্ষে আবুল ফজলের আপত্তির পুনরুক্তি শোনায় ব'লেই সৃষ্টির ঐতিহাসিক অধিকার ও কর্তব্য থেকে আপনাকে বঞ্চিত ও মুক্ত করতে পারি না। সংগীতের যদি প্রাণ থাকে তবে তার ইতিহাসও থাকবে, যদি তার ইতিহাস থাকে তবে সেই ঐতিহ্যকে রক্ষা করা–তার সাথে যুক্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে তাকে রূপ দেবার দায়িত্ব–কখনো কোনো স্বাধীনতাপ্রিয় ব্যক্তির ঘুচবে না; তাকে ভেঙে গড়ার কর্তব্য থেকে কোনো স্রষ্টাই অব্যাহতি পাবেন না। আমাদের দেশের বড়ো বড়ো রচয়িতা সস্তায় অব্যাহতি পেতে চান নি। আমাদের সংগীতের ইতিহাস অনুকরণের তমসায় আচ্ছন্ন নয়। সে যাই হোক, কোনো তুলনা না করে বলছি, আপনার সংগীতরচনায় এই দায়িত্ববোধ ও কর্তব্যজ্ঞানের পরিচয় পাই।

আপনি নিজে, ভদ্রতাবশত, আপনার সংগীতের কোনো উল্লেখ করেন নি। ভালোই করেছেন। আমি উল্লেখ করছি, কারণ, আমি বুঝেছি–মনের সঙ্গে লুকোচুরি করে লাভ নেই। আমার বিশ্বাস যে, আপনি সংগীতরচয়িতা এবং আপনার রচনার সাংগীতিক মূল্যও আছে। কত বেশি কত কম, কার তুলনায়, এ-সব আলোচনা এ ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক। তর্কের খাতিরে এবং আমার মজ্জাগত শান্তিপ্রিয়তার জন্য মেনে নিচ্ছি যে, আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ রচয়িতা নন। তা ছাড়া, আপনি যতই নিষ্কামভাবে আলোচনা করুন-না কেন, সংগীতসম্বন্ধে আপনার মতামতে আপনার নিজের রচনাপদ্ধতির ছায়াপাত হবেই হবে। উপরন্তু সেই মতামতকে এক হিসাবে আপনার সংগীতের ব্যাখ্যা ও সমর্থনও বলা চলে। সাহিত্যে অন্তত দেখেছি যে, আপনি নিজেই নিজের একজন উৎকৃষ্ট ভাষ্যকার।

অতএব মিল হল গতিপ্রিয়তায় এবং সৃষ্টির ঐতিহাসিক অধিকার-স্বীকারে। আর-একটি মিলনের ক্ষেত্র নির্দেশ করছি। আমিও রচনার প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা দেখাবার স্বপক্ষে, কারণ আমি উৎকৃষ্ট ঘরানার গান শুনেছি। আমাদের সংগীতে অন্তত দুটি বিভাগ আছে। প্রথমত আলাপ, যাতে কথা নেই কিংবা ব্যবহৃত কথা সম্পূর্ণ নিরর্থক এবং যার একমাত্র উদ্দেশ্য রাগিণীর বিকাশসাধন। দ্বিতীয়ত বন্দেশী, যাতে শব্দ আছে, শব্দের অর্থ আছে, যদিও রাগিণীর বিকাশ সেই অর্থের সা রি গা মা'য় অনুবাদ নয়। বন্দেশী গানে 'বন্দেশ' (composition) অর্থাৎ রচনার মেজাজটাই

(temper : mood) সুরের বিকাশকে ধারণ করে, তার রূপের কাঠামো জোগান দেয়, গতির সীমা করে। ধ্রুপদে এই বন্দেশী পদ্ধতির চমৎকার পরিচয় মেলে। কোনো ধ্রুপদিয়া (অনেক ধামারিও) গাইবার সময় তান বিস্তার করেন না। এমন-কি অযথা বাঁটোয়ারার দ্বারা রচনার সৌকর্যকে বিধ্বস্ত করাও ধ্রুপদে প্রশস্ত নয়। যাঁরা পাকা ঘরানার খেয়াল গান, তাঁরাও রচনার অন্তঃপ্রকৃতি বুঝে তানের সাহায্যে রচনারই রূপ উদ্‌ঘাটিত করেন। ভীমপলশ্রীর দুটি বিখ্যাত খেয়াল আছে, ‘অব তো সুনলে’ ও ‘অব তো বঢ়ি দেবর’। কিন্তু দুটির গঠনসৌষ্ঠব পৃথক। যে খেয়ালিয়া বন্দেশের গঠনতারতম্য না স্বীকার ক’রে স্বকীয় প্রতিভারই জোরে ভীমপলশ্রীর ঐশ্বর্য দেখাতে তৎপর সে সাধারণ শ্রোতাকে চমক লাগাতে পারে, কিন্তু ওস্তাদের কাছে তার খাতির নেই। বালাজীবোয়া বিষ্ণুদিগম্বরের মুখে একটি খানদানী (হদ্দুখাঁনি) চালের গানের ঐ প্রকার স্বাধীন বিকাশ শুনে দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন বলে শুনেছি। এবং ব্যতিরেকের জন্য দুঃখ প্রকাশ আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক। যে দেশে বেদের উচ্চারণ ভ্রষ্ট করলে মহাপাতকী হতে হয় সে দেশে বন্দেশী অক্ষরের সুরগত সমাবেশ ভঙ্গ করতে লোকে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার দোহাই পাড়ে কেন বুছি না। তার পর, ঠুংরীতেও নায়ক-নায়িকা আছে, সেগুলি হল রচনার মূলভাব–যেমন কীর্তনে বিরহ মান প্রভৃতি। শ্রেষ্ঠ ঠুংরী গায়ক-গায়িকা কত সাবধানে শব্দ উচ্চারণ করেন, কী রকম শ্রদ্ধার সহিত মূলভাবের ও রচনার মর্যাদা দেন যদি কেউ মন দিয়ে লক্ষ্য করে থাকেন তা হলে তিনি কখনো আমাদের গায়কিরীতিকে স্বাধীনতার নর্তনভূমি বলতে চাইবেন না। আমার বক্তব্য হল এই : আমাদের বন্দেশী গায়কিতে রচনাকে মর্যাদা দেওয়াই রীতি। এক আলাপিয়া ছাড়া অন্য সব ভালো ওস্তাদেই স্বীকার করেন যে, মর্যাদা কেবল শব্দেরই প্রাপ্য নয়, রাগিণীরও নয়, সুর ও কথা মিলে যে রস জন্মায় কেবল তারই প্রাপ্য। আবার বলি–যখন কোনো ওস্তাদ রাগিণীরই বৈচিত্র্য দেখাতে রচনার রূপগত ঐক্যের প্রতি শ্রদ্ধানিদর্শনে কার্পণ্য করেন তখন তিনি প্রথাসংগত গায়ক নন। জোর তাঁকে আলাপিয়া নাম দেওয়া চলে। সেইসঙ্গে অবশ্য এ কথা বলবারও অধিকার আমাদের আছে যে, তাঁর কোনো কথা ব্যবহার না করলেও বেশ চলত। অতএব, রচনার স্বকীয়তার প্রতি গায়কের কাছে আপনি যে দরদ প্রত্যাশা করেন সেটি আপনার প্রাপ্য। আপনি নতুন-কিছু চাইছেন না। কেবল জনকয়েক ওস্তাদকে তাদের গোটাকয়েক প্রথাবিরোধী বদ্ অভ্যাস ভাঙতে অনুরোধ করছেন, তাদেরকে আমাদেরই সংগীত-ইতিহাসের

অতীত গৌরবই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। এখানেও আপনি ভূমিকা থেকে ভ্রষ্ট নন, বরঞ্চ আগাছা তুলে পুরাতন রাজপথকে পদগম্য করতে প্রয়াসী। এখানেও আমাদের মিল, আমি রাজপথে বেড়াতে ভালোবাসি, সুবিধা অনুভব করি।

এইবার বোধ হয় আপনার সঙ্গে আমার গরমিলের ক্ষেত্র জরিপ করা সহজ হবে। ক্ষেত্রটি সংকীর্ণ; কিন্তু তার অস্তিত্ব উড়িয়ে দেব না, যদিও তাই নিয়ে মোকদ্দমা করতে রাজি নই। বিশ্বাস আছে আপনাকে বুঝিয়ে বললে সে জমিটুকু স্ব-ইচ্ছায় ছেড়ে দেবেন। এবং প্রতিবেশী হিসেবে আমার বদনাম নেই।

আমার নিজের বক্তব্য হল এই : আলাপে যখন রচনার মতো কোনো সৌষ্ঠবসম্পন্ন কথাবস্তুর দাবি স্বীকার করবার পূর্বোক্ত ধরনের বিশেষ ও জরুরি দায়িত্ব নেই, তখন আলাপের রীতিনীতি রচনার গায়কি-পদ্ধতি থেকে ভিন্ন হবেই হবে। রচনা হল কথা ও সুরের মিশ্রণে এক নতুন রসসামগ্রী। আলাপ কিন্তু প্রাথমিক, রাগিণীর রূপবিকাশই তার একমাত্র কাজ; এখানে না আছে অর্থবাহী কথা, না আছে কথাবাহী অর্থ। আলাপের গন্তব্য নেই, অথচ উদ্দেশ্য আছে। বিকাশের মধ্যেই নিহিত। উদ্দেশ্য রাগিণীকে reveal করা- উদ্দেশ্যসাধনের উপায় বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যস্থাপনা। ঐশ্বর্য দেখানো কোনো আর্টিস্টেরই কাম্য হতে পারে না, কিন্তু বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যস্থাপন নিশ্চয়ই ন্যায়সংগত। রচনায় পূর্ব হতেই ঐক্য দেওয়া আছে, সেটি রচয়িতার দান; আলাপে তাকে স্থাপনা করতে হবে, এটি হবে গায়কের সৃষ্টি। সেজন্য তার একটি অতিরিক্ত শক্তির প্রয়োজন। আলাপিয়ার সুবিধাও রয়েছে–রচনার, বিশেষত কথার, বাঁধন তাকে মানতে হচ্ছে না। ঐশ্বর্য দেখানোতে শক্তির অপচয় ঘটে, সেইজন্য নির্বাচন তাকে করতেই হবে। বন্দেশী গানে শক্তির ব্যবহার রচনার সৌষ্ঠবরক্ষায়; আলাপে শক্তির ব্যবহার রাগিণীর ক্রমিক বিকাশে, তার জ্ঞানকৃত বিবর্তনে। আলাপই আমাদের pure music; আপনি চিঠিতে আলাপকে বাদ দিয়েছেন। সংগীত বলতে আমি আলাপকেও বুঝি। আর্টের দিক থেকে বন্দেশী বড়ো কি আলাপ বড়ো এই প্রশ্নের উত্তর আর্টিস্টের কৃতিত্ব-সাপেক্ষ এবং শ্রোতার রুচি-সাপেক্ষ। অর্থাৎ, এ বিচার বিশেষের ওপর নির্ভর করে ব'লেই তাকে কোনো সামান্য বাক্যে পরিণত করা চলে না। কিন্তু আধিমৌলিক বিচারে, ontologically, আলাপকে প্রাধান্য দিতে হয় সংগীতও একপ্রকার জ্ঞান; প্রথমে কোনো জ্ঞানই নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে না–অথচ স্বাধীন না হলে

তার বৃদ্ধি নেই। বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণের জন্য জ্ঞানকে আশ্রয় পরিত্যাগ করতে হয়, তবেই তার মূলতত্ত্ব আবিষ্কৃত হয়। তত্ত্বমূলের পাট করলে পরগাছা যায় মরে, গাছ তখন নিজের ফলফুলে শোভিত হয়ে স্বকীয়তার গৌরব অনুভব করে। জ্ঞান চর্চার এই হল স্বকীয়তাসাধন। পরের অধ্যায়ও অবশ্য আছে, কিন্তু সেটা গাছে অর্কিড ঝোলানোর মতনই। অতএব, আলাপের রীতিনীতি বাদ দেওয়া যায় না সংগীতআলোচনা থেকে।

ধরুন, ছায়ানটের আলাপ হচ্ছে। ছায়ানটের আরোহী অবরোহী, তার বাদী সম্বাদী, তার বিশেষ 'পকড়' দেখিয়ে ছায়ানটের ঘটস্থাপনা হল। কিন্তু সেইখানে থামলেই কি ছায়ানটের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হল–তার প্রকৃতি ফুটল? এ যে সেই ভক্তের কথা যিনি প্রতিমার মুণ্ডু পরাবার পূর্বেই বলেছিলেন, 'আহা! মা যে হাসছেন!' অন্য ভাষায় বলি–আমার আমিত্ব প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য নেতিবিচারের দ্বারা পার্থক্য-অনুভূতির কি কোনো প্রয়োজনই নেই? যে-সব যোগীর পূর্ণ সমাধি হয় তাঁদের বেলা তাঁরা আছেন এই যথেষ্ট। সাহিত্যে যেমন, আপনার লেখায়, পরেশবাবু ও মাস্টার মশাই তাঁরা সৎ, এর বেশি তাঁদের সম্বন্ধে জানবার প্রয়োজনই হয় না। এঁরা পূর্ণ, এঁরা রুদ্ধগতি, আত্মসমাহিত, আত্মস্থ, আমাদের নমস্য। এঁরা হলেন শেষের কবিতা কিন্তু অন্যের পক্ষে 'বহুর্ভবামি' অস্তিত্বের বিকাশেচ্ছা নয় কি? আমি হব–বহু হব–এইটাই আর্টিস্টের প্রাণের কথা। আমি আছি–যেমন যোগীর। বহু হওয়াই যখন আর্টিস্টের ধর্ম, যখন সে যে-বস্তুর অন্তর উদ্‌ঘাটিত (reveal) করতে চায়, তার প্রকৃতি বুঝতে কোনো subtance কি গুপ্তসত্তা বোঝে না, তখন revelation এর জন্যই mere statement করে নীরব থাকলে তার চলে না। অতিরিক্ত কর্তব্যের মধ্যে একটি হল–ক-বস্তু খ-বস্তুর নয় প্রমাণ করা। যেটুকু না হলে নয় তারই আভাস দিয়ে মুখবন্ধ করলে আর্টিস্টের বহু হবার প্রবৃত্তিকে বঞ্চিত করা হয়। সাধারণের বেলাতেও তাই–সাধারণ শ্রোতাও যখন শুনছে তখন সে আর্টিস্টের সঙ্গে সঙ্গে বহু হচ্ছে। বহুলতাকে নয়, বহু হবার প্রবৃত্তিকে খাতির না করলে আর্টকে ঘৃণা করা হয়। বহুলতার মূলে আছে 'বহুর্ভবামি'র তাগিদ। বিশেষত আমাদের আলাপে। আমাদের আলাপ অবিরাম গতিশীল, তার প্রকৃতিই হল procession। অতএব, ঠিক তার revelation হয় না, হয় এবং হওয়া চাই revealing।

এখন ছায়ানটের আলাপ চলুক। প্রথমেই সা'রে, গ'ম'প' প'রে' গ'ম'রে' সা' নেওয়া হল, তার পর আরোহীতে সা'রে রে'গা গা'মা' মা'পা' নিয়ে ধৈবত আন্দোলিত ক'রে গলা ওপরের সুরে

পৌঁছল, অবরোহীতে ঐ প্রকার শুদ্ধস্বরগুলি ব্যবহার করে পা'রে' গা'মা' পা' এই মীড়টি নিয়ে রিখাবে গলা থামল–কোনো স্বরই বিবাদী হল না। তবুও কি ছায়ানট রাগিণী গাওয়া হল? আমার মতে এখনো হল না, হল কেবল ছায়ানটের blue print টুকু, ডিজাইনটুকু। শ্রমবিভাগের ফলে স্থপতিবিদ্যায় ডিজাইনের কদর বেড়েছে জানি, কিন্তু নীল রঙের কাগজে সাদা আঁচড় দেখে বসবাসের সুখভোগ কি স্বাভাবিক? আপনি বলবেন কল্পনার উদ্রেক করানোই আর্টিস্টের কর্তব্য। কিন্তু কল্পনাও নানা জাতের, ডিজাইনারও নানা রকমের। সেইজন্য নীচের ও ওপরের তলার, স্নানের ঘরের, মায় সিঁড়ির ও cross-section চাই, এলিভেশনের লোভ দেখিয়ে ছেড়ে দিলে চলবে না। তার ওপর চাই নির্মাণ, চাই গৃহপ্রবেশ, চাই বসবাস–এ ঘরে বাসর, ও ঘরে মৃত্যু, এ জানলা দিয়ে লবঙ্গলতিকার উগ্রগন্ধ পাওয়া ওটা দিয়ে নারকেল গাছের সোনালিফুল থেকে গাঢ় সবুজ ডাবের পরিণতি দেখা, এ দেয়ালে সিঁদুরের দাগ, ওটায় খুকীর আঁচড়, এ পর্দা মেজদির, ওটা সেজ বৌমার তৈরি–সব চাই, তবেই না গৃহ! উপমা ছেড়ে দিই–শ্রীকৃষ্ণকে ভগবদ্‌গীতা শোনাতে চাই না। ছায়ানটের প্রাণপ্রতিষ্ঠার পর (প্রতিষ্ঠা কথাটি ঠিক নয়, কারণ আলাপের প্রাণই হল গতি) বিস্তারের দ্বারা তাকে মুক্তি দিতে হবে।

আলাপবিস্তার অনেকটা ভারতসাম্রাজ্যের non-regulated'র মতন তার রীতিনীতি–সুনির্দিষ্ট পন্থাও আছে, তবে সেটি বন্দেশী রাগিণীর রূপ-প্রকাশের নয়। হয়তো আপনি ছাড়া আর কেউ সেই নিয়মকে ভাষায় ব্যক্ত করতে পারে না। তবে পনথা আছে জানি, কারণ, শুনেছি। প্রথমে ধীরে, গমক ও মীড়ের সাহায্যে তান না দিয়ে তার পর মধ্যলয়ে খুব ছোটো তানের সঙ্গে মীড় মিশিয়ে, তার পর–সব রাগে নয়–গোটা কয়েক রাগে দ্রুত ও বিচিত্র কর্তব্যের দ্বারা আলাপ করা হয়। সাধারণত আলাপে খেয়াল ঠুংরী ও টপ্পার তান ব্যবহৃত হয় না। অন্য অলংকার, যেমন ছুট্‌ মূর্ছনা প্রভৃতিরও প্রয়োগ চলে। তার পর বাণী আছে। সেই বাণীর অবলম্বনেই বোল্‌-তান দেওয়া হয়। এই হল আলাপের পন্থা, যার প্রধান কথা–পরম্পরা। মীড়ের পরই জমিন তৈরি হতে-নাহেতেই তানকর্তব চলে না। সবই আসতে পারে, আসবেও, তবে যথাসময়ে। এইখানেই নির্বাচনক্রিয়া। বড়ো আলাপিয়ার পদ্ধতি সুসংগত, তার নির্বাচন যথেচ্ছাচারিতা নয়। ভালো ঘরানায় পথটি পাকা। যদি কোনো ওস্তাদ প্রতিভার জোরে আরো ভালো রাস্তা তৈরি করে তা হলে তাকে ও তার পথকে কদর করবই করব। আলাপে এইপ্রকার প্রতিভার সাক্ষাৎলাভ দুর্লভ, আলাবন্দে খাঁর ঘরানা ভিন্ন। তবে অন্য গানে আবুল করিমকে

আমি খুব উচ্চস্থান দিই। আপনি বোধ হয় শুনেছেন যে, আবুল করিম ফৈয়াজের মতন ঠিক ঘরানা গাইয়ে নয়। সে অনেক সময় বন্দেশ ভুলে যায়-কিংবা দু-একটি লাইন গায়, বড়ো ওস্তাদে তাকে সেজন্য ঠাট্টাও করে, হিন্দোলে শুদ্ধ মধ্যম দেয়, ভৈরবীতে শুদ্ধ পর্দা লাগায়, গায় নিজের মেজাজে। কিন্তু সে মেজাজে কী মজা! এম্‌দাদ হোসেন কি ঘরানা বাজিয়ে ছিলেন? কিন্তু এত রসিক সেতারী জন্মায় নি। এম্‌দাদ খাঁ নিজেই ঘর সৃষ্টি করে গিয়েছেন-এখন সারা ভারতে এম্‌দাদী চালই চলছে। সেনীয়া সেতারীর বাজিয়ে হিসেবে খাতির কম।

আলাপে পরম্পরায় রীতি ঘরানা হিসেবে ভিন্ন হলেও তার নীতি বোধ হয় এক ভিন্ন দুই নয়। প্রথম পদ দ্বিতীয়কে পথ দেখাবে, দ্বিতীয় তৃতীয়কে-এই চলবে। মূল অবশ্য ছায়ানট, অর্থাৎ অন্য রাগিণী নয়। মূলটাই ঐক্যবিধায়ক। এখানে ঐক্যজ্ঞান শেষ জ্ঞান নয়, এখানে ঐক্য সম্পূর্ণতার নামান্তর নয়। মূলগত ঐক্য বিস্তারের মধ্যেই ওতপ্রোত রয়েছে। গতিশীল ক্রমবর্ধমান শ্রেণীর ঐক্য এই ধরনের হতে বাধ্য। যদি বৃত্ত হিসেবে ধরেন, তা হলে ক-বিন্দু থেকে বেরিয়ে সেই ক-বিন্দুতে ফিরে আসাই হবে গতির নিয়তি। কিন্তু গানের, বিশেষত আলাপের গতিকে বৃত্তাকারে যদি পরিণত করতেই হয়, তা হলে asymptote এই করা ভালো। যে অসীম পথের যাত্রী তাকে ঘরের সীমানায় আবদ্ধ রাখলে কী ক্ষতি হয় আপনি নিজে জানেন। আপনিই না স্কুল পালাতেন? আপনিই না স্বাধীন দেশে বছরে অন্তত একবার ঘুরে আসেন? ‘বনের হরিণ’ গানটি আমার কানে ভেসে আসছে। গতরাগের গানকে আপনি আলোছায়ার প্রাণ বলেছেন। আকাশে আজ হঠাৎ মেঘ করেছে, জোরে হাওয়া চলছে-মেঘ ও আলো ছক আঁকতে আঁকতে কোথায় যাচ্ছে কে জানে! এই তো আমাদের আলাপ।

লোকে অস্থায়ীকে (কথাটা স্থায়ী, উচ্চারণবিভ্রাটে অস্থায়ী হয়েছে) একটু ভুল বোঝে। গানের কোনো দুটি চরণ (phrase) এক নয়। আলাপ যখন শুরু হয় তখনকার প্রথম চরণ, আর ঘুরে এসে যেখানে স্থিতি সেই ‘প্রথম’ চরণ, এক বস্তু নয়। এমন-কি আরোহির স্বর আর অবরোহীর স্বর এক নয়-মালকোষে ওঠবার সময় ধৈবত কোমলের একটু বেশি, নামবার সময় সত্যই কোমল। তেমনি জৌনপুরীর ধৈবত আরোহীতে কোমলের চেয়ে একটু চড়া, অবরোহীতে কোমলই। ধ্রুপদের অস্থায়ী ও সঞ্চারী-অন্তরা ও আভোগী কি সমধর্মী? উঁচু অক্টেভের ছক কি নিচু অক্টেভের ছকের পুনরাবৃত্তি? কানাড়ার সা রে গা-কোমল কি মা পা ধা-কোমলের হুবহু নকল? অথচ মধ্যমকে সুর করলেই তাই হয়, অবশ্য tempered scale –সেইজন্যই তো হিন্দুস্থানী

গান হার্মনিয়মের সঙ্গে গাওয়া চলে না। গানে কেন, সর্বত্রই যেখানে জীবন সেইখানেই এইপ্রকার যান্ত্রিক পুনরাবৃত্তি অসম্ভব। আপনি নিজেই লিখেছেন-জীবন মানেই নব নব রূপের প্রকাশ। অবশ্য, সৃষ্টির মধ্যে unity আছে, কেবলই বিবর্তন নয়। কিন্তু, সেটি মূলের, পূর্বেই বলেছি। আমি ইতিহাসে dialectic process বাধ্য হয়ে স্বীকার করি। জোর ক'রে রামরাজত্বে ফিরে যেতে পারি কি? চরখা ঘুরুলেই কি উপনিষদ লেখা হয় না মানুষে আপনা হতেই তত্ত্বজ্ঞানী হয়ে ওঠে? A Yankee at King Arthur's Court হাসবার সামগ্রী।

আমার বক্তব্য হল এই–পরিশেষে ঐক্য চাইতে তিনিই পারেন যিনি সৃষ্টি স্থিতি ও লয়ের অতীত। 'ইতিমধ্যে'র অধিবাসীরা যখন শেষের ঐক্য চান তখন জীবনের organic process কে একটা মনগড়া অসীম উদ্দেশ্যের উপায় বিবেচনা করেন। আমার সন্দেহ যে, আপনি আলাপ সম্বন্ধে teleologically চিন্তা করেছেন। যে জিনিস চলছে, চলতে চলতে পথ কাটছে, চলিষ্ণু হয়েই পূর্ণতার দিকে এগুচ্ছে, তার আবার শেষ কোথায়? আলাপের শুরু হল সীমার মাঝে। তার পর মূল বাঁচিয়ে, দু ধারের সীমার মধ্য দিয়ে তার গতি অসীমের দিকে। দিক্ কথাটি লেখা উচিত হল না, কারণ, অসীমের দিক্ নেই– organic processএরও নেই। ব্যাপারটি সাদি কিন্তু অনন্ত। যাওয়াটাই তার মজা, তার adventure। এই শেষহীনতাই তার জীবন। তবে এ জীবনেরও ধর্ম আছে।

মূল বাঁচাবার পরই যাত্রা শুরু হল। ছায়ানটের এই তানে দেখুন বিলাবল, আবার অন্য তানে শুনুন কল্যাণের অঙ্গ। একবার মাত্র তীব্র মধ্যম ছোঁওয়া হল, বেশি নয়, সামান্য; আর-একবার পঞ্চম থেকে মিড় দিয়ে রিখাবে নামল, আবার তীব্র গান্ধার–এই হল কল্যাণের আভাস। অতএব কল্যাণ ঠাটের যত রকম রাগিণী আছে তার সঙ্গে ছায়ানটের সাদৃশ্য দেখানো চাই– কারণ, ছায়ানট কী নয় তাও দেখাবার প্রয়োজন আছে। সেই রকম বিলাবল ঠাটের রাগিণী, বিশেষত আলাহিয়ার সঙ্গে তার পার্থক্যও রয়েছে। অনেকটা endogamy ও exogamy সম্বন্ধের মতন, যেজন্য সুপাত্র খুঁজতে বাজার উজাড় করতে হয়। ছায়ানটকে কত হাত থেকে বাঁচাতে হয় ভাবুন–কামোদ, শ্যাম, কেদার, হাম্বীর, গৌড়-সারঙ্গ–সব গণ্ডির পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে। গায়ক এক-একবার গণ্ডি থেকে বেরিয়ে তাদের সঙ্গে মিশল। কিন্তু, আবার ঘরে এল জাত বজায় রেখে। এই মেশার ভেতর স্বকীয়তা বজায় রাখা তান-কর্তবের একটি প্রধান উদ্দেশ্য। রাগিণীর যত বন্ধু, বন্ধুদের সঙ্গে যত প্রকার মেলামেশার উপায় আছে, তত প্রকারের তান সম্ভব। (এখন দেখছি সতীনের উপমা দিলেও মন্দ হত না।)

তানকর্তবের অন্য কাজও আছে, তার উল্লেখ মাত্র করছি। গম্‌কিতে গাম্ভীর্য, মীড় ও আশে মাধুর্য, মুড়কিতে অলংকার, জম্‌জমায় ঐশ্বর্য সূচিত হয়। তবে বুঝে তান ছাড়তে হবে–নির্বাচনের হাত থেকে রেহাই নেই। বন্দেশী গানে রচনার মেজাজ এবং আলাপে সুকুমার পারম্পর্যই হল নির্বাচনের principle। ঘরানায় নির্বাচনের দায়িত্ব সহজ করে দিয়েছে মাত্র। কিন্তু, নির্বাচন-প্রক্রিয়াটি কঠিন ব'লে তান বর্জন করাটা স্নানের টাবের জলের সঙ্গে খোকাকে নর্দমায় ফেলে দেবারই মতন।

আপনি সুন্দরীর সঙ্গে রাগিণীর তুলনা করেছেন, সেই হিসাবে তানকে অলংকার বলেছেন। প্রেয়সীকে দিয়ে স্যাকরার শখ মেটাতে বারণ করেছেন। বেশ, মেটাব না। কিন্তু এই সংক্রান্তে আপনারই একটি মন্তব্য স্মরণ করিয়ে দিই। আপনি মুখে বলেছিলেন 'বেশ, সব অলংকারই চাই–কিন্তু একটি গানের কেন? আলাদা আলাদা গানে তার উপযোগী গহনা পরাও।'তা হলে, কী দাঁড়াল দেখছেন! হিন্দুসমাজ যে ভেঙে যাবে! আত্মহত্যার হিড়িক পড়বে। কারণ, একই সময় কোনো সুন্দরী তাঁর সিন্দুকের সব গহনা পরেন না, এবং একই সময় একটি সুন্দরীকে সব গহনা পরানোও যায় না। বাঙালি-সমাজে, সুন্দরীর দুর্ভিক্ষ হয়েছে। সত্য কথা এই, আলাপে ঐ প্রকার কোনো 'একই সময়' নেই, প্রত্যেক মুহূর্তই পিচ্ছিল।

ইতিপূর্বে পরম্পরা ও adventure কথা দুটি ব্যবহার করেছি। লিখতে লিখতে আরো অন্য কথা মনে হচ্ছে। ঐ সম্বন্ধে আরো কিছু বলতে চাই। আপনি লিখেছেন, 'ঘড়ি দেখি নি, কিন্তু অন্তরে যে ঘড়িটা রক্তের দোলায় চলে তাতে মনে হল এক ঘণ্টা পেরোল বা।'আমারও বিশ্বাস গান শোনবার সময় কলের ঘড়ি ব্যবহার করা উচিত নয়। নাগ্‌রার মতন ঘড়ি বাইরে রেখে আসা উচিত। রক্তের দোলায় যে সময় দোলে সেই organic time এর সঙ্গেই গানের সম্বন্ধ আছে। অবশ্য, রক্তের দোলটাই গানের দোল ভাবলে ভুল করা হবে। আমি organic কথাটি biological অর্থে ব্যবহার করছি না। অনেকের পক্ষে সংগীত-উপভোগটা নিতান্তই জৈব। বড়োলোকের বাড়িতে বিবাহ উপলক্ষে সংগীতকে appetiser হিসেবে ব্যবহার করা হয়। শরীর অসুস্থ হলে সব গানই দীর্ঘসূত্র, সুস্থ থাকলে সবই ক্ষণিকের মনে হওয়া স্বাভাবিক। থিয়েটার-সিনেমার গান ভাবুন। সে গান শুনতে পারি না, একান্তই জৈব বলে। সেখানে নায়কের প্রত্যাখ্যানের সঙ্গে সঙ্গে নায়িকা কাঁদতে থাকেন, এবং তাঁর ফোঁশ্‌ ফোঁশানির সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও বেহাগ শুনতে হয়। কিন্তু, আমরা সকলে মিলে কী পাপ করেছিলাম?

আপনি নিশ্চয় ‘রক্তের দোলা’ ঐভাবে লেখেন নি। আমি যে অর্থে organic time ব্যবহার করছি সেটি mechanical time এর বিপরীত। এই দুটোর মধ্যে স্বতঃই একটা বিরোধ রয়েছে, আপনার ‘কিন্তু’ কথাটিতেই সেটি পরিষ্ফুট। মানুষ ঘড়ি মানতে চায় না। খেয়ালের বশেই মানুষ সাধারণত সময় মাপে। utilityর রাজ্যে, কলেজে, ঘড়ি। বৃদ্ধারা বলেন, ‘দাঁড়াও বাছা, বলছি কবে–পুঁটু তখনো জন্মায় নি।’চাষাভুষোরা স্মরণীয় ঘটনা, ফসল বোনা, কাটা, প্লাবন ও জলকষ্ট দিয়েই সময় মাপে। ফ্যাক্টরি যে ফ্যাক্টরি, সেখানেও মজুররা যে তাই করে সকলেই জানেন এবং এই সাধারণ জ্ঞানটি পণ্ডিতে অনেক অঙ্ক ক’ষে ছক এঁকে উপলব্ধি করেছেন–প্রভুরা এখনো করেন নি। শ্রমিকের ক্লান্তি আসে আগ্রহের অভাবে। mechanical time হল ঘড়ির কাঁটা-মাপা ঘণ্টা, তার মাপ মিনিট ও সেকেণ্ডের যোগ-বিয়োগে। এবং যেখানে যোগ-বিয়োগই উপভোগের মাত্রা নির্ধারণ করে সেইখানেই ‘গান থামবে কবে’ প্রশ্নটি শ্রোতাকে উত্ত্যক্ত করে। ক্লান্ত শ্রমিকরাই বিকেলের দিকে ছুটির জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে। কিন্তু, সহজ আগ্রহ ও কালের হ্রাসবৃদ্ধির মাপ নেই, ছন্দ আছে। সে ছন্দ সংখ্যামূলক নয়, অর্থাৎ তার পিছনে matter কি motion -এর যান্ত্রিক পুনরাবৃত্তি নেই; আছে সেই-সব ঘটনা ও স্মরণীয় অভিজ্ঞতা যার দরুন বৃদ্ধির হার কমে বাড়ে, তার অবস্থান্তরপ্রাপ্তি হয়। এর তাগিদ থামবার নয়, বাড়বার। অবশ্য, এই প্রকার development কালাতিপাতকে বলাই ভালো। বাংলায় কী প্রতিশব্দ? এক কথায়, mechanical time -এর স্বভাব হল পুনরাবর্তন, organic time এর হল ঐতিহাসিক উদ্‌ঘাটন। প্রথমটি হল succession of mathematically isolated instants; দ্বিতীয়টি accumulation of connected experiences, অতএব তার ক্রিয়া cumulative। প্রথমটি গোড়ায় ফিরে আসতে পারে–ঘড়ির কাঁটা পিছিয়ে দিলে day-light saving হয়। কিন্তু, দ্বিতীয়টি চলছে নিজের গোঁ-ভরে, তার পরিণতি নেই। প্রথমটিতে যা হয়ে গিয়েছে সেটি গত, ভূত, সত্যকারের ভূত। দ্বিতীয়টিতে যা হয়েছিল সেটি বর্তমানে রয়েছে, আবার ভূত ও বর্তমান মিলে ভবিষ্যৎকে তৈরি করবার জন্য সদাই প্রস্তুত। এগিয়ে চলবার খাতিরে, ভবিষ্যতের জন্য, organic time সব করতে পারে–নতুন, রবাহূত, অনাহূতকে বরণ করতেও সে রাজি। হিন্দুস্থানী সংগীতে আলাপের কাল organic–যে দেশে ঘড়ির dictatorship সে দেশের সংগীতের কাল mechanical হয়তো হতে পারে, ঠিক জানি না। ভাগ্যিস আমরা অসভ্য।

আমি বলছি–আলাপের কালকে ঘড়ির কাঁটা, এমন-কি রক্তের যান্ত্রিক হ্রাসবৃদ্ধি দিয়ে পরিমাণ করা যায় না। আলাপ যে বরফের গোলার মতন বাড়তে বাড়তে চলেছে। রাগিণীর রূপ যে কেবলই উন্মুক্ত হতে হতে চলেছে। আপনি বলছেন করা চাই, খুব খাঁটি কথা, আলাপই তো রাগিণীর (রচনার কথা আলাদা) সত্যকারের unfolding – চীনেদের scroll-painting -এর মতন–আলাপই সত্যকারের ইতিহাস, তাই প্রতিমূহূর্তের ইতিহাস। অবশ্য, রাগিণীরই ইতিহাস, গায়কের গলা সাধার ইতিহাস নয়। রাগিণী ব'লে পৃথক বস্তু নেই, প্রকাশেই তার অস্তিত্বস্ফুরণ।

এই ভাব থেকে আপনার ব্যবহৃত 'অনিবার্য' কথাটির বিচার চলে, তার তত্ত্ব উপলব্ধি করা যায়। অন্য সব আর্টে অনিবার্য সমাপ্তি আছে ইঙ্গিত করেছেন। মানি। কিন্তু, প্রত্যেক আর্ট্‌বস্তুর সময় যখন organic, অর্থাৎ অভিজ্ঞতাসাপেক্ষ, তখন একই নিয়মে সব আর্টের অনিবার্য সমাপ্তি স্থিরীকৃত হবে কী করে? সাহিত্যই ধরা যাক–রামায়ণ ও রঘুবংশের সমাপ্তি কি এক নিয়ম মানে? Henry IV আর Macbeth এর চাল কিএক কদমে? Bernard Shaw ও তাঁর দেশবাসী Sean O'Casey-র নাটক কি একই হারে একই স্থানে থামে? Brothers Karamazov একটি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস, Fathers and Children ও তাই। প্রথমটিতে এক দিনের ঘটনাই ৪০০।৫০০ পৃষ্ঠা জুড়ে বসে আছে, তার পর গল্প দ্রুত চলল, শেষ বেশও ঠিক নেই; দ্বিতীয়টিতে একটি চমৎকার ছেদ রয়েছে। আজকালের নভেলিস্ট (Preistley নয়) Proust ও Joyce কে আপনার ভালো লাগে কি না জানি না–কিন্তু, তাঁদের লেখার সীমা কোথায়? দুজনের নভেলকে সংগীতের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে–যেন counterpoint এর খেলা। উপামাটা উপযুক্ত; দুজনেই stream of consciousness নিয়ে ব্যস্ত, দুজনেরই কারবার স্মৃতির উদ্‌ঘাটনপ্রক্রিয়া–কেউ exhibit করছেন না। আপনারই 'গোরা' ও 'চার অধ্যায়' ধরুন। শেষেরটায় লয় ধুনে, যেন, hectic hurry তে, যেটি তার বিষয়বস্তুর নিতান্ত ও অত্যন্ত উপযোগী। কিন্তু, 'গোরা'র চাল কি ভারী নয়? যেন গজগামিনী। আমাকে ভুল বুঝবেন না, আমি ভালো মন্দ বিচার করছি না–দেবী অশ্বেই আসুন, নৌকাতেই আর গজেই আসুন, দেবী হলে পুজো করব–তাতে কোনো ত্রুটি পাবেন না। আমি বলছি–এক সাহিত্যেই অনিবার্য সমাপ্তির সীমানা, রীতিনীতি, ভিন্ন ভিন্ন। 'চার অধ্যায়' বাঁশি বাজিয়ে শেষ করলেন, আর 'গোরা' লিখতে দু ভলুম লাগল–কেন? 'চার অধ্যায়' পাঁচ অধ্যায় হয় না যেমন, 'গোরা'ও তেমনি চার অধ্যায়ে শেষ হয় না।

ছবি ধরুন–একখানা রাসলীলার ছবি আছে, রাজপুত কলমের। মধ্যে কৃষ্ণ-রাধা, চার ধারে গোপিনীর দল। যদি গোনা যায় তা হলে এক মুখ দেখে দেখে দর্শকের চোখে ও মনে সহজেই ক্লান্তি আসতে পারে। কিন্তু ছবিটার ধর্মই ভিন্ন, কৃষ্ণরাধা যুগ্ম-সমাহিত, এই বিভোর ভাবটি সংখ্যার পারিপার্শ্বিকে ফুটে উঠেছে ভালো। ছক হল ডিমের আকারের—যার রেখা ধরে দেখলে চোখ পিছলে যায়, কারুর মুখ দেখবার জন্য দাঁড়ায় না; সোজাসুজি কেন্দ্রস্থ নায়ক-নায়িকার অবস্থিত হয়। এখানে সংখ্যার উদ্দেশ্য ঐশ্বর্য দেখানো নয়, মধ্যকার চরিত্রকে অবকাশ দেওয়া। অবকাশ দেওয়া যায় ফাঁক রেখে, যেমন জাপানী চিত্রকর করেন; আবার অবকাশ দেখানো চলে সংখ্যারও সাহায্যে, যেমন টিনটরেটো একাধিক ছবিতে করেছেন। এখানে সংখ্যার মূল্য বহু নয়, statistical unity মাত্র। ব্যক্তিগত চরিত্রের অভাবে মধ্যস্থ রূপ বিকশিত করবার জন্য সংখ্যা তখন মুক্ত আকাশের সামিল। সংখ্যাও একপ্রকার relief। grouping-এর সাহায্যেও এ কাজ সম্পন্ন হতে পারে। বলা বাহুল্য ছবির সঙ্গে গানের তুলনা করছি না, আমি কেবল রূপের সঙ্গে সংখ্যার ও সীমানার উদ্দেশ্য-অনুযায়ী পার্থক্য প্রতিপন্ন করছি। মোদ্দা কথা–শেষ হবার অনিবার্যতা উদ্দেশ্যমূলক। আলাপের উদ্দেশ্যই যখন আলাদা (উদ্দেশ্য অর্থে ধৃতি বলছি) তখন বন্দেশী আর্টের অনিবার্যতার নিয়মাবলী কি এখানে প্রযোজ্য? তাই ব'লে নির্বাচনের দায়িত্ব নেই এ কথা বলব না। পূর্বেই লিখেছি আমি dialectic process মানি। লেনিন এরই একটা নতুন তত্ত্ব আবিষ্কার করেছেন (সংগীতে লেনিন! কেন নয়? তিনিও দার্শনিক ছিলেন; তিনিও দর্শন বলতে making history বুঝতেন, interpreting it নয়; তাঁরও মন গতিশীল ছিল)–তত্ত্বটি হল এই যে, quantity থেকেই quality র পরিবর্তন হয়। বাস্তবিক পক্ষে, সংখ্যা আর গুণের মধ্যে বেশি ফারাক নেই। এই সম্পর্কে আপনার বন্ধু Otto Kahn এর একটি গল্প মনে পড়ল। একবার Cecil de Mille, Otto Kahnকে তাঁর আঁকা ছবি The King of Kings দেখাতে নিয়ে যান। কথোপকথনটি Beverley Nichols লিপিবদ্ধ করেছেন।

de Mille: এই দৃশ্যটিতে কত জন লোক আছে ভাবেন?

Khan: ধারণাই নেই।

M: আড়াই হাজার ভাবছেন কি!

□: কিছুই নয়।

□ : আপনি highbrow।

K : Velasquez l-এর Conquest of Breda দেখেছেন? দেখলে মনে হবে পিছনে লাঠি সড়কির বন গজিয়েছে। যদি গোনেন, তবে টের পাবেন যে মোটে আঠারোটি। ... Velasquez was an artist.

গল্পটি আমার বিপক্ষে যাচ্ছে না। এই ছবিটারই একটি চমৎকার বিশ্লেষণ পড়েছিলাম, বোধ হয় Harold Speed- এর লেখায়। বইটাতে ঐ ছবিটার রেখা-রচনাও দেওয়া আছে। দেখে ও পড়ে বুঝেছিলাম যে সম্মুখের তেরছা রচনার relief দেবার জন্য ঐ সরল সমান্তরাল রেখার বাহুল্য। এখানেও সংখ্যা, আবার de Mille -এর ছবিতে সংখ্যা। প্রথমটিতে সংখ্যা গুণ হয়ে উঠেছে; দ্বিতীয়টিতে হয়েছে ভার, ক্রুশেরও অধিক। অতএব সংখ্যার নিজের কোনো দোষগুণ নেই, বেশি হলেই থামবার তাগিদ নেই। এ-সব ক্ষেত্রে অনিবার্যতা উদ্দেশ্য বিষয়বস্তু এবং রীতির ওপর নির্ভর করছে। এখানে সীমা-নির্ধারণের কোনো natural law নেই, আমি কোনো natural law ই মানি না।

একটি অনুরোধ ক'রে চিঠি শেষ করি। যে ভালো শাড়ি ও গহনা পরতে জানে তাকে একই সময় একের বেশি দুটি পরতে হয় না। কিন্তু রোজ রোজ একই শাড়ি গহনা পরলে সেই সুন্দরীকে কি ভালো দেখায়? সুন্দরীরা কিন্তু অন্য কথা বলেন। আপনি যতই সৌন্দর্যের connoisseur হন-না কেন, নারীর সাজসজ্জা সম্বন্ধে নারীদের মতই শিরোধার্য। সে যাই হোক, আপনার অভিমতটি ছাপিয়ে দেব? অনেকেরই কৃতজ্ঞতা অর্জন করবেন, কেবল Bengal Stores -এর ছাড়া।

অনেক কিছু লিখলাম। পত্রটি সংগীতের আলাপের মতোই ধরে নেবেন। গান গাইতে জানি না, জানলে চিঠিটাও হয়তো ছোটো হত।

পত্রের উত্তর চাই। অনেক মিল আছে বলেই গরমিলটা সাহসী হয়ে প্রকাশ করলাম। আমি তর্ক করি নি, আপনাকে হারাতেও চেষ্টা করি নি। আপনার কথাবার্তায় ও চিঠিতে যে নতুন আভাস পেয়েছি তারই ফলে আমার চিন্তাধারা খুলে গিয়েছে। সে ধারা আপনার সৃষ্টি হলেও তার দিক্‌নির্ণয় ও বহতার ওপর আপনার কোনো হাত নেই। ওটুকু আমার দোষ।
২৫শে মার্চ ১৯৩৫

প্রণত
ধূর্জটি

কল্যাণীয়েষু

অর্জুন পিতামহ ভীষ্মের প্রতি মনের মধ্যে সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা রেখে দরদ রেখে শরসন্ধান করেছিলেন। তুমিও আমার মতের বিরুদ্ধে যুক্তি প্রয়োগ করেছ সৌজন্য রেখে। তাই হার মানতে মনে আপত্তি থাকে না। কিন্তু, আমাদের মধ্যে যে বাদ-প্রতিবাদ চলছে তৎপ্রসঙ্গে হার-জিত শব্দটা ব্যবহার অসংগত হবে। বলা যাক আলোচনা। উপসংহারে তোমার মত তোমারই থাকবে, আমারও থাকবে আমারই। তাতে কিছু আসে যায় না, কেননা সংগীতটা সৃষ্টির ক্ষেত্র। যারা সৃষ্টি করবে তারা নিজের পন্থা নিজেই বেছে নেবে–পুরানো নতুনের সমন্বয় তাদের কাজের দ্বারাই, বাঁধা মতের দ্বারা নয়।

তুমি বলছ ভারতের ধ্রুপদী সংগীত সম্বন্ধে তোমার প্রধান মন্তব্য আলাপ নিয়ে। ও সম্বন্ধে কিছু বলা কঠিন। আলাপের উপাদান-রূপে আছে বিশেষ রাগরাগিণী, সেগুলি গানের সীমার দ্বারা পূর্ব হতেই কোনো রচয়িতার হাতে নির্দিষ্ট রূপ পায় নি। আলাপে গায়ক আপন শক্তি ও রুচি অনুসারে তাদের রূপ দিতে দিতে চলেন। এ স্থলে অত্যন্ত সহজ কথাটা এই : যিনি পারলেন রূপ দিতে তাঁকে আর্টিস্ট হিসাবে বলব ধন্য; যিনি পারলেন না, কেবল উপাদানটাকে নিয়ে তুলো ধুনতে লাগলেন, তাঁকে গীতবিদ্যাবিশারদ বলতে পারি, কিন্তু আর্টিস্ট বলতে পারি নে–অর্থাৎ তাঁকে ওস্তাদ বলতে পারি, কিন্তু কালোয়াত বলতে পারব না। কালোয়াত, অর্থাৎ কলাবৎ। বলা শব্দের মধ্যেই আছে সীমাবদ্ধতার তত্ত্ব–সেই সীমা, যেটা রূপেরই সীমা। সেই সীমা রূপের আপন আন্তরিক তাগিদেই অপরিহার্য। প্রদর্শনীতে সীমা অপরিহার্য নয়, সেটা কেবলমাত্র বাহিরের স্থানাভাব বা সময়াভাব বশতই ঘটে। আলাপ যদি রাগিণীর প্রদর্শনীর দায়িত্ব নেয় তা হলে সেই দিক থেকে বিচার করে তাকে প্রশংসা করেও চলে। যে দুর্বলাত্মা পাণ্ডিত্যের ভারে অভিভূত হয় যে প্রশংসা করেও থাকে? সে লুব্ধ মুগ্ধভাবে মনে করে অনেক পাওয়া গেল। কিন্তু 'অনেক'-নামক ওজনওয়ালা পদার্থই কলাবিভাগের উপদ্রব, যথার্থ কলাবৎ তাকে তার মোটা অঙ্কের মূল্য সত্ত্বেও তুচ্ছ করেন। অতএব, আলাপের কথা যদি বলো তবে আমি বলব আলাপে পদ্ধতি নিয়ে কেউ-বা রূপ সৃষ্টি করতেও পারেন, কিন্তু রূপের পঞ্চত্বসাধন করাই অধিকাংশ বলবানের অভ্যাসগত। কারণ, জগতে কলাবৎ 'কোটিকে গুটিক মেলে', বলবতের প্রাদুর্ভাব অপরিমত। বহুসংখ্যক ফুল নিয়ে তোড়া বাঁধাও যায় আর তা নিয়ে দশ-পনেরোটা ঝুড়ি বোঝাই করাও চলে। তোড়া বাঁধতে গেলে তার সাজাই বাছাই আছে, বাদ দিতে হয় তার বিস্তর। তোড়ার খাতিরে ফুল বাদ দিতে গেলে যারা হাঁ-হাঁ করে ওঠে, ভগবানের কাছে তাদের পরিত্রাণ প্রার্থনা

করি। অতএব, আলাপের দরাজ পথ বেয়ে কোন, গায়ক সংগীতের প্রতি কী রকম ব্যবহার করলেন সেই ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত নিয়েই বিচার চলে। আলাপ সম্বন্ধে আর্টের আদর্শে বিচার করা কঠিন। তার কারণ, দৌড়তে দৌড়তে বিচার করতে হয়; ক্ষণে ক্ষণে তাতে যে রস পাওয়া যায় সেইটে নিয়ে তারিফ করা চলে, কিন্তু সমগ্রকে সুনির্দিষ্ট করে দেখব কী উপায়ে! তানসেনের গান হোক বা গোপাল নায়কেরই হোক, তারা তো নিরন্তর বিস্ফারিত মেঘের আড়ম্বর নয়; তারা রূপবান, তাদেরকে চার দিক থেকে দেখা যায়, বার বার বাজিয়ে নেওয়া যায়, নানা গায়কের কণ্ঠে তাদের অনিবার্য বৈচিত্র্য ঘটলেও তাদের যে মূল ঐক্য, যেটা কলার রূপ এবং কলার প্রাণ, মোটের উপরে সেটা থাকে মাথা তুলে। আলাপে সে সুবিধা পাই নে ব'লে তার সম্বন্ধে বিচার অত্যন্ত বেশি ব্যক্তিগত হতে বাধ্য। যদি কোনো নালিশ ওঠে তবে সাক্ষীকে পাবার জো নেই।

আয়তনের বৃহত্ব যে দোষের নয় এ সম্বন্ধে তুমি কিছু কিছু দৃষ্টান্ত দিয়েছ। না দিলেও চলত, কারণ আর্টে আয়তনটা গৌণ! রূপ বড়ো আয়তনেরও হতে পারে, ছোটো আয়তনেরও হতে পারে, এবং অরূপ বা বিরূপ ছোটোর মধ্যেও থাকে বড়োর মধ্যেও। বেটোফেনের 'সোনাটা' যথেষ্ট বহরওয়ালা জিনিস; কিন্তু বহরের কথাটাই যার সর্বোপরি মনে পড়ে, জীবে দয়ার খাতিরেই সভা থেকে তাকে যত্নসহকারে দূরে সরিয়ে রাখাই শ্রেয়। মহাভারতের উল্লেখ করতে পারতে–আমাদের দেশে ওকে ইতিহাস বলে, মহাকাব্য বলে না। ও একটি সাহিত্যিক galaxy। সাহিত্যবিশ্বে অতুলনীয়–ওর মধ্যে বিস্তর তারা আছে, তারা পরস্পর সুগ্রথিত নয়–অতি বৃহৎ নেব্যুলার জ্বালে জ্বালে তারা বাঁধা, আর্টের ঐক্যে নয়! এইজন্যেই রামায়ণ হল মহাকাব্য, মহাভারতকে কোনো আলংকারিক মহাকাব্য বলে না। আলাপ যদি স্বতই সংগীতের মহাকাব্য হয় তো হল নইলে হল না।

আমার সঙ্গে যাদের মতের বা ভাবের মিল নেই তারা সেই অনৈক্যকে আমার অপরাধ বলে গণ্য করে, তাদের দণ্ডবিধি আমার সম্বন্ধে নির্মম। তাদের নিজের বুদ্ধি ও রুচিকেই তারা বুদ্ধিমত্তার যদি একমাত্র আদর্শ মনে করে তাতে ক্ষতি হয় না, কিন্তু সেটাকেই তারা যদি ন্যায় অন্যায়ের শাশ্বত আদর্শ মনে করে দণ্ডবিধি বেঁধে দেয় তবে ভারতের ভাবী শাসনতন্ত্র তাদের আয়ত্তগত হলে এ দেশে আমার দানাপানি চলবে না। আমার বিচারকদের এই কঠোরতাই আমার চিরাভ্যস্ত, সেই কারণে তোমার ভাষাগত অনুকম্পায় আমি বিস্মিত। ভয় হয় পাছে এটা

টেঁকসই না হয়–অন্তত আমি যে ক'দিন টিঁকি ততদিনের জন্যও, আশা করি, মতের অনৈক্য সত্বেও আমার মান বাঁচিয়ে চলবে। ইতি ৯ই এপ্রেল ১৯৩৫

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পুঃ–তুমি যে চিঠিখানা লিখেছিলে তার মধ্যে অসংলগ্নতা কিছু দেখি নি। বস্তুত প্রথম পড়েই মনে করেছিলুম বলি 'মেনে নিলুম'। আমি অত্যন্ত কুঁড়ে, পরিশ্রম বাঁচাবার জন্যে প্রথমটা ইচ্ছে করে সম্মতি দিয়ে নীরবে আরাম-কেদারা আশ্রয় করি, পরক্ষণেই সাহিত্যিক শ্রেয়োবুদ্ধি ওঠে প্রবল হয়ে। হাঁ না করতে করতে অবশেষে হঠাৎ নিজেকে ঝাঁকানি দিয়ে বলি, 'উচিত কথা বলতে ছাড়ব না।'উচিত কথা বলবার দুষ্প্রপ্রবৃত্তি মানুষের মস্ত একটা ব্যসন, উনিই হচ্ছেন যত-সব অনুচিত কথার পিতামহী।

ওঁ

জোড়াসাঁকো

কল্যাণীয়েষু

কাল সন্ধ্যাবেলায় ঘুরে ফিরে আবার সেই কথাটাই উঠে পড়ল–'ভালো তো লাগে'। সংগীতের কোনো-একটা বিশেষ বিকাশ সংযত সংহত সুসংলগ্ন সুপরিমিত মূর্তি নাও যদি নেয়, তার মধ্যে বারে বারে পুনরাবৃত্তিও সুদীর্ঘকাল ধরে তানকর্তবের বাধাহীন আন্দোলন যদি দৈহিক ক্লান্তি ও অবকাশের সসীমতা ছাড়া থামবার অন্য কোনো হেতু নাও পায়, তবুও তো দেখছি ভালো লাগে। ভালো লাগবার কারণ হচ্ছে এই যে সংগীতের উপকরণের মধ্যে ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর গুণ আছে–তার ফলে, সুসম্পূর্ণ কলারূপ গ্রহণ না করলেও সে আদর পেতে পারে। মাটির পিণ্ড যতক্ষণ না ঘট আকারে সুপরিণত হয় ততক্ষণ সে মাটি। বিশেষভাবে কলাসাধনার গুণেই সে মহার্ঘ হয়। সোনার উজ্জ্বলতা প্রথম থেকেই চোখ জিতে নেয়। তার আপন বর্ণগুণেই সে পেয়েছে আভিজাত্য। অতএব তাল তাল সোনা যদি স্তূপাকার করা যায় তবে সে অভিভূত করবে মনকে। তখন লুব্ধ মন বলতে চায়, না আর বেশি কাজ নেই। অথচ 'আর বেশি কাজ নেই' কথাটাই আর্টের অন্তরের কথা। আর্টের খাতিরেই যথাস্থানে বলা চাই : ব্যস্, চুপ, আর এক বর্ণও না। সংস্কৃত সাহিত্যে সংস্কৃত ভাষার একটি প্রধান সম্পদ ধ্বনিগৌরব। সেই কারণে কোনো কৌশলী

লেখক যদি পাঠকের কান অভিভূত ক'রে ধ্বনিমন্দ্রিত শব্দ বিস্তার ক'রে চলে, তবে অনেক ক্ষেত্রে তার অপরিমিতি নিয়ে পাঠক নালিশ উপস্থিত করে না। তার একটি দৃষ্টান্ত কাদম্বরী। শূদ্রক রাজার অত্যুক্তিবহুল বর্ণনা চলল তিন-চার পাতা জুড়ে; লেখকের কলমটা হাঁপিয়ে উঠে থামল, বস্তুত থামবার কোনো কলাগত কারণ ছিল না। এ কথা ব'লে কোনো ফল হয় না যে এতে সমগ্র গল্পের পরিমাণ সামঞ্জস্য নষ্ট হচ্ছে। কেননা, পাঠক থেকে থেকে বলে উঠছে, 'বাহবা, বেশ লাগছে।' বেশ লাগছে ব'লেই বিপদ ঘটল, তাই বাণীর প্রগল্‌ভতায় বীণাপাণি হার মেনে চুপ করে গেলেন! তার পরে এল ব্যাধের মেয়ে, শুকপাখির খাঁচা হাতে নিয়ে। বন্যা বইল বর্ণনার, তটের রেখা লুপ্ত হলে গেল, পাঠক বললে 'বেশ লাগছে'। এই বেশ লাগা পরিমাণ মানে না। এমন স্থলে রচনার সমগ্রতাটা বাহন হয়ে দাসত্ব করে তার উপকরণের, সে আপন পূর্ণতার মাহাত্ম্যকে অকাতরে চাপা পড়তে দেয় আপন স্তূপাকার দ্রব্যসম্ভারের তলায়। সংস্কৃত সাহিত্যে কাদম্বরীর ছাঁদে গল্পরচনা আর দুটি-একটি মাত্র দৃষ্টান্ত লাভ করেছে; ও আর চলল না। যেমন একদা মেগাথেরিয়ম ডাইনসর প্রভৃতি অতিকায় জন্তু আপন অসংগত অতিকৃতির বোঝা অধিক দিন বইতে পারল না, গেল লুপ্ত হয়ে, এও তেমনি। সংস্কৃত সাহিত্য-অভিমানী কোনো দুঃসাহসিক আজ কাদম্বরীর অনুসরণে বাংলায় গল্প লেখবার চেষ্টা করবেই না-তার কারণ, ওর মধ্যে শিল্পের সদাচার নেই। কিন্তু, আমাদের সংগীতে আজও কাদম্বরীর পালা চলছে। আধুনিক বাংলা সাহিত্য বিশ্বসাহিত্যের সংস্রবে এসেছে; তাই আমাদের এমন একটা অভ্যাস দাঁড়িয়ে গেছে যে, এই সাহিত্যে কলাতত্ত্বের মূলগত ব্যতিক্রম ঘটা অসম্ভব। কিন্তু হিন্দুস্থানী গান ব্যবসায়ী গায়কদের গতানুগতিক রবার-নির্মিত ঝুলির মধ্যে রয়ে গেছে। বিশ্বজনীন আদর্শের সঙ্গে তার পার্থক্য ঘটলেও মন ও কানের অভ্যাসে বিরোধ ঘটবার সুযোগ হয় না। আজকালকার দিনে যাঁদের শিক্ষা ও রুচি বিশ্বচিত্তের মধ্যে প্রবেশাধিকার পেয়েছে তাঁরা যখন স্বাধীন মন নিয়ে বহুল সংখ্যায় গানের চর্চায় প্রবৃত্ত হবেন, তখন সংগীতে কলার সম্মান পাণ্ডিত্যের দম্ভ ছাড়িয়ে যাবে। তখন কোন্ ভালো লাগা যথার্থ আর্টের এলাকার, অন্তত সমজদারের কাছে তা স্পষ্ট হতে পারবে। ইতি ১৫ই মে ১৯৩৫

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পরমপূজনীয়েষু

আপনার শেষ পত্রের উত্তরে আমি বলতে চাই যে, কোনো গায়ক, কোনো আলাপিয়াও, রূপসৃষ্টির দায়িত্ব থেকে মুক্ত নয়। এ কথা আমি সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করি। কিন্তু দুটি সন্দেহ রয়ে গেল।

প্রথমত মানছি যে, ছোটোর মধ্যে রূপ ফুটতে পারে, বড়োর মধ্যেও। কিন্তু great music কিংবা great poetry কি ভিন্ন শ্রেণীর নয়? ঐশ্বর্য দেখানোটা বর্বরতা নিশ্চয়ই, কিন্তু চারপদী দরবারী কানাড়ার তানসেনী ধ্রুপদ ও খাম্বাজের ঠুংরির মধ্যে পার্থক্য আছেই। যদি কোনো উৎকৃষ্ট গায়ক, অর্থাৎ আর্টিস্ট, সেই দরবারী কানাড়ার ধ্রুপদকে বাহুল্যবর্জিত করে আপনাতে শোনান, তবে সেই গায়নের অপেক্ষাকৃত বৃহৎ আয়তনের জন্যই কি ঐ গানের ইঙ্গিত-আভাস স্থূল হয়ে উঠবে? আমার বক্তব্য- great হলেই তাকে ভোঁতা হতে হবে এমন কোনো কথা নেই, যেমন ছোটো হলেই ইঙ্গিতমুখর হতে হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। বৃহতের মধ্যেও সূক্ষ্ম আভাস রয়েছে দেখেছি, যেমন জৌনপুরের মসজিদে। greatness-এর সংজ্ঞা দিতে পারছি না। সেটা শুদ্ধ নয়, খাদ-যুক্ত, তার সঙ্গে সংখ্যার ও আখ্যানবস্তুর সম্বন্ধ আছেই আছে- অন্তত পটভূমিতে তো রয়েইছে। আমাদের অলংকারশাস্ত্রে প্রাচুর্যকে প্রতিভার একটি নিদর্শন বলা হয়েছে।

একটা নতুন কথা তুলছি। এই অর্থে নতুন যে, পূর্বে আমি সেটা নিয়ে আপনার সঙ্গে আলোচনা করি নি। ধরুন, আমি যদি বলি আমার দু ঘণ্টা ধরে ছায়ানটের কি পূরিয়ার আলাপ শুনতে ভালোই লাগে। নাহয় নাই হল কলা, হলই বা আমার ওস্তাদী বুদ্ধি? আমি জানি আমার কান অশিক্ষিত নয়, আমার কানে শ্রুতির তারতম্য পর্যন্ত সুস্পষ্ট। এই কানে যেটা ভালো লাগে সেইটাই হবে আর্ট। দাম্ভিকতা দেখাচ্ছি না-সকলেই এই ভাবে, আমি কেবল খোলাখুলি লিখলাম। আমি জানি আপনারও ভালো লাগে সুরের বিকাশ। মার্জিত শ্রবণেন্দ্রিয়ের ভালো লাগা না-লাগাই হবে বিচারের কষ্টিপাথর-নয় কি? এই ব্যক্তিগত রুচিকে বাদ দিলে সংগীতের ভবিষ্যৎ-নিরূপণের অন্য কী ব্যক্তিসম্পর্কহীন পথনির্দেশক চিহ্ন থাকতে পারে? এই রূপসৃষ্টিটাই আমাদের সংগীতের একমাত্র ভবিষ্যৎ-আপনি কী হিসেবে বলতে পারেন?

ভালো লাগা না-লাগাকে বাদ দিতে পারি না–তাকে আপনি লোভই বলুন আর আমি নিজে তাকে বর্বরতাই বলি-না কেন। সংগীতের ভবিষ্যৎ কি স্থাপত্যে? একটা কথা আছে : architecture is frozen music। সংগীতের প্রাণ হল গতি, বরফ নিতান্তই স্থাণু।

প্রণত
ধূর্জটি

কল্যাণীয়েষু

ভালো লাগা এবং না-লাগা নিয়ে বিরোধ অন্য সকল রকম বিরোধের চেয়ে দুঃসহ। অর্থনীতি বা সমাজনীতি সম্বন্ধে তুমি যে রকম করে যা বোঝো আমি যদি সে রকম করে তা না বুঝি তা হলে তোমার সঙ্গে আমার দ্বন্দ্ব নিশ্চয় বাধতে পারে, কিন্তু সেইটে বাইরের দরজায় দাঁড়িয়ে। তখন পরস্পর পরস্পরকে মূর্খ ব'লে নির্বোধ ব'লে গাল দিতে পারি। সেটা শ্রুতিমধুর নয় বটে, কিন্তু মূর্খতা নির্বুদ্ধিতার একটা বাহ্য পরিমাপক পাওয়া যায়, যুক্তিশাস্ত্রের বাটখারা-যোগে তার ওজনের প্রমাণ দেওয়া চলে। কিন্তু যখন পরস্পরকে বলা যায় অরসিক, তখন তর্কে কুলোয় না। পৌঁছয় লাঠালাঠিতে। যেহেতু রস জিনিসটা অপ্রমেয়। বুদ্ধিগত বোঝাবুঝির তফাত নিয়ে ঘর করা চলে সংসারে তার প্রমাণ আছে, কিন্তু আমার ভালো লাগে অথচ তোমার লাগে না এইটে নিয়েই ঘর ভাঙবার কথা। অতএব সংগীত সম্বন্ধে উক্ত সাংঘাতিক বিপদ্‌জনক কথাটার নিষ্পত্তি করে নেওয়া যাক। তোমাতে আমাতে ভেদ পার হবার একটা সেতু আছে–সে হচ্ছে তোমার সঙ্গে আমার ভালো লাগার অমিল নেই। কিন্তু তৎসত্ত্বেও নালিশ রয়ে গেছে। সংস্কৃত সাহিত্যে কাদম্বরী আমার অত্যন্ত প্রিয় জিনিস–ওর বহুল নৈহারিকতার মধ্যে মধ্যে রসের জ্যোতিষ্ক নিবিড় হয়ে ফুটে উঠেছে। মনে আছে বহুকাল পূর্বে একদা আমার শ্রোত্রী সখীদের পড়ে শুনিয়েছি এবং থেকে থেকে চমকে উঠেছি আনন্দে। সেইজন্যই আমার বড়ো দুঃখের নালিশ এই যে, এর মধ্যে আর্টের সংহতি রইল না কেন? মুক্তোগুলো মেজের উপর ছড়িয়ে যায়, গড়িয়ে যায়, ওদের মূল্য উপেক্ষা করতে পারি নে ব'লেই বলি–সাতনলী হারে গাঁথা হল না কেন! তা বুকে দুলিয়ে, মুকুটে জড়িয়ে, সম্পূর্ণ আনন্দ পাওয়া যেত। রাগিণীর আলাপে থেকে থেকে রূপের বিকাশ দেখা যায়; মন বলে একটি অখণ্ড সৃষ্টির জগতেই এদের চরম গতি; এদের সম্মান করি ব'লেই এদের রাস্তায় দাঁড় করাতে চাই নে,

উপযুক্ত সিংহাসনে বসালেই এদের মহিমা সম্পূর্ণ হত। সেই সিংহাসন চৌমাথাওয়ালা সদর রাস্তার চেয়ে সংহত, সংযত, পরিমিত, কিন্তু গৌরবে তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

বড়ো আয়তনের সংগীতকে আমি নিন্দা করি এমন ভুল কোরো না। আয়তন যতই আয়ত হোক, তবু আর্টের অন্তর্নিহিত মাত্রার শাসনে তাকে সংযত হতে হবে, তবেই সে সৃষ্টির কোঠায় উঠবে। আমরা বাল্যকালে ধ্রুপদ গান শুনতে অভ্যস্ত, তার আভিজাত্য বৃহৎ সীমার মধ্যে আপন মর্যাদা রক্ষা করে। এই ধ্রুপদ গানে আমরা দুটো জিনিস পেয়েছি–এক দিকে তার বিপুলতা গভীরতা, আর-এক দিকে তার আত্মদমন, সুসংগতির মধ্যে আপন ওজন রক্ষা করা। এই ধ্রুপদের সৃষ্টি আগেকার চেয়ে আরো বিস্তীর্ণ হোক, আরো বহুকক্ষবিশিষ্ট হোক, তার ভিত্তিসীমার মধ্যে বহু চিত্রবৈচিত্র্য ঘটুক, তা হলে সংগীতে আমাদের প্রতিভা বিশ্ববিজয়ী হবে। কীর্তনে গরান্‌হাটি অঙ্গের যে সংগীত আছে আমার বিশ্বাস তার মধ্যে গানের সেই আত্মসংযত ঔদার্য প্রকাশ পেয়েছে।

এইখানে একটা কথা বলা কর্তব্য–গান-রচনায় আমি নিজে কী করেছি, কোন্ পথে গেছি, গানের তত্ত্ববিচারে তার দৃষ্টান্ত ব্যবহার করা অনাবশ্যক। আমার চিত্তক্ষেত্রে বসন্তের হাওয়ায় শ্রাবণের জলধারায় মেঠো ফুল ফোটে, বড়ো-বড়ো-বাগান-ওয়ালাদের কীর্তির সঙ্গে তার তুলনা কোরো না। ইতি ১৬ই মে ১৯৩৫

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পরমপূজনীয়েষু

সেনেট হাউসের উৎসব-উপলক্ষে আপনি যে বক্তৃতা করেছিলেন তাতে বাংলার বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ ছিল। গায়কের কণ্ঠে সংযম এবং রচনাপদ্ধতিতে সুসংগতির একটা প্রয়োজন আছে বলতে গিয়ে আপনি ঐ বৈশিষ্ট্যের অবতারণা করেন। এতদিন ধরে আমাদের মধ্যে যে পত্রবিনিময় হল তাতে সংযমের প্রয়োজনটাই প্রমাণিত হচ্ছে। এই সংযমের সঙ্গে বাংলাদেশের সংস্কৃতির সম্পর্ক কী?

আপনার মুখেই অনেক কথা শুনেছি, তাই আপনার উত্তরের প্রতীক্ষায় বসে থাকব না। কোনো দেশ কিংবা জাতির বৈশিষ্ট্য প্রতিপন্ন করতে আমার সাহস হয় না। একদল ঐতিহাসিক (তাঁরা আবার জার্মান) বলছেন-সেজন্য চাই দিব্যানুভূতি। ও বালাই আমার নেই। অতি–আধুনিক

হয়ে হয়তো সমগ্রকে দেখবার ক্ষমতা আমার লোপ পেয়েছে। আপনার সে শক্তি আছে এবং আপনার অভিজ্ঞতা আরো গভীর ও ব্যাপক। আপনার শিক্ষাদীক্ষাও ভিন্ন, তাই আপনার মন্তব্য শুনতে ব্যগ্র।

আমার নিজের প্রথম প্রশ্ন হল এই: বৈশিষ্ট্য কিছু আছে কি না? বিশেষ বলতে আমি ব্যক্তির অতিরিক্তকে বিশ্বাস করতে চাই না। এমন কোন্ বস্তু আছে যার কৃপাতেই আমরা বাঙালি, যার প্রকাশ কি উন্মেষই হল বাংলা-পরিশীলনের ইতিহাস? আমার বিশ্বাস: ঐ প্রকার বস্তুর অস্তিত্ব নেই, যেটি আছে সেটি কেবল মনঃকল্পিত সুবিধাবাচক ধরতাই বুলি, মন্ত্র মাত্র। মন্ত্রোচ্চারণে সোয়াস্তি আছে, যাঁরা করেন তাঁদের –বাকি সকলের নির্যাতন। যে-কোনো ধর্মের ইতিহাসে তার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে।

অর্থাৎ, আমি গণমন মানছি না। তাই ব'লে মহাজনতন্ত্রেও বিশ্বাসী হতে পারি না। স্বীকার করতে পারি না যে, বাংলার বৈশিষ্ট্য যদি থাকে তবে সেটি এক কিংবা একাধিক অ-সাধারণ ব্যক্তির কর্মে ও ব্যবহারেই নিবদ্ধ। ' and above all, he was a Bengali' হাসি পায় শুনতে ও পড়তে। যিনি যত বড়ো লোকই হোন্-না কেন, তিনি একাই আমাদের সকল সংস্কার তৈরি করেছেন কিংবা তিনিই সর্ববিধ সংস্কারের প্রতীক, প্রতিভু, প্রতিনিধি-এ কথা বললে জাতিকে সমাজকে অপমান করা হয়। অপর পক্ষে, যে সাধারণ ব্যক্তি ভোট দিয়ে ও না দিয়েই নিজের অস্তিত্ব আবিষ্কার করে তার ব্যবহারই কি is equal to বাংলার বৈশিষ্ট্য? মহাজন ও লোকজন উভয়েরই দান আছে, কিন্তু জাতির সংস্কার উভয়ের সমষ্টি ভিন্ন আরো কিছু। এই অতিরিক্ত অশরীরী বস্তুর গুণাবলীকেই বৈশিষ্ট্য বলা হয়। তার আবার শক্তি আছে, সে শক্তি আবার মহাজন লোকজনের সব প্রয়াসকে এক ছাঁচে ঢালতে পারে-এবং ঢালাই উচিত। অথাতো ভূদেবচন্দ্রস্য সমাজতত্ত্বম্, চিত্তরঞ্জনদাশস্য সাহিত্যজিজ্ঞাসা, বিপিনচন্দ্রস্য ধর্মপরিচিতিঃ, লেনিন-হিট্লার-মুলোলিনীনাম্ শাসনতন্ত্রম্।

জাতিগত বৈশিষ্ট্য কিংবা মূলপ্রকৃতিকে কোনো বস্তুর, কোনো স্থাণুসত্তার, কোনো অচল সারপদার্থের প্রত্যয়ও যদি না ভাবি, তাকে যদি সামাজিক গতি ও বিবর্তনের বিবরণ হিসেবেই বুঝি, তাকে প'ড়ে পাওয়ার বদলে অর্জন করাই যদি মানুষের স্বভাবের দায়িত্ব হয়, তবে ব্যাপারটা অপেক্ষাকৃত সহজ হয় নিশ্চয়। কিন্তু অন্য দিক থেকে আবার ঘোরালো হয়ে ওঠে। ঐ ভাবে দেখলে কোনো পরিশীলনেরই নিজের রূপ থাকে না, থাকে নব্যসংস্কৃতিরচনার গুরুভার,

আবার সে গুরুভার পড়ে গিয়ে যে ব্যক্তিপুরুষ হতে চায় তারই স্কন্ধে। সংস্কৃতির স্বাধীন নিঃসম্পৃক্ত সত্তা রইল কোথায়? কেবল কি তাই? সংস্কৃতিকে কেবল গতি কিংবা বিবর্তন ভাবলে তার বিবৃতি কিংবা ইতিহাস লেখা ছাড়া আর-কিছুই লেখা চলে না। অর্থাৎ, সে সম্বন্ধে কোনো সুধীজনঅনুমোদিত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় না। আমারই ওপর যখন সংস্কৃতিকে গ্রহণ করবার ভার ও তাকে ভেঙে নতুন করে গড়বার দায়িত্ব পড়ল, তখন অন্যে সে ভার গ্রহণ করবে কেন? অন্যের ওপর চাপাতে আমি যাবই বা কেন? অতএব, তার সামাজিক শক্তি রইল না, এক কথায়, তার বৈশিষ্ট্য থাকল না, কেবল history of adaptation and adjustment, active or passive–নয় কি?

যদি কেউ ঐ বিবরণীতে কোনো রীতিনীতির আবিষ্কার করতে পারে তো বহুত আচ্ছা। সেটুকু তার কৃতিত্ব, সে তাই নিয়ে তার নিজের প্রভাব বিস্তার করুক। সে কাজে তার কেরামতি, তার বাহাদুরি। কিন্তু, আপনাকে নিশ্চয়ই মানতে হবে সে রীতি-নীতি কোনো সংস্কৃতিরই বৈশিষ্ট্য নয়; আপনি বলতে পারেন না যে, সে রীতিনীতি সংস্কৃতির অন্তরাল থেকে গোপনে নিজের উদ্দেশ্যসাধন করে যাচ্ছে। উদ্দেশ্যটি আবার যা হচ্ছে তাই। তার বেশি জানবার কোনো উপায় নেই। বলা বাহুল্য, সংস্কারকে অস্বীকার করবার স্পর্ধা আমার নেই। কিন্তু, সংস্কারও তো নির্বাতি হতে হতে বর্তমানের আকার ধারণ করেছে?

এই হল আমার মূলে আপত্তি। বাংলা সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যের অস্তিত্ব নিয়েই যদি কোনো ব্যক্তি সন্দিহান হয়, তবে সে ব্যক্তি তার দোহাই'এ মানবে না যে, ভবিষ্যতের বাংলা গান পুরাতন বাংলা গানের ধারাতেই চলবে। আপনি অবশ্য তা বলেন নি, বলেন না, বলতে পারেন না; কারণ এই–আপনার আপত্তি পুনরাবৃত্তিরই বিপক্ষে, হিন্দুস্থানী গানের পুনরাবৃত্তির বিপক্ষে নয়। কারণ, আপনার যুক্তি প্রাণধর্মের অনুযায়ী। কিন্তু লোকে ভুল বোঝবার ও করবার সম্ভাবনা রয়েছে। তাকে গোড়া থেকেই হত্যা করা ভালো। গ্রাম্য সংগীতের পুনরুদ্ধার চলছে, ঠুংরী গজলের বিপক্ষে প্রতিক্রিয়ায় দেশে যা ছিল তাই ভালো ভাবতে লোকে শুরু করেছে–তাই আজ আপনার মন্তব্য পরিষ্কার করে গুছিয়ে বলার বড়োই দরকার। প্রদেশাত্মবোধের যুগ এসে গিয়েছে।

জাতিগত বৈশিষ্ট্য ও সংস্কৃতি তর্কের খাতিরে নাহয় মানলুম। কিন্তু, নতুন culture trait কে নির্বাচন করে নিজের মতো রূপ দেবার জন্য তাকে অন্তত জীবন্ত হতে হবে। মারহাট্টা

অঞ্চলে ষাট বৎসর পূর্বে উত্তরভারতীয় গায়কিপদ্ধতির চলন ছিল না, অথচ এখন সেই পদ্ধতির শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিরা মারহাট্টারা উত্তরভারতের ঢঙ নিলে কেন–এবং মাদ্রাজিরা নিলে না কেন? কারণ এ নয়–রহমৎখাঁ বালাজীবোয়া বোম্বাই-পুনাতে থাকতেন। কারণ, মারহাট্টা-সংস্কৃতি হয় ছিল না, নাহয় গিয়েছিল শুকিয়ে, এবং মাদ্রাজের একটা-কিছু ছিল। মারহাট্টা গায়ক অবশ্য দক্ষিণী অলংকার হিন্দুস্থানী রাগিণীর গায়ে পরান, কিন্তু গায়কি উত্তরভারতীয়ই থাকে। মাদ্রাজি গায়ক অপেক্ষাকৃত বেশি রক্ষণশীল। বাঙালি গায়ককে কী বলবেন?

ধরাই যাক–বাংলাদেশে যাত্রাগানে, কবির গানে, তর্জায়, জারি ভাটিয়াল কীর্তন আগমনীতে, বিদ্যাসুন্দরযোত্রায় ও নিধুবাবুর টপ্পায় এবং রামপ্রসাদ প্রভৃতি ভক্তের গানের কথারই ছিল প্রাধান্য–সুরের সীমা ছিল সুনির্দিষ্ট, তানে ছিল সংযম। কিন্তু, সে ধারাও তো শুকিয়েছে? কেন তার বদলে সর্বত্র জগাখিচুড়ির পরিবেশন হচ্ছে? তাতে নেই কী? আপনার, অতুলপ্রসাদের, দ্বিজেন্দ্রলালের ভাত-ডাল-তরকারি সবই আছে–পেঁয়াজ রসুনও বাদ পড়ে নি। কেন ও কাণ্ড হল? অথচ আপনারাও যেমন বৈশিষ্ট্যের উত্তরাধিকারী, নব্যতন্ত্রের রচয়িতারাও তাই। তাঁদের নাহয় বাদ দিলাম–কিন্তু, পাঁচালির সঙ্গে যে শান্তিনিকেতনের গানের সম্বন্ধ নেই, যাত্রার জুড়ির গানের সঙ্গে যে দ্বিজেন্দ্রলালের কোরাসের কোনো আত্মীয়তা নেই, বিদ্যাসুন্দরী গানের সঙ্গে যে অতুলপ্রসাদের সংগীতের কোনো যোগসূত্র নেই–এটুকু আপনাকে মানতেই হবে। আজকাল ট্রেড-ইউনিয়ন মধ্যযুগের গণ শ্রেণী যুগের বংশধর নয়।

তা হলে বুঝতে হবে বাংলার সংগীত–পরিশীলন ও অনুশীলনের ধারা ছিল একাধিক। অতএব, প্রশ্ন হল-বোংলার বৈশিষ্ট্য অর্থে কত দিনের কয় পুরুষের ঐতিহাসিক পরিমাটি বুঝব? ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে কী ছিল সঠিক জানি না, কিন্তু গীতগোবিন্দে পদাবলীতে বাঘা-বাঘা রাগরাগিণীর নাম বসানো আছে। ডাঃ প্রবোধ বাগচী বলেন–আরো আগে ছিল। হয়তো নামকরণ পরে হয়েছে। গায়নও জানা নেই। কিন্তু, বিষ্ণুপুর বেথিয়া ঢাকা অঞ্চলে মুসলমান ওস্তাদ অনেক দিন থেকেই রয়েছেন। ইংরেজ-নবাব জমিদার এবং নতুন শ্রেণীর বিত্তশালী মহাজনরাও হুঁকোর নল মুখে দিয়ে বাইজির গান শুনতেন। শ্রাদ্ধবাসরে কীর্তনীয়ার সঙ্গে বাইজিরও ডাক পড়ত। তার পর ওয়াজিদ আলি শাহের দরবারে তো সকলেই যেতেন। গোবরডাঙার গঙ্গানারায়ণ ভট্ট, হালিসহরের জামাই নবীনবাবু, পেনেটির মহেশবাবু, শ্রীরামপুরের মধুবাবু, বিষ্ণুপরের যদুভট্ট, কোলকাতার নুলোগোপাল প্রভৃতি ওস্তাদরা তো সকলেই হিন্দুস্থানী চালে গাইতেন। বড়ো বড়ো গ্রামের জমিদার-বাড়িতে হিন্দু-মুসলমান ওস্তাদ বরাবরই থাকত। পশ্চিমাঞ্চলের সব

কালোয়াতই কোলকাতায় আসতেন। সেও আজ কত দিনের কথা। আপনিও সেই আবহাওয়ায় পুষ্ট। অতএব হিন্দুস্থানী গায়কি-পদ্ধতির সঙ্গে আমাদের পরিচয় এক দিনের নয়, পুরাতন ও ঘনিষ্ঠ। অথচ, এই ধারার সঙ্গে বাংলাদেশের সংস্কৃতির যোগ নেই, যোগ রইল যাত্রাকীর্তন-ভাটিয়ালের সঙ্গে–এ কেমন করে হয় আমাকে বুঝিয়ে দিন। আমার মতে এই ধারাও বাংলা গানের বৈশিষ্ট্যের অন্য-একটি দিক।

সামাজিক নির্বাচন-প্রক্রিয়ার তথ্য কী, না জানলে বাংলা গানে ও বাঙালি গায়কের মুখের সংগীতে সংগতির বিধি নিয়ম আবিষ্কৃত হবে না। বাংলার বৈশিষ্ট্য কী আপনার কাছে শুনেছি, কিন্তু আজ আমাকে তার প্রক্রিয়ার বিবরণ শোনান। এ কাজ বাঙালি পারবে না, ও কাজ বাঙালি পারবে, কারণ, বাঙালির স্বভাবই তাই–যুক্তিটি বুদ্ধিস্পর্শী নয়, যদিও প্রাণস্পর্শী। আফিমে ঘুম আসে কেন? কারণ, আফিমে ঘুম আনবার শক্তি আছে... বাঙালির বাঙালিত্ব অনেকটা এই ধরনের।

আমার মত হল এই–সুরে সংগতি- রক্ষা ভদ্রমনেরই কাজ, জাতিগত বৈশিষ্ট্যের নয়। যে-কোনো দেশের ভদ্রলোকের কাছে আমি সংগীতকলা প্রত্যাশা করতে পারি। অবশ্য, ভদ্র এবং গানের শিক্ষিত। সুগায়ক হবার জন্য general culture এরই নিতান্ত প্রয়োজন; বাঙালি হবার, কেবলমাত্র বাংলার ঐতিহ্য বহন করবার প্রয়োজন নেই। ৪ঠা জুলাই ১৯৩৫

প্রণত
ধূর্জটি

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

লাঠিয়াল যখন প্রতিপক্ষের আক্রমণ সামলানো কঠিন বলে বোঝে তখন সে মাটিতে বসে পড়ে দেহ সংকোচ করে, অর্থাৎ আঘাতের লক্ষ্যক্ষেত্রকে যথাসাধ্য সংকীর্ণ করতে চায়। তোমার এবারকার প্রশ্নবর্ষণ সম্বন্ধে আমার মনের ভাবটা সেই ধরনের। সংক্ষেপে উত্তর দিলে বিপদকেও সংক্ষিপ্ত করা যায়। দেখি কৃতকার্য হতে পারি কিনা। race অর্থাৎ গণজাতির অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য আছে কিনা এইটি তোমার প্রথম প্রশ্ন। এ সম্বন্ধে চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দিলে কথাটা পরিষ্কার হয়।

আকৃতির সহজাত বৈশিষ্ট্য অস্বীকার করবার জো নেই। চৈনিকের চেহারার সঙ্গে নিগ্রোর চেহারার সঙ্গে নিগ্রোর চেহারার তফাত নিয়ে তর্ক চলে না। আকৃতির ভেদ প্রকৃতির ভেদের কোনো সূচনা করে না এ কথা শ্রদ্ধের নয়। কাঁঠালের সঙ্গে তুলনায় সব আমেই মূল রসবস্তুর ঐক্য মানতে হয়, কিন্তু ন্যাংড়া আম ও ফজলি আমের মধ্যে রসবৈশিষ্ট্যের যে ভেদ আছে, আকৃতিতে তার ইশারা এবং প্রকৃতিতে তার প্রমাণ যথেষ্ট। আল্‌ফন্সোর কৌলীন্য বাইরের চেহারার থেকে শুরু করে ভিতরের আঁঠি পর্যন্ত গিয়ে ঠেকে। তার বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গে পরিচয়ের যোগ আছে।

যাকে সংস্কৃতি বলে থাকি, অর্থাৎ কাল্‌চার্‌ সমস্ত য়ুরোপীয় জাতির মধ্যে তা অনবচ্ছিন্ন। এই সংস্কৃতির বুদ্ধিক্ষেত্রে ওদের পরস্পরের সীমাচিহ্ন প্রায় মিলিয়ে গেছে। ওদের সায়ান্সের মধ্যে জাতিভেদ নেই, সমান হাটে ওদের বুদ্ধিবৃত্তির দেনাপাওনা অবারিত। কিন্তু ওদের হৃদয়বৃত্তির মধ্যে পঙ্‌ক্তিভেদ আছে। অনুভূতিতে ইটালীর এবং নর্‌বেজীয় এক নয়, ইংরেজ এবং ফরাসীর মধ্যেও প্রভেদ আছে। সে কেবলমাত্র ওদের রাষ্ট্রচালনায় নয়, ওদের শিল্পভাবনায় প্রকাশ পায়। বলা বাহুল্য জর্মান ও ফরাসীর চরিত্র ভিন্ন। জর্মানি ও ইটালির ভৌগোলিক দূরত্ব অল্পই। কিন্তু ইটালির সীমা পেরিয়ে জর্মানিতে প্রবেশ করবামাত্রই উভয় দেশের লোকের প্রকৃতিগত প্রভেদ সুস্পষ্ট অনুভব করা যায়।

এই প্রভেদটি কুলক্রমে রক্তমাংস অস্থিমজ্জায় সঞ্চারিত হয়ে চলেছে অথবা বাইরের নানা ঐতিহাসিক কারণে এটা সংঘটিত–সে তর্ক আমাদের বর্তমান আলোচনার পক্ষে অনাবশ্যক। ভিন্ন ভিন্ন গণজাতির মধ্যে চরিত্রগত হৃদয়গত প্রভেদ অন্তত দীর্ঘকাল থেকে চলে আসছে এ কথা মানতেই হবে, চিরকাল চলবে কিনা সে আলোচনা অবান্তর।

ভিন্ন ভিন্ন দেশের মানুষের বুদ্ধির ক্ষেত্র সমভূমি না হলেও, এক মাটির। সেখানে চাষ করতে করতে ক্রমে অনুরূপ ফসল ফলানো যেতে পারে। তার প্রমাণ জাপান। সেখানকার মাটিতে পারমার্থিক ও ব্যাবহারিক সায়ান্স শিকড় চালিয়ে দিয়ে পাশ্চাত্য শস্যের ফলনে ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। য়ুরোপের বৌদ্ধিক প্রকৃতিকে সাধনাদ্বারা আমরা অঙ্গীকৃত করতে পারি তার কিছু-কিছু প্রমাণ দেওয়া গেছে। কিন্তু, তার চরিত্রকে পাচ্ছি নে, নানা শোচনীয় ব্যর্থতায় সেটা প্রত্যহ সুস্পষ্ট হল।

চরিত্র কর্মসৃষ্টিতে এবং হৃদয়বৃত্তি ও কল্পনাশক্তি রসসৃষ্টিতে আপন পরিচয় দিয়ে থাকে। তাই য়ুরোপীয় সংগীতের কাঠামো এক হলেও ইটালীর ও জর্মান সংগীতের রূপের ভেদ আপনিই ঘটেছে। ও দিকে রুশীয় সংগীতেরও বৈশিষ্ট্য রসজ্ঞেরা স্বীকার করেন।

হিন্দুস্থানীর সঙ্গে বাঙালির প্রভেদ আছে, দেহে, মনে, হৃদয়ে, কল্পনায়। বুদ্ধির পার্থক্য হয়তো দূর করা যায় একজাতীয় শিক্ষার দ্বারা; কিন্তু স্বভাবের যে দিকটা অন্তগূঢ় তার উপরে হাত চালানো সহজ নয়। আমাদের ধীশক্তিটা দারোয়ান; কোন্ তথ্যটাকে রাখবে, কাকে খেদিয়ে দেবে, গোঁফে চাড়া দিয়ে সেটা ঠিক করতে থাকে–আক্রমণ ও আত্মরক্ষার কাজেও তার বাহাদুরি আছে–সে থাকে মনের দেউড়ি জুড়ে। কিন্তু অন্তঃপুরের কাজ আলাদা–সেইখানেই সাজসজ্জা, নাচগান, পূজা অর্চনা, সেবার নৈবেদ্য, মনোরঞ্জনের আয়োজন। কুচকাওয়াজ প্রভৃতি নানা উপায়ে দারোয়ানটার পালোয়ানির উৎকর্ষসাধনের একটা সাধারণ আদর্শ আমরা বৈজ্ঞানিক পাড়া থেকে আহরণ করতে পারি, কিন্তু অন্তঃপুরিকাদের এক ছাঁদে গড়তে গেলে হাইহেীল্ড্ জুতোর উপর দাঁড়িয়েও ভিতর থেকে তাদের ছাঁদ আলাদা হয়ে বেরিয়ে পড়ে, কেবল সেই অংশে মেলে যেটা তাদের স্বভাবের সঙ্গে স্বতই সংগত।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এই যে, বাংলা সংস্কৃতির যদি অবশ্যম্ভাবী বৈশিষ্ট্য থাকেই তবে সেটা কি পুরাতনের পুনরাবৃত্তিরূপেই প্রকাশিত হতে থাকবে? কখনোই না। কারণ, অপরিবর্তনীয় পুনরাবৃত্তি তো প্রাণধর্মের বিরুদ্ধ। সেকেলে কবির গানে, পাঁচালি প্রভৃতিতে বাঙালি রুচির একটা আদর্শ নিশ্চয়ই পাওয়া যায়; কিন্তু কালক্রমে তার কোনো পরিণতি যদি না ঘটে তবে বলতে হবে সে আদর্শ মরেছে। শিশুকে বড়ো হতে হবে–সেই পরিবৃদ্ধির মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন ঐক্যসূত্র বরাবর থাকে, কিন্তু অন্তরে বাইরে বদল হয় বিস্তর। তার সজীব কলেবরটা বাহিরের নানা উপাদান সংগ্রহ করতে থাকে, নতুন নতুন অবস্থার সঙ্গে মিল ঘটিয়ে চলে, নতুন পাঠাশালায় নতুন নতুন শিক্ষালাভ করে। তার প্রভৃত পরিণতি ও পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু, মূল প্রাণের সূত্র যার দুর্বল, পুনরাবৃত্তি বই তার আর-কোনো গতি নেই। সেই পুনরাবৃত্তির অভাব দেখলেই প্রথার দোহাই পাড়তে থাকে যে বুদ্ধি, সে শবাসনা।

আমরা যাকে হিন্দুস্থানী সংগীত বলি তার মধ্যে দুটো জিনিস আছে। একটা হচ্ছে গানের তত্ত্ব, আর-একটা গানের সৃষ্টি। গানের তত্ত্বটি অবলম্বন করে বড়ো বড়ো হিন্দুস্থানী গুণী গান সৃষ্টি করেছেন। যে যুগে তাঁরা সৃষ্টি করেছেন সেই বাদশাহী যুগের প্রভাব আছে তার মধ্যে।

দেশকালপাত্রের সঙ্গে সংগতিক্রমে তাঁদের সেই সৃষ্টি সত্য, যেমন সত্য সেকেন্দ্রাবাদ প্রাসাদের স্থাপত্য। তাকে প্রশংসা করব, কিন্তু অনুকরণ করতে গেলে নূতন দেশকালপাত্রে হুঁচট খেয়ে সেটা সত্য হারাবে।

বাঙালির মধ্যে 'বিদগ্ধমুখমণ্ডন'-রূপে যে হিন্দুস্থানী গানের অনুশীলন দেখা যায়, সেটা নিতান্তই ধনীরআঁচল-ধরা পূর্বানুবৃত্তি। পূর্বকালীন সৃষ্টিকে ভোগ করবার উদ্দেশে এই অনুবৃত্তির প্রয়োজন থাকতে পারে; কিন্তু সেইখানেই আরম্ভ আর সেইখানেই যদি শেষ হয়, দূরশতাব্দীর বাদশাহী আমলের বাইরে আমরা যে আজও বেঁচে আছি সংগীতে তার যদি কোনো প্রমাণ না পাওয়া যায়, তা হলে এ নিয়ে গৌরব করতে পারব না। কেননা, গান সম্বন্ধে যে দরিদ্র এই অবস্থাতেই চিরবর্তমান তাকেই বলব–'পরান্নভোজী পরাবসবশায়ী'। তার চেয়ে নিজের শাকভাত এবং কুঁড়েঘরও শ্রেয়।

বাংলাদেশে কীর্তন গানের উৎপত্তির আদিতে আছে একটি অত্যন্ত সত্যমূলক গভীর এবং দূরব্যাপী হৃদয়াবেগ। এই সত্যকার উদ্দাম বেদনা হিন্দুস্থানী গানের পিঞ্জরের মধ্যে বন্ধন স্বীকার করতে পারলে না–সে বন্ধন হোক-না সোনার, বাদশাহী হাটে তার দাম যত উঁচুই হোক। অথচ হিন্দুস্থানী সংগীতের রাগরাগিণীর উপাদান যে বর্জন করে নি। সে-সমস্ত নিয়েই সে আপন নূতন সংগীতলোক সৃষ্টি করেছে। সৃষ্টি করতে হলে চিত্তের বেগ এমনিই প্রবলরূপে সত্য হওয়া চাই।

প্রত্যেক যুগের মধ্যেই এই কান্নাটা আছে–'সৃষ্টি চাই'। অন্য যুগের সৃষ্টিহীন প্রসাদভোগী হয়ে থাকার লজ্জা থেকে যে তাকে রক্ষা করবে, তাকে যে আহ্বনা করছে।

আধুনিক বাংলাদেশে গান-সৃষ্টির উদ্যম সংগীতকে কোনো অসামান্য উৎকর্ষের দিকে নিয়ে গেছে কিনা এবং সে উৎকর্ষ ধ্রুবপদ্ধতির হিন্দুস্থানী সংগীতের উৎকৃষ্ট আদর্শ পর্যন্ত পৌঁছতে পেরেছে কিনা সে কথাটা তত গুরুতর নয়, কিন্তু প্রকাশের চাঞ্চল্য মাত্রেই তার যে সজীবতার প্রমাণ পাই সেইটেই সব চেয়ে আশাজনক। নব্যবঙ্গের গানের কণ্ঠ গ্র্যামোফোনের চেয়ে অনেক কাঁচা হতে পারে, কিন্তু স্বরটি যদি তার 'মাস্টরস্ ভইস্', না হয়, তাতে যদি তার নিজের সুর খেলে, তা হলে সে বেঁচে আছে এই কথাটা সপ্রমাণ হবে। তবে তার বর্তমান যেমনি কচি হোক তার জোয়ান বয়সের ভবিষ্যৎ খুলবে আপন সিংহদ্বার। সে ভবিষ্যৎ নিরবধি।

বাঙালির চিত্তবৃত্তি প্রধানত সাহিত্যিক এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ইংরেজের প্রতিভাও সাহিত্যপ্রবণ। তার মন আপন বড়ো বড়ো বাতি জ্বালিয়েছে সাহিত্যের মন্দিরে। প্রকৃতির গৃহিণীপনায় মিতব্যয়িতা দেখা যায়, শক্তির পরিবেশনে খুব হিসেব ক'রে ভাগ-বাটোয়ারা হয়ে থাকে। মাছকে প্রকৃতি শিখিয়েছেন খুব গভীর জলে ডুবসাঁতার কাটতে, আর উচ্চ আকাশে উধাও হতে শিখিয়েছেন পাখিকে। কখনো কখনো সামান্য পরিমাণে কিছু মিশোল করেও থাকেন। পানকৌড়ি কিছুক্ষণের মতো জলে দেয় ডুব, উড়ুক্ষু মাছ আকাশে ওড়ার শখ মেটায়। ইংলণ্ডে সাহিত্যে জন্মেছেন শেক্‌স্‌পীয়র, জর্মানিতে সংগীতে জন্মেছেন বেটোফেন।

সত্যের খাতিরে এ কথা মানতেই হবে যে, বিশুদ্ধ সংগীতে হিন্দুস্থান বাংলাকে এগিয়ে গেছে। যন্ত্রসংগীতে তার প্রধান প্রমাণ পাওয়া যায়। যন্ত্রসংগীত সম্পূর্ণই সাহিত্য-নিরপেক্ষ। তা ছাড়া ঐ অঞ্চলে অর্থহীন তোম্‌-তানো-না শব্দে তেলেনার বুলি ভাষাকে ব্যঙ্গ করতে দ্বিধা বোধ করে না। বাংলাদেশে যন্ত্রসংগীত নিজের কোনো বিশেষত্ব উদ্ভাবন করে নি। সেতার এসরাজ সরদ রবাব প্রভৃতি যন্ত্র হিন্দুস্থানের বানানো, তার চর্চাও হিন্দুস্থানেই প্রসিদ্ধ। 'ওরে রে লক্ষ্মণ, একি কুলক্ষণ, বিপদ ঘটেছে বিলক্ষণ' প্রভৃতি পাঁচালি-প্রচলিত গানে অর্থ স্বল্পই, অনুপ্রাসের ফেনিলতাই বেশি, অতএব প্রায় সে তেলেনার কাছে ঘেঁষে গেছে, কিন্তু তবু তোমতোনানানা'র মতো অমন নিঃসংকোচে নিরর্থক নয়। পরজ রাগিণীতে একটা হিন্দি গান জানতুম, তার বাংলা তর্জমা এই–কালো কালো কম্বল, গুরুজি, আমাকে কিনে দে, রাম-জপনের মালা এনে দে আর জল পান করবার তুম্বী। ঐ ফর্দে উদ্‌ধৃত ফর্‌মাশী জিনিসগুলিতে যে সুগভীর বৈরাগ্যের ব্যঞ্জনা আছে পরজ রাগিণীই তা ব্যক্ত করবার ভার নিয়েছে। ভাষাকে দিয়েছে সম্পূর্ণ ছুটি। আমি বাঙালি, আমার স্কন্ধে নিতান্তই যদি বৈরাগ্য ভর করত, তবে লিখতুম–

গুরু, আমায় মুক্তিধনের দেখাও দিশা।
কম্বল মোর সম্বল হোক দিবানিশা।
সম্পদ হোক্ জপের মালা
নামমণির-দীপ্তি-জ্বালা,
তুম্বীতে পান করব যে জল
মিটবে তাহে বিষয়তৃষা।

কিন্তু এ গানে পরজ তার ডানা মেলতে বাধা পেত। পরজ হত সাহিত্যের খাঁচার পাখি। হিন্দুস্থানী গাইতে তানপুরা নিয়ে বসলেন, বললেন–আমার এই চুনরিয়া লাল রঙ করে দে,

যেমন তোর ঐ পাগড়ি তেমনি আমার এই চুনরিয়া লাল রঙ করে দে! বাস্, আর কিছু নয়, এই ক'টি কথার উপর কানাড়া অপ্রতিহত প্রভাবে রাজত্ব বিস্তার করলে। বাঙালি গাইলে-

ভালোবাসিবে ব'লে ভালোবাসি নে।
আমার যে ভালোবাসা তোমা বই আর জানি নে।
হেরিলে ও মুখশশী আনন্দসাগরে ভাসি,
তাই তোমারে দেখতে আসি–দেখা দিতে আসি নে।

যা-কিছু বলবার, আগেভাগে তা ভাষা দিয়েই বলে দিলে, ভৈরবী রাগিণীর হাতে খুব বেশি কাজ রইল না।

বাঙালির এই স্বভাব নিয়েই তাকে গান গাইতে হবে। বললে চলবে না রাতের বেলাকার চক্রবাকদম্পতির মতো ভাষা পড়ে থাকবে নদীর পূর্ব পারে আর গান থাকবে পশ্চিম পারে, and never the twin shall meet' | বাঙালির কীর্তনগানে সাহিত্যে সংগীতে মিলে এক অপূর্ব সৃষ্টি হয়েছিল–তাকে প্রিমিটিভ এবং ফোক্ ম্যুজিক বলে উড়িয়ে দিলে চলবে না। উচ্চ অঙ্গের কীর্তন গানের আঙ্গিক খুব জটিল ও বিচিত্র, তার তাল ব্যাপক ও দুরূহ, তার পরিসর হিন্দুস্থানী গানের চেয়ে বড়ো। তার মধ্যে যে বহুশাখায়িত নাট্যরস আছে তা হিন্দুস্থানী গানে নেই।

বাংলায় নূতন যুগের গানের সৃষ্টি হতে থাকবে ভাষায় সুরে মিলিয়ে। এই সুরকে খর্ব করলে চলবে না। তার গৌরব কথার গৌরবের চেয়ে হীন হবে না। সংসারে স্ত্রী-পুরুষের সমান অধিকারে দাম্পত্যের যে পরিপূর্ণ উৎকর্ষ ঘটে, বাংলা সংগীতে তাই হওয়া চাই। এই মিলনসাধনে ধ্রুবপদ্ধতির হিন্দুস্থানী সংগীতের সহায়তা আমাদের নিতে হবে, আর অনিন্দনীয় কাব্যমহিমা তাকে দীপ্তিশালী করবে। একদিন বাংলার সংগীতে যখন বড়ো প্রতিভার আবির্ভাব হবে তখন সে বসে বসে পঞ্চদশ শতাব্দীর তানসেনী সংগীতকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে প্রতিধ্বনিত করবে না, আর আমাদের এখনকার কালের গ্র্যামোফোন- সঞ্চারী গীতপতঙ্গের দুর্বল গুঞ্জনকেও প্রশ্রয় দেবে না। তার সৃষ্টি অপূর্ব হবে, গম্ভীর হবে, বর্তমান কালের চিত্তশঙ্খকে সে বাজিয়ে তুলবে নিত্যকালের মহাপ্রাঙ্গণে। কিন্তু, গানসৃষ্টিতে আজ যেগুলিকে ছোটো দেখাচ্ছে, অসম্পূর্ণ দেখাচ্ছে, তারা পূর্ব দিগন্তে খণ্ড ছিন্ন মেঘের দল, আষাঢ়ের আসন্ন রাজ্যাভিষেকে তারা নিমন্ত্রণপত্র বিতরণ করতে এসেছে–দিগন্তের পরপারে রথচক্রনির্ঘোষ শোনা যায়। ইতি ৬ই জুলাই ১৯৩৫

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পুঃ–বাংলা যন্ত্রসংগীতসৃষ্টি কোন্ লক্ষ্যে পৌঁছবে তা বলা কঠিন, প্রতিভার লীলা অভাবনীয়। এক কালে থিয়েটারে কন্সাট্র্ নামে যে কদর্য অত্যাচারের সৃষ্টি হয়েছিল সেটা মরেছে এইটেই আশাজনক।

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

...এই সূত্রে সংগীত সম্বন্ধে একটা কথা বলে রাখি। সংগীতের প্রসঙ্গে বাঙালির প্রকৃত বৈশিষ্ট্য নিয়ে কথা উঠেছিল। সেইটেকে আরো একটু ব্যাখ্যা করা দরকার।

বাঙালিস্বভাবের ভাবালুতা সকলেই স্বীকার করে। হৃদয়োচ্ছ্বাসকে ছাড়া দিতে গিয়ে কাজের ক্ষতি করতেও বাঙালি প্রস্তুত। আমি জাপানে থাকতে একজন জাপানী আমাকে বলেছিল, ‘রাষ্ট্রবিপ্লবের আর্ট’ তোমাদের নয়। ওটাকে তোমরা হৃদয়ের উপভোগ্য করে তুলেছ; সিদ্ধিলাভের জন্য যে তেজকে, সংকল্পকে গোপনে আত্মসাৎ করে রাখতে হয়, গোড়া থেকেই তাকে ভাবাবেগের তাড়নায় বাইরের দিকে উৎক্ষিপ্ত বিক্ষিপ্ত করে দাও।’এই জাপানীর কথা ভাববার যোগ্য। সৃষ্টির কার্য যে-কোনো শ্রেণীর হোক, তার শক্তির উৎস নিভৃতে গভীরে; তাকে পরিপূর্ণতা দিতে গেলে ভাবসংযমের দরকার। যে উপাদানে উচ্চ অঙ্গের মূর্তি গড়ে তোলে তার মধ্যে প্রতিরোধের কঠোরতা থাকা চাই; ভেঙে ভেঙে, কেটে কেটে তার সাধনা। জল দিয়ে গলিয়ে যে মৃৎপিণ্ডকে শিল্পরূপ দেওয়া যায় তার আয়ু কম, তার কণ্ঠ ক্ষীণ। তাতে যে পুতুল গড়া যায়, সে নিধুবাবুর টপ্পার মতোই ভঙ্গুর।

উচ্চ অঙ্গের আর্টের উদ্দেশ্য নয় দুই চক্ষু জলে ভাসিয়ে দেওয়া, ভাবাবাতিশয্যে বিহ্বল করা। তার কাজ হচ্ছে মনকে সেই কল্পলোকে উত্তীর্ণ করে দেওয়া যেখানে রূপের পূর্ণতা। সেখানকার সৃষ্টি প্রকৃতির সৃষ্টির মতোই; অর্থাৎ সেখানে রূপ করুপ হতেও সংকোচ করে না; কেননা তার মধ্যেও সত্যের শক্তি আছে–যেমন মরুভূমির উট, যেমন বর্ষার জঙ্গলে ব্যাঙ, যেমন রাত্রির আকাশে বাদুড়, যেমন রামায়ণের মন্থরা, মহাভারতের শকুনি, শেক্স্পীয়ারে ইয়াগো

আমাদের দেশের সাহিত্যবিচারকের হাতে সর্বদাই দেখতে পাই আদর্শবাদের নিক্তি; সেই নিক্তিতে তারা এতটুকু কুঁচ চড়িয়ে দিয়ে দেখে তারা যাকে আদর্শ বলে তাতে কোথাও কিছুমাত্র কম পড়েছে কিনা। বঙ্কিমের যুগে প্রায় দেখতে পেতুম অত্যন্ত সূক্ষ্মবোধবান সমালোচকেরা নানা উদাহরণ দিয়ে তর্ক করতেন-ভ্রমরের চরিত্রে পতিপ্রেমের সম্পূর্ণ আদর্শ কোথায় একটুখানি ক্ষুন্ন হয়েছে আর সূর্যমুখীর ব্যবহারে সতীর কর্তব্যে কতটুকু খুঁত দেখা দিল। ভ্রমর সূর্যমুখী সকল অপরাধ সত্ত্বেও কতখানি সত্য আর্টে সেটাই মুখ্য, তারা কতখানি সতী সেটা গৌণ, এ কথার মূল্য তাদের কাছে নেই; তারা আদর্শের অতিনিখুঁতত্বে ভাবে বিগলিত হয়ে অশ্রুপাত করতে চায়। উপনিষৎ বলেছেন আত্মার মধ্যে পরম সত্যকে দেখবার উপায় 'শান্তোদান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূত্বা'। আর্টের সত্যকেও সমাহিত হয়ে দেখতে হয়, সেই দেখবার সাধনার কঠিন শিক্ষার প্রয়োজন আছে।

বাংলাদেশে সম্প্রতি সংগীতচর্চার একটা হাওয়া উঠেছে, সংগীতরচনাতেও আমার মতো অনেকেই প্রবৃত্ত। এই সময়ে প্রাচীন ক্লাসিকাল অর্থাৎ ধ্রবপদ্ধতির হিন্দুস্থানী সংগীতের ঘনিষ্ঠ পরিচয় নিতান্তই আবশ্যক। তাতে দুর্বল রসমুগ্ধতা থেকে আমাদের পরিত্রাণ করবে। এ কিন্তু অনুশীলনের জন্যে, অনুকরণের জন্যে নয়। আর্টে যা শ্রেষ্ঠ তা অনুকরণজাত নয়। সেই সৃষ্টি আর্টিস্টের সংস্কৃতিরবান মনের স্বকীয় প্রেরণা হতে উদ্ভূত। যে মনোভাব থেকে তানসেন প্রভৃতি বড়ো বড়ো সৃষ্টিকর্তা দরবারীতোড়ি দরবারী কানাড়াকে তাঁদের গানে রূপ দিয়েছেন সেই মনোভাবটিই সাধনার সামগ্রী, গানগুলির আবৃত্তিমাত্র নয়। নতুন যুগে এই মনোভাব যা সৃষ্টি করবে সেই সৃষ্টি তাঁদের রচনার অনুরূপ হবে না, অনুরূপ না হতে দেওয়াই তাঁদের যথার্থ শিক্ষা-কেননা, তাঁরা ছিলেন নিজের উপমা নিজেই। বহু যুগ থেকে তাঁদের সৃষ্টির 'পরে আমরা দাগা বুলিয়ে এসেছি, সেটাই যথার্থত তাঁদের কাছ থেকে দূরে চলে যাওয়া। এখনকার রচয়িতার গীতশিল্প তাঁদের চেয়ে নিকৃষ্ট হতে পারে, কিন্তু সেটা যদি এখনকার স্বকীয় আত্মপ্রকাশ হয় তা হলে তাতে করেই সেই-সকল গুণীর প্রতি সম্মান প্রকাশ করা হবে।

সব শেষে নিজের সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই। মাঝে মাঝে গান রচনার নেশায় যখন আমাকে পেয়েছে তখন আমি সকল কর্তব্য ভুলে তাতে তলিয়ে গেছি। আমি যদি ওস্তাদের কাছে গান শিক্ষা করে দক্ষতার সঙ্গে সেইসেকল দুরূহ গানের আলাপ করতে পারতুম তাতে নিশ্চয়ই সুখ পেতুম; কিন্তু আপন অন্তর থেকে প্রকাশের বেদনাকে গানে মূর্তি দেবার যে আনন্দ, সে তার চেয়ে গভীর। সে গান শ্রেষ্ঠতায় পুরাযুগের গানের সঙ্গে তুলনীয় নয়, কিন্তু আপন সত্যতায় সে

সমাদরের যোগ্য। নব নব যুগের মধ্যে দিয়ে এই আত্মসত্যপ্রকাশের আনন্দধারা যেন প্রবাহিত হতে থাকে এইটেই বাঞ্ছনীয়।

প্রথম বয়সে আমি হৃদয়ভাব প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছি গানে, আশা করি সেটা কাটিয়ে উঠেছি পরে। পরিণত বয়সের গান ভাব-বাৎলাবার জন্যে নয়, রূপ দেবার জন্য। তৎসংশ্লিষ্ট কাব্যগুলিও অধিকাংশই রূপের বাহন। ‘কেন বাজাও কাঁকন কনকন কত ছলভরে’-এতে যা প্রকাশ পাচ্ছে তা কল্পনার রূপলীলা। ভাবপ্রকাশে ব্যথিত হৃদয়ের প্রয়োজন আছে, রূপপ্রকাশ অহৈতুক। মালকোষের চৌতাল যখন শুনি তাতে কান্না-হাসির সম্পর্ক দেখি নে, তাতে দেখি গীতরূপের গম্ভীরতা। যে বিলাসীরা টপ্পা ঠুংরি বা মনোহরসাঞী কীর্তনের অশ্রু-আর্দ্র অতিমিষ্টতায় চিত্ত বিগলিত করতে চায়, এ গান তাদের জন্য নয়। আর্টের প্রধান আনন্দ বৈরাগ্যের আনন্দ, তা ব্যক্তিগত রাগদ্বেষ হর্ষশোক থেকে মুক্তি দেবার জন্যে। সংগীতে সেই মুক্তির রূপ দেখা গেছে ভৈরোঁতে, কল্যাণে, কানাড়ায়। আমাদের গান মুক্তির সেই উচ্চশিখরে উঠতে পারুক বা না পারুক, সেই দিকে ওঠবার চেষ্টা করে যেন। ইতি ১৩ই জুলাই ১৯৩৫

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সংগীত ও ভাব

আমাদের সংস্কৃত ভাষা যেরূপ মৃত ভাষা, আমাদের সংগীতশাস্ত্র সেইরূপ মৃত শাস্ত্র। ইহাদের প্রাণ বিয়োগ হইয়াছে, কেবল দেহমাত্র অবশিষ্ট আছে। আমরা কেবল ইহাদের স্থির অচঞ্চল জীবনহীন মুখ মাত্র দেখিতে পাই, বিবিধ বিচিত্র ভাবের লীলাময়, ছায়ালোকময় পরিবর্তনশীল মুখশ্রী দেখিতে পাই না। আমরা কতকগুলি কথা শুনিতে পাই; অথচ তাহার স্বরের উচ্চ-নীচতা শুনিতে পাই না, কেবল সমস্বরে একটি কথার পর আর-একটি কথা কানে আসে মাত্র। হয়তো ক্রমে ক্রমে তাহার অর্থবোধ মাত্র হয়, কিন্তু তাহার অর্থগুলিকে সম্যকরূপে হজম করিয়া ফেলিয়া আমাদের হৃদয়ের রক্তের সহিত মিশাইয়া লইতে পারি না। আজ সংস্কৃত ভাষায় কেহ যদি কবিতা লেখেন, তবে নস্য-সেবক চালকলা-জীবী আলংকারিক সমালোচকেরা তাহাকে কী চক্ষে দেখেন? তৎক্ষণাৎ তাঁহারা ব্যাকরণ বাহির করেন, অলংকারের পুঁথিখানা খুলিয়া বলেন, ষত্ব ণত্ব, তদ্ধিত প্রত্যয়, সমাস সন্ধি, মিলাইয়া যদি নিখুঁত বিবেচনা করেন, যদি দেখেন যশকে শুভ্র বলা হইয়াছে, নলিনীর সহিত সূর্যের ও কুমুদের সহিত চন্দ্রের মৈত্র সম্পাদন করা হইয়াছে তবেই তাঁহারা পরমানন্দ উপভোগ করেন। আর, কেহ যদি আজ গান করেন, তবে তানপুরার কর্ণপীড়ক খরজ সুরের জন্মদাতাগণ তাহাকে কী চক্ষে সমালোচন করেন? তাঁহারা দেখেন একটা রাগ বা রাগিণী গাওয়া হইতেছে কি না; সে রাগ বা রাগিণীর বাদী সুরগুলিকে যথারীতি সমাদর ও বিসম্বাদী সুরগুলিকে যথারীতি অপমান করা হইয়াছে কি না; এ পরীক্ষাতে যদি গানটি উত্তীর্ণ হয় তবেই তাঁহাদের বাহবাসূচক ঘাড় নড়ে। অবিকল নকল দেখিলেই বুঝা যায় যে, অনুকরণকারী অনুকৃত পদার্থের ভাব আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। মনে করুন, আমি সাহেব হইতে চাই; অথচ আমি সাহেবদিগের ভাব কিছুমাত্র জানি না, তখন আমি কী করি? না, অ্যাণ্ড্রু নামক একটি বিশেষ সাহেবকে লক্ষ্য রাখিয়া, অবিকল তাহার মতো কোর্তা ও পাজামা ব্যবহার করি, তাহার কোর্তার যে দুই জায়গায় ছেঁড়া আছে, যত্নপূর্বক আমার কোর্তার ঠিক সেই দুই জায়গায় ছিঁড়ি ও তাহার নাকে যে স্থানে তিনটি তিল আছে, আমার নাকের ঠিক সেইখানে কালি দিয়া তিনটি তিল চিত্রিত করি। ঐ একই কারণ হইতে, যাহাদের স্বাভাবিক ভদ্রতা নাই, তাহারা ভদ্র হইতে ইচ্ছা করিলে আনুষ্ঠানিক ভদ্রতার কিছু বাড়াবাড়ি করিয়া থাকে। আমাদের সংগীতশাস্ত্র না কি মৃত শাস্ত্র, সে শাস্ত্রের ভাবটা আমরা না কি আয়ত্ত করিতে পারি

না, এইজন্য রাগরাগিণী, বাদী ও বিসম্বাদী সুরের ব্যাকরণ লইয়াই মহা কোলাহল করিয়া থাকি। যে ভাষার ব্যাকরণ সম্পূর্ণ হইয়াছে, সে ভাষার পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে। ব্যাকরণে ভাষাকে বাঁচাইতে পারে না তো, প্রাচীন ইজিপ্টবাসীদের ন্যায় ভাষার একটি “মমি” তৈরি করে মাত্র। যে সাহিত্যে অলংকারশাস্ত্রের রাজত্ব, সে সাহিত্যে কবিতাকে গঙ্গাযাত্রা করা হইয়াছে। অলংকারশাস্ত্রের পিঞ্জর হইতে মুক্ত হওয়াতে সম্প্রতি কবিতার কণ্ঠ বাংলার আকাশে উঠিয়াছে, আমার ইচ্ছা যে, কবিতার সহচর সংগীতকেও শাস্ত্রের লৌহকারা হইতে মুক্ত করিয়া উভয়ের মধ্যে বিবাহ দেওয়া হউক।

একটা অতি পুরাতন সত্য বলিবার আবশ্যক পড়িয়াছে। সকলেই জানেন, প্রথমে যেটি একটি উদ্দেশ্যের উপায় মাত্র থাকে, মানুষে ক্রমে সেই উপায়টিকে উদ্দেশ্য করিয়া তুলে। রাগরাগিণীর উদ্দেশ্য কী ছিল? ভাব প্রকাশ করা ব্যতীত আর তো কিছু নয়।

ভাব ব্যক্ত করাই যে সংগীতের মুখ্য উদ্দেশ্য এ কথা আপাতত শুনিতে অতি সহজ এবং অনেকেই মনে করিবেন এ কথা আড়ম্বর করিয়া প্রমাণ করিতে বসা অনাবশ্যক। কিন্তু অনেকেই সংগীতের উপযোগিতা বিচার করিবার সময় এ কথা বিস্মৃত হন এবং পাকে প্রকারে এ কথা অস্বীকার করেন। এই নিমিত্ত বিশেষ মনোযোগ সহকারে এ বিষয়ে আলোচনা আবশ্যক। স্পেন্সর সংগীতের শরীরগত কারণ সবিস্তারে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন বাঁধা কুকুর যখন দূর হইতে তাহার মনিবকে দেখে, বন্ধনমুক্ত হইবার আশায় অল্প অল্প লেজ নাড়িতে থাকে। মনিব যতই তাহার কাছে অগ্রসর হয়, ততই সে অধিকতর লেজ নাড়িতে এবং গা দুলাইতে থাকে। মুক্ত করিয়া দিবার অভিপ্রায়ে মনিব তাহার শিকলে হাত দিলে এমন সে লাফালাফি আরম্ভ করে, যে তাহার বাঁধন খোলা বিষম দায় হইয়া উঠে। অবশেষে যখন সম্পূর্ণ ছাড়া পায় তখন খুব খানিকটা ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিয়া তাহার আনন্দের বেগ সামলায়। এইরূপ আনন্দে বা বিষাদে বা অন্যান্য মনোবৃত্তির উদয়ে সকল প্রাণীরই মাংসপেশীতে ও অনুভবজনক স্নায়ুতে উত্তেজনার লক্ষণ প্রকাশিত হয়। মানুষেও সুখে হাসে, যন্ত্রণায় ছটফট করে! রাগে ফুলিতে থাকে, লজ্জায় সংকুচিত হইয়া যায়। অর্থাৎ শরীরের মাংসপেশীসমূহে মনোবৃত্তির প্রভাব তরঙ্গিত হইতে থাকে। মনোবৃত্তির অতিরিক্ত তীব্রতায় আমরা অভিভূত হইয়া পড়ি বটে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সাধারণ নিয়মস্বরূপে বলা যায় যে, শরীরের গতির সহিত হৃদয়ের বৃত্তির বিশেষ যোগ আছে। তাহা যেন হইল, কিন্তু সংগীতের সহিত তাহার কী যোগ? আছে। আমাদের কণ্ঠস্বর

কতকগুলি বিশেষ মাংসপেশী দ্বারা উৎপন্ন হয়; সে-সকল মাংসপেশী শরীরের অন্যান্য পেশীসমূহের সঙ্গে সঙ্গে মনোভাবের উদ্রেকে সংকুচিত হইয়া যায়। এই নিমিত্ত আমরা যখন হাসি, তখন অধরের সমীপবর্তী মাংসপেশী সংকুচিত হয়, এবং হাস্যের বেগ গুরুতর হইলে তৎসঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠ হইতেও একটা শব্দ বাহির হইতে থাকে। রোদনেও ঠিক সেইরূপ। এক কথায়, বিশেষ বিশেষ মনোভাব উদ্রেকের সঙ্গে সঙ্গে শরীরের নানা মাংসপেশী ও কণ্ঠের শব্দ-নিঃসারক মাংসপেশীতে উত্তেজনার আবির্ভাব হয়। মনোভাবের বিশেষত্ব ও পরিমাণ অনুসারে কণ্ঠস্থিত মাংসপেশীসমূহ সংকুচিত হয়; তাহাদের বিভিন্ন প্রকারের সংকোচন অনুসারে আমাদের শব্দযন্ত্র বিভিন্ন আকার ধারণ করে; এবং সেই বিভিন্ন আকার অনুসারে শব্দের বিভিন্নতা সম্পাদিত হয়। অতএব দেখা যাইতেছে, আমাদের কণ্ঠ-নিঃসৃত বিভিন্ন স্বর বিভিন্ন মনোবৃত্তির শরীরগত বিকাশ।

আমাদের মনের ভাব বেগমান হইলে আমাদের কণ্ঠস্বর উচ্চ হয়, নহিলে অপেক্ষাকৃত মৃদু থাকে।

উত্তেজনার অবস্থায় আমাদের গলার স্বরে সুরের আমেজ আসে। সচরাচর সামান্য বিষয়ক কথোপকথনে তেমন সুর থাকে না। বেগবান মনোভাবে সুর আসিয়া পড়ে। রোষের একটা সুর আছে, খেদের একটা সুর আছে, উল্লাসের একটা সুর আছে।

সচরাচর আমরা যে স্বরে কথাবার্তা কহিয়া থাকি তাহাই মাঝামাঝি স্বর। সেই স্বরে কথা কহিতে আমাদের বিশেষ পরিশ্রম করিতে হয় না। কিন্তু তাহার অপেক্ষা উঁচু বা নীচু স্বরে কথা কহিতে হইলে কণ্ঠস্থিত মাংসপেশীর বিশেষ পরিশ্রমের আবশ্যক করে। মনোভাবের বিশেষ উত্তেজনা হইলেই তবে আমরা আমাদের স্বাভাবিক মাঝামাঝি সুর ছড়াইয়া উঠি অথবা নামি। অতএব দেখা যাইতেছে বেগবান মনোবৃত্তির প্রভাবে আমরা আমাদের স্বাভাবিক কথাবার্তার সুরের বাহিরে যাই।

সচরাচর যখন শান্তভাবে কথাবার্তা কহিয়া থাকি তখন আমাদের কথার স্বর অনেকটা একঘেয়ে হয়। সুরের উঁচু-নীচু খেলায় না। মনোবৃত্তির তীব্রতা যতই বাড়ে, ততই আমাদের কথায় সুরের উঁচু-নীচু খেলিতে থাকে। আমাদের গলা খুব নীচু হইতে খুব উঁচু পর্যন্ত উঠানামা করিতে থাকে। কণ্ঠের সাহায্য ব্যতীত ইহার দৃষ্টান্ত দেওয়া দুরূহ। পাঠকেরা একবার কল্পনা করিয়া দেখুন আমরা যখন কাহারো প্রতি রাগ করিয়া বলি “এ তোমার কী রকম স্বভাব?” ‘এ’

শব্দটা কত উঁচু সুরে ধরি ও ‘স্বভাব’ শব্দটায় কতটা নীচু সুরে নামিয়া আসি। ঠিক এক গ্রামের বৈলক্ষণ্য হয়।

যাহা হউক, দেখা যাইতেছে, সচরাচর কথাবার্তার সহিত মনোবৃত্তির উত্তেজিত অবস্থার কথার্বাতার ধারা স্বতন্ত্র। পাঠকেরা অবধান করিয়া দেখিবেন যে, উত্তেজিত অবস্থার কথাবার্তার যে-সকল লক্ষণ, সংগীতেরও তাহাই লক্ষণ। সুখ দুঃখ প্রভৃতির উত্তেজনায় আমাদের কণ্ঠস্বরে যে-সকল পরিবর্তন হয়, সংগীতে তাহারই চূড়ান্ত হয় মাত্র। পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, উত্তেজিত মনোবৃত্তির অবস্থায় আমাদের কথোপকথনে স্বর উচ্চ হয়; স্বরে সুরের আভাস থাকে; সচরাচরের অপেক্ষা স্বরের সুর উঁচু অথবা নীচু হইয়া থাকে, এবং স্বরে সুরের উঁচু-নীচু ক্রমাগত খেলিতে থাকে। গানের স্বরও উচ্চ, গানের সমস্তই সুর; গানের সুর সচরাচর কথোপকথনের সুর হইতে অনেকটা উঁচু অথবা নীচু হইয়া থাকে, এবং গানের সুরে উঁচু-নীচু ক্রমাগত খেলাইতে থাকে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, উত্তেজিত মনোবৃত্তির সুর সংগীতে যথাসম্ভব পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। তীব্র সুখ দুঃখ কণ্ঠে প্রকাশের যে লক্ষণ সংগীতেরও সেই লক্ষণ।

আমাদের মনোভাব গাঢ়তম তীব্রতম রূপে প্রকাশ করিবার উপায়স্বরূপে সংগীতের স্বাভাবিক উৎপত্তি। যে উপায়ে ভাব সর্বোৎকৃষ্টরূপে প্রকাশ করি, সেই উপায়েই আমরা ভাব সর্বোৎকৃষ্টরূপে অন্যের মনে নিবিষ্ট করিয়া দিতে পারি। অতএব সংগীত নিজের উত্তেজনা প্রকাশের উপায় ও পরকে উত্তেজিত করিবার উপায়।

সংগীতের উপযোগিতা সম্বন্ধে স্পেন্সর বলিতেছেন–আপাতত মনে হয় যেন সংগীত শুনিয়া যে অব্যবহিত সুখ হয়, তাহাই সাধন করা সংগীতের কার্য। কিন্তু সচরাচর দেখা যায়, যাহাতে আমরা অব্যবহিত সুখ পাই তাহাই তাহার চরম ফল নহে। আহার করিলে ক্ষুধা নিবৃত্তির সুখ হয়, কিন্তু তাহার চরম ফল শরীর পোষণ। মাতা স্নেহের বশবর্তী হইয়া আত্মসুখ-সাধনের জন্য যাহা করেন তাহাতে সন্তানের মঙ্গল সাধন হয়; যশের সুখ পাইবার জন্য আমরা যাহা করি তাহাতে সমাজের নানা কার্য সম্পন্ন হয়; ইত্যাদি। সংগীতে কি কেবল আমোদ মাত্রই হয়? অলক্ষিত কোনো উদ্দেশ্য সাধিত হয় না?

সকল প্রকার কথোপকথনে দুইটি উপকরণ বিদ্যমান আছে। কথা, ও যে ধরনে সেই কথা উচ্চারিত হয়, কথা ভাবের চিহ্ন (signs of ideas), আর ধরন অনুভাবের চিহ্ন (signs of feeling)। কতকগুলি বিশেষ শব্দ আমাদের ভাবকে বাহিরে প্রকাশ করে, এবং সেই ভাবের

সঙ্গে সঙ্গে আমাদের হৃদয়ে যে-সুখ বা দুঃখ উদয় হয়, সুরে তাহাই প্রকাশ করে। “ধরন বলিতে যদি সুরের বাঁকচোর উঁচু-নীচু সমস্তই বুঝায় তবে বলা যায় যে, বুদ্ধি যাহা-কিছু কথায় বলে, হৃদয় “ধরন” দিয়া তাহারই টীকা করে। কথাগুলি একটা প্রস্তাব মাত্র, আর বলিবার ধরন তাহার টীকা ও ব্যাখ্যা। সকলেই জানেন, অধিকাংশ সময়ে কথা অপেক্ষা তাহা বলিবার ধরনের উপর অধিক নির্ভর করি। অনেক সময়ে কথায় যাহা বলি, বলিবার ধরনে তাহার উল্টা বুঝায়। “বড়োই বাধিত করলে!” কথাটি বিভিন্ন সুরে উচ্চারণ করিলে কিরূপ বিভিন্ন ভাব প্রকাশ করে সকলেই জানেন। অতএব দেখা যাইতেছে, আমরা একসঙ্গে দুই প্রকারের কথা কহিয়া থাকি। ভাবের ও অনুভাবের।

আমাদের কথোপকথনের এই উভয় অংশই একসঙ্গে উন্নতি লাভ করিতেছে সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কথা বাড়িতেছে, ব্যাকরণ বিস্তৃত ও জটিল হইয়া উঠিতেছে, এবং সেইসঙ্গে সঙ্গে যে আমাদের বলিবার ধরন পরিবর্তিত ও উন্নত হইতেছে, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যে কথা বাড়িতেছে, তাহার অর্থই এই যে, ভাব ও অনুভাব বাড়িতেছে। সেইসঙ্গে সঙ্গে যে ভাব ও অনুভাব প্রকাশ করিবার উপায় সর্বতোভাবে সংস্কৃত ও উন্নত হইতেছে না তাহা বলা যায় না। বলা বাহুল্য যে, অনেকগুলি উন্নত ভাব ও সূক্ষ্ম অনুভাব অসভ্যদের নাই, তাহা প্রকাশ করিবার উপকরণও তাহাদের নাই। বুদ্ধির ভাষাও যেমন উন্নত হইতে থাকে, আবেগের (emotion) ভাষাও তেমনি উন্নত হয়। এখন কথা এই, সংগীত আমাদিগকে অব্যবহিত যে সুখ দেয়, তৎসঙ্গে সঙ্গে আমাদের আবেগের ভাষার (language of the emotions) পরিস্ফুটতা সাধন করিতে থাকে। আবেগের ভাষাই সংগীতের মূল। সেই কারণ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া আজ ইহা এক স্বতন্ত্র বৃক্ষরূপে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু যেমন রসায়নশাস্ত্র বস্তুনির্মাণবিদ্যা হইতে জন্ম লাভ করিয়া স্বতন্ত্র শাস্ত্ররূপে উন্নীত হইয়াছে, ও অবশেষে বস্তুনির্মাণবিদ্যার বিশেষ সহায়তা করিতেছে, যেমন শরীরতত্ত্ব চিকিৎসাবিদ্যা হইতে উৎপন্ন হইয়া স্বতন্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে ও চিকিৎসাবিদ্যার উন্নতি সাধন করিতেছে তেমনি সংগীত আবেগের ভাষা হইতে জন্মাইয়া আবেগের ভাষাকে পরিস্ফুট করিয়া তুলিতেছে। সংগীতের এই কার্য।

অনেকে হয়তো সহসা মনে করিবেন এ কার্য তো অতি সামান্য। কিন্তু তাহা নহে। মনুষ্যজাতির সুখ-বর্ধনের পক্ষে আবেগের ভাষা, বুদ্ধির ভাষার সমান উপযোগী। কারণ সুরের বিচিত্র তরঙ্গভঙ্গি আমাদের হৃদয়ের অনুভাব হইতে উৎপন্ন হয় এবং সেই অনুভাব অন্যের হৃদয়ে

জাগ্রত করে। বুদ্ধি মৃত ভাষায় আপনার ভাব-সকল প্রকাশ করে আর সুরের লীলা তাহাতে জীবন সঞ্চার করে। ইহার ফল হয় এই যে সেই ভাবগুলি আমরা কেবলমাত্র যে বুঝি তাহা নহে, তাহা আমরা গ্রহণ করিতে পারি। পরস্পরের মধ্যে সমবেদনা উদ্রেক করিবার ইহাই প্রধান উপায়। সাধারণের মঙ্গল ও আমাদের নিজের সুখ এই সমবেদনার উপর এতখানি নির্ভর করে, যে যাহাতে করিয়া আমাদের মধ্যে এই সমবেদনার বিশেষ চর্চা হয় তাহা সভ্য সমাজের পক্ষে অত্যন্ত আবশ্যক ও উপকারী। এই সমবেদনার প্রভাবেই আমরা পরের প্রতি ন্যায্য ও সদয় ব্যবহার করিয়া থাকি; এই সমবেদনার ন্যূনাধিক্যই অসভ্যদিগের নিষ্ঠুরতা ও সভ্যদিগের সার্বজনীন মমতার কারণ; বন্ধুত্ব, প্রেম, পারিবারিক সুখ, সমস্তই এই সমবেদনার উপরে গঠিত। অতএব এই সববেদনা প্রকাশ করিবার উপায় সভ্যতার পক্ষে কতখানি উপযোগী তাহা আর বলিবার আবশ্যক করে না।

সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের হৃদয়ের দ্বন্দ্ব-পরায়ণ ভাব-সকল অন্তর্হিত হইয়া সামাজিক ভাবের প্রাদুর্ভাব হইতেছে, কেবলমাত্র স্বার্থপর ভাব-সকল দূর হইয়া পরার্থসাধক ভাবের চর্চা হইতেছে। এইরূপ সামাজিক ভাবের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সভ্য জাতিদের সমবেদনার ভাব বিকশিত হইতেছে ও সেইসঙ্গে তাহাদের মধ্যে সমবেদনার ভাষাও বাড়িয়া উঠিতেছে।

অনেকগুলি উন্নততর, সূক্ষ্মতর ও জটিলতর অনুভাব অল্পসংখ্যক শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে প্রচলিত আছে, তাহা কালক্রমে জনসাধারণে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে, তখন আবেগের ভাষাও বিস্তৃত হইয়া পড়িবে। এখন যেমন সভ্যদেশে ভাবপ্রকাশক ভাষা অত্যন্ত অসম্পূর্ণ অবস্থা হইতে এমন দ্রুত উন্নতি লাভ করিতেছে যে, অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও জটিল ভাবসকলও তাহাতে অতি পরিষ্কাররূপে প্রকাশ হইতে পারিতেছে, তেমনি আবেগের ভাষা যদিও এখনো অসম্পূর্ণ রহিয়াছে, তথাপি ক্রমে এতদূর উন্নতি লাভ করিতে পারিবে যে, আমরা আমাদের হৃদয়াবেগ অতি জাজ্বল্যরূপে ও সম্পূর্ণরূপে অন্যের হৃদয়ে মুদ্রিত করিতে পারিব। সকলেই জানেন, অভদ্রদের অপেক্ষা ভদ্রলোকদের গলা অধিক মিষ্ট। একজন অভদ্র যাহা বলে, একজন ভদ্র ঠিক তাহাই বলিলে অপরের অপেক্ষা অনেক মিষ্ট শুনায়। তাহার কারণ আর কিছুই নহে, অভদ্রের অপেক্ষা একজন ভদ্রের অনুভাবের চর্চা অধিক হইয়াছে, সুতরাং অনুভাব প্রকাশের উপায়ও তাঁহাদের সহজ ও স্বাভাবিক হইয়া গিয়াছে; তাহার ঠিক সুরগুলি তাঁহারা জানেন, কণ্ঠস্বরেই বুঝা যায় যে তাঁহারা ভদ্র। বহুকাল হইতে তাঁহারা ভদ্রতার ঠিক সুরটি শুনিয়া আসিতেছেন, তাহাই ব্যবহার করিয়া

আসিতেছেন। অনুভাবপূর্ণ সংগীত যাঁহারা চর্চা করিয়া থাকেন তাঁহাদের যে অনুভাবের ভাষা বিশেষ মার্জিত ও সম্পূর্ণ হইবে তাহাতে আশ্চর্য কী আছে?

সুন্দর রাগিণী শুনিলে আমাদের হৃদয়ে যে সুখের উদ্রেক হয়, তাহার কারণ বোধ করি, অতি দূর ভবিষ্যতে উন্নত সভ্যতার অবস্থায় যে এক সুখময় অনুভাবের দিন আসিবে, সুন্দর রাগিণী তাহারই ছায়া আমাদের হৃদয়ে আনয়ন করে। এই-সকল রাগিণী, যাহার উপযুক্ত অনুভাব আজকাল আমরা খুঁজিয়া পাই না, এমন সময় আসিবে যখন সচরাচর ব্যবহৃত হইতে পারিবে। আজ সুরসমষ্টি মাত্র আমাদের হৃদয়ে যে সুখ দিতেছে, উন্নত যুগে অনুভাবের সহিত মিলিয়া লোকদের তাহার দ্বিগুণ সুখ দিবে। ভালো সংগীত শুনিলে আমাদের হৃদয়ে যে একটি দূর অপরিস্ফুট আদর্শ-জগৎ মায়াময়ী মরীচিকার ন্যায় প্রতিবিম্বিত হইতে থাকে, ইহাই তাহার কারণ। এই তো গেল স্পেন্সরের মত।

আমাদের দেশে সংগীত এমনি শাস্ত্রগত, ব্যাকরণগত, অনুষ্ঠানগত হইয়া পড়িয়াছে, স্বাভাবিকতা হইতে এত দূরে চলিয়া গিয়াছে যে, অনুভাবের সহিত সংগীতের বিচ্ছেদ হইয়াছে, কেবল কতকগুলা সুরসমষ্টির কর্দম এবং রাগরাগিণীর ছাঁদ ও কাঠামো অবশিষ্ট রহিয়াছে; সংগীত একটি মৃত্তিকাময়প্রতিমা হইয়া পড়িয়াছে; তাহাতে হৃদয় নাই, প্রাণ নাই। এইরূপ একই ছাঁচে ঢালা, অপরিবর্তনশীল সংগীতের জড় প্রতিমা আমাদের দেবদেবী মূর্তির ন্যায় বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। সংগীতে এতখানি প্রাণ থাকা চাই, যাহাতে সে সমাজের বয়সের সহিত বাড়িতে থাকে, সমাজের পরিবর্তনের সহিত পরিবর্তিত হইতে থাকে, সমাজের উপর নিজের প্রভাব বিস্তৃত করিতে পারে ও তাহার উপরে সমাজের প্রভাব প্রযুক্ত হয়। সমাজবৃক্ষের শাখায় শুদ্ধমাত্র অলংকারস্বরূপে সংগীত নামে একটা সোনার ডাল বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে, গাছের সহিত সে বাড়ে না, গাছের রসে সে পুষ্ট হয় না, বসন্তে তাহাতে মুকুল ধরে না, পাখিতে তাহার উপর বসিয়া গান গাহে না। গাছের আর-কিছু উপকার করে না কেবল শোভা বর্ধন করে। তাহাও করে কি না বিচার্য।

শোভাবর্ধনের কথা যদি উঠিল তবে তৎসম্বন্ধে দুই-একটি কথা বলা আবশ্যক। সংগীতকে যদি শুদ্ধ কেবল শিল্প, কেবল মনোহারিণী বিদ্যা বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলেও স্বীকার করিতে হয় যে আমাদের দেশীয় অনুভাব-শূন্য সংগীত নিকৃষ্ট শ্রেণীর। চিত্রশিল্প দুই প্রকারের আছে। এক-অনুভাবপূর্ণ মুখশ্রী ও প্রকৃতির অনুকৃতি, দ্বিতীয়-যথাযথ রেখাবিন্যাস দ্বারা একটা নেত্র-

রঞ্জক আকৃতি নির্মাণ করা। কেহই অস্বীকার করিবেন না যে, প্রথমটিই উচ্চতম শ্রেণীর চিত্রবিদ্যা। আমাদের দেশে শালের উপরে, নানাবিধ কাপড়ের পাড়ে, রেখাবিন্যাস ও বর্ণবিন্যাস দ্বারা বিবিধ নয়ন-রঞ্জক আকৃতি-সকল চিত্রিত হয়, কিন্তু শুদ্ধ তাহাতেই আমরা ইটালীয়দের ন্যায় চিত্র-শিল্পী বলিয়া বিখ্যাত হইব না। আমাদের সংগীতও সেইরূপ সুরবিন্যাস মাত্র, যতক্ষণ আমরা তাহার মধ্যে অনুভাব না আনিতে পারিব, ততক্ষণে আমরা উচ্চশ্রেণীর সংগীতবিৎ বলিয়া গর্ব করিতে পারিব না।

অতএব স্বীকার করা যাক রাগরাগিণীর শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য ভাব প্রকাশ করা। কিন্তু এখন তাহা কী হইয়া দাঁড়াইয়াছে? এখন রাগরাগিণীই উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যে রাগরাগিণীর হস্তে ভাবটিকে সমর্পণ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, সে রাগরাগিণী আজ বিশ্বাসঘাতকতা পূর্বক ভাবটিকে হত্যা করিয়া স্বয়ং সিংহাসন দখল করিয়া বসিয়া আছেন। আজ গান শুনিলেই সকলে দেখিতে চান, জয়জয়ন্তী, বেহাগ বা কানেড়া বজায় আছে কি না; আরে মহাশয়, জয়জয়ন্তীর কাছে আমরা এমন কী ঋণে বদ্ধ, যে, তাহার নিকটে অমনতরো অন্ধ দাস্যবৃত্তি করিতে হইবে? যদি স্থল বিশেষে মধ্যমের স্থানে পঞ্চম দিলে ভালো শুনায় কিংবা মন্দ শুনায় না, আর তাহাতে বর্ণনীয় ভাবের সহায়তা করে, তবে জয়জয়ন্তী বাঁচুন বা মরুন, আমি পঞ্চমকেই বাহাল রাখিব না কেন–আমি জয়জয়ন্তীর কাছে এমন কী ঘুষ খাইয়াছি যে তাহার এত গোলামি করিতে হইবে? আজকাল ওস্তাদবর্গ যখন ভীষণ মুখশ্রী বিকাশ করিয়া গলদ্‌ঘর্ম হইয়া গান শুরু করেন, তখন সর্ব প্রথমেই ভাবের গলাটা এমন করিয়া টিপিয়া ধরেন, ও ভাব বেচারীকে এমন করিয়া ত্রাহি ত্রাহি আর্তনাদ ছাড়ান যে, সহৃদয় শ্রোতা মাত্রেরই বড়ো কষ্ট বোধ হয়। বৈয়াকরণে ও কবিতে যে প্রভেদ, উপরি-উক্ত ওস্তাদের সহিত আর-একজন ভাবুক গায়কের সেই প্রভেদ। কোন্ কোন্ রাগরাগিণীতে কী কী সুর লাগে না-লাগে তাহা তো মান্ধাতার আমলে স্থির হইয়া গিয়াছে, তাহা লইয়া আর অধিক পরিশ্রম করিবার কেনো আবশ্যক দেখিতেছি না, এখন সংগীতবেত্তারা যদি বিশেষ মনোযোগ সহকারে আমাদের কী কী রাগিণীতে কী কী ভাব আছে তাহাই আবিষ্কার করিতে আরম্ভ করেন, তবেই সংগীতের যথার্থ উপকার করেন। আমাদের রাগরাগিণীর মধ্যে একটা ভাব আছে, তাহা যাইবে কোথা বলো? কেবল ওস্তাদবর্গেরা তাহাদের অত্যন্ত উৎপীড়ন করিয়া থাকেন, তাহাদের প্রতি কিছুমাত্র মনোযোগ দেন না, এমন-কি তাহারা তাঁহাদের চোখে পড়েই না। সংগীতবেত্তারা সেই ভাবের প্রতি সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করুন। কেন বিশেষ বিশেষ এক-এক রাগিণীতে বিশেষ বিশেষ একএকটা ভাবের উৎপত্তি হয় তাহার কারণ বাহির

করুন। এই মনে করুন, পূরবীতেই বা কেন সন্ধ্যাকাল মনে আসে আর ভৈঁরোতেই বা কেন প্রভাত মনে আসে? পূরবীতেও কোমল সুরের বাহুল্য, আর ভৈঁরোতেও কোমল সুরের বাহুল্য, তবে উভয়েতে বিভিন্ন ফল উৎপন্ন করে কেন? তাহা কি কেবলমাত্র প্রাচীন সংস্কার হইতে হয়? উপস্থিতমত এ বিষয়ে একটা মত দেওয়া আমার পক্ষে অত্যন্ত দুরূহ। এই পর্যন্ত বলিতে পারি ভৈঁরো শুনিবামাত্র আমার মনে প্রভাতের ভাব আসে এবং পূরবী, গৌরী প্রভৃতি রাগিণী শুনিবামাত্র মনের মধ্যে সন্ধ্যার মূর্তি জাজ্বল্যমান হইয়া উঠে। তাহার কতটা পূর্বসংস্কারবশত কতটা অন্য কারণবশত বলা, বিচারসাধ্য। উষা আপনার গতনিদ্র জীবনের পরিপূর্ণতা লইয়া অগাধ নিস্তব্ধ সে জীবনের এখনো ব্যয় হয় নাই ক্ষয় হয় নাই কার্য আরম্ভ হয় নাই–আর সন্ধ্যা পরিণামগাম্ভীর্য ঔদাস্যে বৈরাগ্যে শ্রান্তিভারে আসন্ন তিমির রজনীর আগমন অপেক্ষায় নিস্তব্ধ–ভৈঁরো এবং পূরবীতে প্রভাত ও সন্ধ্যার এই ঐক্য অথচ অনৈক্য আমার মনে উদয় করিয়া দেয়। তাহার পর যখন দেখিতেছি উক্ত দুই রাগিণী বহুকাল ধরিয়া উক্ত দুই সময়ের জন্য আমাদের দেশের সর্বসাধারণে ধার্য করিয়াছে তখন সহজেই মনে হয় উক্ত দুই রাগিণীর মধ্যে এমন কিছু আছে, যে কারণে উহারা সন্ধ্যা ও প্রভাতের ভাব আমাদের মনে উদ্রেক করিয়া দেয়। সেটি যে কী, তাহা আমি গীতানুরাগী বিচক্ষণ ভাবুক ব্যক্তিদিগকে অনুশীলন করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। দেখা গিয়াছে আমাদের দিবাবসানের রাগিণীতে কোমল রেখাব এবং কড়ি মধ্যমের যোগই বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়–এবং ভৈঁরোতে কোমল রেখাব লাগে বটে কিন্তু কড়ি মধ্যম লাগে না, শুদ্ধ মধ্যম লাগে, এই সামান্য প্রভেদেই প্রথমত সুরের মূর্তি অনেক পরিবর্তন হইয়া যায় তাহার পরে অন্যান্য প্রভেদও আছে। এইরূপ সুরের সামান্য পরিবর্তনে কেন যে ভাবের মূর্তি এত পরিবর্তিত হয় তাহা বলা আমার সাধ্যায়ত্ত নহে।

কোন্ সুরগুলি দুঃখের ও কোন্ত সুরগুলি সুখের হওয়া উচিত দেখা যাক। কিন্তু তাহা বিচার করিবার আগে, আমরা দুঃখ ও সুখ কিরূপে প্রকাশ করি দেখা আবশ্যক। আমরা যখন রোদন করি তখন দুইটি পাশাপাশি সুরের মধ্যে ব্যবধান অতি অল্পই থাকে, রোদনের স্বর প্রত্যেক কোমল সুরের উপর দিয়া গড়াইয়া যায়, সুর অত্যন্ত টানা হয়। আমরা যখন হাসি–হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ, কোমল সুর একটিও লাগে না, টানা স্বর একটিও নাই, পাশাপাশি সুরের মধ্যে দূর ব্যবধান, আর তালের ঝোঁকে ঝোঁকে সুর লাগে। দুঃখের রাগিণী দুঃখের রজনীর ন্যায় অতি ধীরে ধীরে

চলে, তাহাকে প্রতি কোমল সুরের উপর দিয়া যাইতে হয়। আর সুখের রাগিণী সুখের দিবসের ন্যায় অতি দ্রুত পদক্ষেপে চলে, দুই-তিনটা করিয়া সুর ডিঙাইয়া যায়। আমাদের রাগরাগিণীর মধ্যে উল্লাসের সুর নাই। আমাদের সংগীতের ভাবই-ক্রমে ক্রমে উত্থান বা ক্রমে ক্রমে পতন। সহসা উত্থান বা সহসা পতন নাই। উচ্ছ্বাসময় উল্লাসের সুরই অত্যন্ত সহসা। আমরা সহসা হাসিয়া উঠি, কোথা হইতে আরম্ভ করি কোথায় শেষ করি তাহার ঠিকানা নাই, রোদনের ন্যায় তাহা ক্রমশ মিলাইয়া আসে না। এরূপ ঘোরতর উল্লাসের সুর ইংরাজি রাগিণীতে আছে, আমাদের রাগিণীতে নাই বলিলেও হয়। তবে আমাদের দেশের সংগীতে রোদনের সুরের অভাব নাই। সকল রাগিণীতেই প্রায় কাঁদা যায়। একেবারে আর্তনাদ হইতে প্রশান্ত দুঃখ, সকল প্রকার ভাবই আমাদের রাগিণীতে প্রকাশ করা যায়।

আমাদের যাহা-কিছু সুখের রাগিণী আছে, তাহা বিলাসময় সুখের রাগিণী, গদগদ সুখের রাগিণী। অনেক সময়ে আমরা উল্লাসের গান রচনা করিতে হইলে রাগিণী যে ভাবেরই হউক তাহাকে দ্রুত তালে বসাইয়া লই, দ্রুত তাল সুখের ভাব প্রকাশের একটা অঙ্গ বটে।

যাহা হউক, এইখানে দেখা যাইতেছে যে, তালও ভাব প্রকাশের একটা অঙ্গ। যেমন সুর তেমনি তালও আবশ্যকীয়, উভয়ে প্রায় সমান আবশ্যকীয়। অতএব ভাবের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তালও দ্রুত ও বিলম্বিত করা আবশ্যক-সর্বত্রই যে তাল সমান রাখিতেই হইবে তাহা নয়। ভাব প্রকাশকে মূখ্য উদ্দেশ্য করিয়া সুর ও তালকে গৌণ উদ্দেশ্য করিলেই ভালো হয়। ভাবকে স্বাধীনতা দিতে হইলে সুর এবং তালকেও অনেকটা স্বাধীন করিয়া দেওয়া আবশ্যক, নহিলে তাহারা ভাবকে চারি দিক হইতে বাঁধিয়া রাখে। এই সকল ভাবিয়া আমার বোধ হয়, আমাদের সংগীতে যে নিয়ম আছে যে যেমন-তেমন করিয়া ঠিক একই স্থানে সমে আসিয়া পড়িতেই হয়, সেটা উঠাইয়া দিলে ভালো হয়। তালের সমমাত্রা থাকিলেই যথেষ্ট, তাহার উপরে আরো কড়াক্কড় করা ভালো বোধ হয় না; তাহাতে স্বাভাবিকতার অতিরিক্ত হানি করা হয়। মাথায় জলপূর্ণ কলস লইয়া নৃত্য করা যেরূপ, হাজার অঙ্গভক্তি করিলেও একবিন্দু জল উথলিয়া পড়িবে না, ইহাও সেইরূপ একপ্রকার কষ্টসাধ্য ব্যায়াম। সহজ স্বাভাবিক নৃত্যের যে একটি শ্রী আছে ইহাতে তাহার যেন ব্যাঘাত করে; ইহাতে কৌশল প্রকাশ করে মাত্র। নৃত্যের পক্ষে কী স্বাভাবিক? না যাহা নৃত্যের উদ্দেশ্য সাধন করে। নৃত্যের উদ্দেশ্য কী? না অঙ্গভঙ্গির সৌন্দর্য অঙ্গভঙ্গির কবিতা দেখাইয়া মনোহরণ করা। সে উদ্দেশ্যের বহির্ভুক্ত যাহা-কিছু, তাহা নৃত্যের

বহির্ভুক্ত। তাহাকে নৃত্য বলিব না, তাহার অন্য নাম দিব। তেমনি সংগীত কৌশল প্রকাশের স্থান নহে ভাব প্রকাশের স্থান, যতখানিতে ভাব প্রকাশের সাহায্য করে ততখানিই সংগীতের অন্তর্গত, যাহা-কিছু কৌশল প্রকাশ করে তাহা সংগীত নহে তাহার অন্য নাম। একপ্রকার কবিতা আছে, তাহা সোজা দিক হইতে পড়িলেও যাহা বুঝায়, উল্টা দিক হইতে পড়িলেও তাহাই বুঝায়, সেরূপ কবিতা কৌশল প্রকাশের জন্যই উপযোগী, আর-কোনো উদ্দেশ্য তাহাতে সাধন করা যায় না। সেইরূপ আমাদের সংগীতে কৃত্রিম তালের প্রথা ভাবের হস্ত পদে একটা অনর্থক শৃঙ্খল বাঁধিয়া দেয়। যাঁহারা এ প্রথা নিতান্ত রাখিতে চান, তাঁহারা রাখুন, কিন্তু তালের প্রতি ভাবের যখন অত্যন্ত নির্ভর দেখিতেছি, তখন আমার মতে আর-একট অধিকতর স্বাভাবিক তালের পদ্ধতি থাকা শ্রেয়। আর কিছু করিতে হইবে না, যেমন তাল আছে, তেমনি থাকুক, মাত্রা বিভাগ যেমন আছে তেমনি থাকুক, কেবল একটা নির্দিষ্টস্থানে সমে ফিরিয়া আসিতেই হইবে এমন বাঁধাবাঁধি না থাকিলে সুবিধা বৈ অসুবিধা কিছুই দেখিতেছি না। এমন কি গীতিনাট্যে, যাহা আদ্যোপান্ত সুরে অভিনয় করিতে হয় তাহাতে, স্থান-বিশেষে তাল না থাকা বিশেষ আবশ্যক। নহিলে অভিনয়ের স্ফূর্তি হওয়া অসম্ভব।

যাহা হউক, দেখা যাইতেছে যে, সংগীতের উদ্দেশ্যই ভাব প্রকাশ করা। যেমন কেবলমাত্র ছন্দ, কানে মিষ্ট শুনাক তথাপি অনাবশ্যক, ভাবের সহিত ছন্দই কবিদের ও ভাবুকদের আলোচনীয়, তেমনি কেবলমাত্র সুরসমষ্টি, ভাব না থাকিলে জীবনহীন দেহ মাত্র; সে দেহের গঠন সুন্দর হইতে পারে কিন্তু তাহাতে জীবন নাই। কেহ কেহ বলিবেন, তবে কি রাগরাগিণী আলাপ নিষিদ্ধ? আমি বলি, তাহা কেন হইবে? রাগরাগিণী আলাপ, ভাষাহীন সংগীত। অভিনয়ে pantomime যেরূপ, ভাষাহীন, অঙ্গভঙ্গি দ্বারা ভাবপ্রকাশ-করা-সংগীতে আলাপও সেইরূপ। কিন্তু pantomime এ যেমন কেবলমাত্র অঙ্গভঙ্গি হইলেই হয় না, যে-সকল অঙ্গভঙ্গি দ্বারা ভাব প্রকাশ হয় তাহাই আবশ্যক; আলাপেও সেইরূপ কেবল কতকগুলি সুর কণ্ঠ হইতে বিক্ষেপ করিলেই হইবে না, যে-সকল সুরবিন্যাস দ্বারা ভাব প্রকাশ হয়, তাহাই আবশ্যক। গায়কেরা সংগীতকে যে আসন দেন, আমি সংগীতকে তদপেক্ষা উচ্চ আসন দিই; তাহারা সংগীতকে কতকগুলা চেতনাহীন জড় সুরের উপর স্থাপন করেন, আমি তাহাকে জীবন্ত অমর ভাবের উপর স্থাপন করি। তাঁহারা গানের কথার উপরে সুরকে দাঁড় করাইতে চান, আমি গানের কথাগুলিকে সুরের উপরে দাঁড় করাইতে চাই। তাঁহারা কথা বসাইয়া যান সুর বাহির করিবার

জন্য, আমি সুর বসাইয়া যাই কথা বাহির করিবার জন্য। এইখানে গান রচনা সম্বন্ধে একটি কথা বলা আবশ্যক বিবেচনা করিতেছি। গানের কবিতা, সাধারণ কবিতার সঙ্গে কেহ যেন এক তুলাদণ্ডে ওজন না করেন। সাধারণ কবিতা পড়িবার জন্য ও সংগীতের কবিতা শুনিবার জন্য। উভয়ে যদি এতখানি শ্রেণীগত প্রভেদ হইল, তবে অন্যান্য নানা ক্ষুদ্র বিষয়ে অমিল হইবার কথা। অতএব গানের কবিতা পড়িয়া বিচার না করাই উচিত। খুব ভালো কবিতাও গানের পক্ষে হয়তো খারাপ হইতে পারে এবং খুব ভালো গানও হয়তো পড়িবার পক্ষে ভালো না হইতে পারে। মনে করুন, একজন হাঃ-বলিয়া একটি নিশ্বাস ফেলিল, তাহা লিখিয়া লইলে আমরা পড়িব “হ” য়ে আকার ও বিসর্গ, হাঃ, কিন্তু সে নিশ্বাসের মর্ম কি এরূপে অবগত হওয়া যায়? তেমনি আবার যদি আমরা শুনি কেহ খুব একটা লম্বা-চৌড়া কবিত্বসূচক কথায় নিশ্বাস ফেলিতেছে, তবে হাস্যরস ব্যতীত আর কোনো রস কি মনে আসে? গানও সেইরূপ নিশ্বাসের মতো। গানের কবিতা পড়া যায় না, গানের কবিতা শুনা যায়।

উপসংহারে সংগীতবেত্তাদিগের প্রতি আমার এই নিবেদন যে, কী কী সুর কিরূপে বিন্যাস করিলে কী কী ভাব প্রকাশ করে, আর কেনই বা তাহা প্রকাশ করে, তাহার বিজ্ঞান অনুসন্ধান করুন। মূলতান, ইমন-কল্যাণ, কেদারা প্রভৃতিতে কী কী সুর বাদী আর কী কী সুর বিসম্বাদী তাহার প্রতি মনোযোগ না করিয়া, দুঃখ সুখ, রোষ বা বিস্ময়ের রাগিণীতে কী কী সুর বাদী ও কী কী সুর বিসম্বাদী, তাহাই আবিষ্কারে প্রবৃত্ত হউন। মূলতান কেদারা প্রভৃতি তো মানুষের রচিত কৃত্রিম রাগরাগিণী, কিন্তু আমাদের সুখদুঃখের রাগরাগিণী কৃত্রিম নহে। আমাদের স্বাভাবিক কথাবার্তার মধ্যে সেই-সকল রাগরাগিণী প্রচ্ছন্ন থাকে। কতকগুলো অর্থশূন্য নাম পরিত্যাগ করিয়া, বিভিন্ন ভাবের নাম অনুসারে আমাদের রাগরাগিণীর বিভিন্ন নামকরণ করা হউক। আমাদের সংগীত-বিদ্যালয়ে সুর অভ্যাস ও রাগরাগিণী শিক্ষার শ্রেণী আছে, সেখানে রাগরাগিণীর ভাবশিক্ষারও শ্রেণী স্থাপিত হউক। এখন যেমন সংগীত শুনিলেই সকলে বলেন “বাঃ ইহার সুর কী মধুর”, এমন দিন আসিবে না যেদিন সকলে বলিবেন, “বাঃ কী সুন্দর ভাব’ ’ আমাদের সংগীত যখন জীবন্ত ছিল, তখন ভাবের প্রতি যেরূপ মনোযোগ দেওয়া হইত সেরূপ মনোযোগ আর কোনো দেশের সংগীতে দেওয়া হয় কি না সন্দেহ। আমাদের দেশে যখন বিভিন্ন ঋতু ও বিভিন্ন সময়ে ভাবের সহিত মিলাইয়া বিভিন্ন রাগরাগিণী রচনা করা হইত, যখন আমাদের রাগরাগিণীর বিভিন্ন ভাবব্যঞ্জক

চিত্র পর্যন্ত ছিল, তখন স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, আমাদের দেশে রাগরাগিণী ভাবের সেবাতেই নিযুক্ত ছিল। সেদিন গিয়াছে। কিন্তু আবার কি আসিবে না?

সংগীতের মুক্তি

সংগীত সম্বন্ধে কিছু বলিবার জন্য সংগীতসংঘ হইতে আমাকে অনুরোধ করা হইয়াছে। ফর্মাশ এই যে, দিশি বিলাতি কোনোটাকে যেন বাদ দেওয়া না হয়। বিষয়টা গুরুতর এবং তাহা আলোচনা করিবার একটিমাত্র যোগ্যতা আমার আছে– তাহা এই যে,দিশি এবং বিলাতি কোনো সংগীতই আমি জানি না।

তা বলিয়া জানি না বলিতে এতটা দূর বোঝায় না যে, সংগীতের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্কই নাই। সম্পর্কটা কী রকম সেটা একটু খোলসা করিয়া বলা চাই।

পৃথিবীতে দুই রকমের জানা আছে। এক ব্যবসায়ীর জানা, আর-এক অব্যবসায়ীর জানা। ব্যবসায়ী জানে যেটা জানা সহজ নয়, অর্থাৎ নাড়ি-নক্ষত্র। আর অব্যবসায়ী জানে যেটা জানা নিতান্তই সহজ, অর্থাৎ হাব-ভাব, চাল- চলন।

এই নাড়ি-নক্ষত্র জানাটাই প্রকৃত জানা এমন একটা অন্ধসংস্কার সংসারে চলিত আছে। তাই সরলহৃদয় আনাড়িদের মনে সর্বদাই একটা ভয় থাকে ঐ নাড়ি-নক্ষত্র পদার্থটা না জানি কী! আর, ব্যবসায়ী লোকেরা ঐ নাড়ি-নক্ষত্রের দোহাই দিয়া অব্যবসায়ী লোকের মুখ চাপা দিয়া রাখেন।

অথচ জগতে ওস্তাদ কয়েকজন মাত্র, আর অধিকাংশই আনাড়ি। বর্তমান যুগের প্রধান সর্দার হচ্ছে ডিমক্রেসি, সাধুভাষায় যাকে বলে “অধিকাংশ’। অতএব, এ যুগে আনাড়িরও কথা বলিবার অধিকার আছে। এমন-কি, তার অধিকারই বেশি। যে বলে “আমি জানি’ সেই কেবল কথা কহিয়া যাইবে আর যে জানে “আমি জানি না’ সেই চুপ করিয়া যাইবে, এখনকার কালের এমন ধর্ম নহে। অতএব আজ আমি গান সম্বন্ধে যা বলিব তা সেই আনাড়িদের প্রতিনিধিরূপে।

কিন্তু মনে থাকে যেন আনাড়িদের একজন মাত্র প্রতিনিধিতে কুলায় না। সব সেয়ানের এক মত, কেননা তাদের বাঁধা রাস্তা; যারা সেয়ানা নয় তাদের অনেক মত, কেননা তাদের রাস্তাই নাই। তাই বহু সেয়ানার এক প্রতিনিধি চলে, কিন্তু অসেয়ানাদের মধ্যে যতগুলিই মানুষ

ততগুলিই প্রতিনিধি। অতএব হিসাব-নিকাশের সময় হয়তো দেখিবেন আমার মতের মিল এক ব্যক্তির সঙ্গেই আছে এবং সে ব্যক্তি আমার মধ্যেই বিরাজমান।

আনাড়ির মস্ত সুবিধা এই যে, সানাড়ির চেয়ে তার অভিজ্ঞতার সুযোগ বেশি। কেননা, পথ একটা বৈ নয় কিন্তু অপথের সীমা নাই; সে দিক দিয়া যে চলে সেই বেশি দেখে, বেশি ঠেকে। আমি পথ জানি না বলিয়াই হোক কিংবা আমার মনটা লক্ষ্মীছাড়া স্বভাবের বলিয়াই হোক, এতদিন গানের ঐ অপথ এবং আঘাটা দিয়াই চলিয়াছি। সুতরাং আমার অভিজ্ঞতায় যাহা মিলিয়াছে তাহা শাস্ত্রের সঙ্গে মেলে না। এটা নিশ্চয়ই অপরাধের বিষয়, কিন্তু সেইজন্যেই হয়তো মনোরম হইতে পারে।

কাব্যকলা বা চিত্রকলা দুটি ব্যক্তিকে লইয়া। যে মানুষ রচনা করে আর যে মানুষ ভোগ করে। গীতিকলায় আরো একজন প্রবেশ করিয়াছে। রচয়িতা এবং শ্রোতার মাঝখানে আছে ওস্তাদ। মধ্যস্থ পদার্থটা বিন্ধ্য পর্বতের মতো বাধাও হইতে পারে, আবার সুয়েজ ক্যানালের মতো সুযোগও হইতে পারে। তবু, যাই হোক, উপসর্গ বাড়িলে বিপদও বাড়ে। রসের স্রষ্টা এবং রসের ভোক্তা এই দুয়ের উপযুক্তমত সমাবেশ, সংসারে এইই তো যথেষ্ট দুর্লভ, তার উপরে আবার রসের বাহনটি– ত্রৈগুণ্যের এমন পরিপূর্ণ সম্মিলন বড়ো কঠিন। ইংরেজিতে একটা প্রবাদ আছে– দুয়ের যোগে সঙ্গ, তিনের যোগে গোলযোগ।

ইন্দ্রের চেয়ে ইন্দ্রের ঐরাবতের বিপুলতা নিশ্চয়ই অনেক গুণে বড়ো। গীতিকলায় তেমনি ওস্তাদ অনেকখানি জায়গা জুড়িয়াছেন। দেবতার চেয়ে পাণ্ডাকে যেমন ঢের বেশি খাতির করিতে হয়, তেমনি আসরে ওস্তাদের খাতির স্বয়ং সংগীতকেও যেন ছাড়াইয়া যায়। কৃষ্ণ বড়ো কি রাধা বড়ো এ তর্ক শুনিয়াছি, কিন্তু মথুরার রাজসভার দারোয়ানজি বড়ো কিনা এই তর্কটা বাড়িল।

যে লোক মাঝারি সে তার মাঝখানের নির্দিষ্ট জায়গাটিতে সন্তুষ্ট থাকে না, সে প্রমাণ করিতে চায় যে সেই যেন উপরওয়ালা। উত্তমের বিনয় স্বাভাবিক, অধমের বিনয় দায়ে পড়িয়া, কিন্তু জগতে সব চেয়ে দুঃসহ ঐ মধ্যম। রাজা মানুষটি ভালোই, আর প্রজা তো মাটির মানুষ, কিন্তু আম্‌লা! তার কথা চাপিয়া যাওয়াই ভালো। নিজের “রাজকর্মচারী’ নামটার প্রথম অংশটাই তার মনে থাকে, দ্বিতীয় অংশটা কিছুতেই সে মুখস্থ করিয়া উঠিতে পারে না। এই কারণেই

যেখানে প্রজার হাতে কোনো ক্ষমতাই নাই, সেখানে আমলাতন্ত্র অর্থাৎ ব্যুরোক্রেসি উঁচুদরের জিনিস হইতে পারে না। আমাদের সংগীতে এই ব্যুরোক্রেসির আধিপত্য ঘটিল।

এইখানে য়ুরোপের সংগীত-পলিটিক্সের সঙ্গে আমাদের সংগীত-পলিটিক্সের তফাত। সেখানে ওস্তাদকে অনেক বেশি বাঁধাবাঁধির মধ্যে থাকিতে হয়। গানের কর্তা নিজের হাতে সীমানা পাকা করিয়া দেন, ওস্তাদ সেটা সম্পূর্ণ বজায় রাখেন। তাঁকে যে নিতান্ত আড়ষ্ট হইয়া থাকিতে হইবে তাও নয়, আবার খুব যে দাপাদাপি করিবেন সে রাস্তাও বন্ধ।

য়ুরোপের প্রত্যেক গান একটি বিশেষ ব্যক্তি, সে আপনার মধ্যে প্রধানত আত্মমর্যাদাই প্রকাশ করে। ভারতে প্রত্যেক গান একটি বিশেষ-জাতীয়, সে আপনার মধ্যে প্রধানত জাতিমর্যাদাই প্রকাশ করে। য়ুরোপীয় ওস্তাদকে সাবধানে গানের ব্যক্তিত্ব বজায় রাখিয়া চলিতে হয়। আমাদের দেশের গানে ব্যক্তিত্ব আছে, কেবল সে কোন্ জাতি তাই সন্তোষজনকরূপে প্রমাণ করিবার জন্যে। য়ুরোপে গান সম্বন্ধে যে কর্তৃত্ব গান-রচয়িতার, আমাদের দেশে তাহাই দুইজনে বখরা করিয়া লইয়াছে– গানওয়ালা এবং গাহনেওয়ালা। যেখানে কর্তৃত্বের এমন জুড়ি হাঁকানো হয় সেখানে রাস্তাটা চওড়া চাই। গানের সেই চওড়া রাস্তার নাম রাগরাগিণী। সেটা গানকর্তার প্রাইভেট রাস্তা নয়, সেখানে ট্রেস্‌পাসের আইন খাটে না।

এক হিসাবে এ বিধিটা ভালোই। যে মানুষ গান বাঁধিবে আর যে মানুষ গান গাহিবে দুজনেই যদি সৃষ্টিকর্তা হয় তবে তো রসের গঙ্গাযমুনাসংগম। যে গান গাওয়া হইতেছে সেটা যে কেবল আবৃত্তি নয়, তাহা যে তখন-তখনি জীবন-উৎস হইতে তাজা উঠিতেছে, এটা অনুভব করিলে শ্রোতার আনন্দ অক্লান্ত অম্লান হইয়া থাকে। কিন্তু মুশকিল এই যে, সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা জগতে বিরল। যাদের শক্তি আছে তারা গান বাঁধে, আর যাদের শিক্ষা আছে তারা গান গায়– সাধারণত এরা দুই জাতের মানুষ। দৈবাৎ ইহাদের জোড় মেলে, কিন্তু প্রায় মেলে না। ফলে দাঁড়ায় এই যে, কলাকৌশলের কলা অংশটা থাকে গানকর্তার ভাগে, আর ওস্তাদের ভাগে পড়ে কৌশল অংশটা। কৌশল জিনিসটা খাদ হিসাবেই চলে, সোনা হিসাবে নয়। কিন্তু ওস্তাদের হাতে খাদের মিশল বাড়িতেই থাকে। কেননা, ওস্তাদ মানুষটাই মাঝারি, এবং মাঝারির প্রভূত্বই জগতে সব চেয়ে বড়ো দুর্ঘটনা। এইজন্যে ভারতের বৈঠকী সংগীত কালক্রমে সুরসভা ছাড়িয়া অসুরের

কুস্তির আখড়ায় নামিয়াছে। সেখানে তান-মান-লয়ের তাণ্ডবটাই প্রবল হইয়া ওঠে, আসল গানটা ঝাপ্‌সা হইয়া থাকে।

রসবোধের নাড়ি যখন ক্ষীণ হইয়া আসে কৌশল তখন কলাকে ছাড়াইয়া যায়, সাহিত্যের ইতিহাসেও ইহা বরাবর দেখা গেছে। এ দেশে গানের যখন ভরাযৌবন ছিল তখন এমন-সব ওস্তাদ নিশ্চয়ই সর্বদা মিলিত, গান গাওয়াই যাঁদের স্বভাব, গানের পালোয়ানি করা যাঁদের ব্যাবসা নয়। বুলবুলি তখন গানেরই খ্যাতি পাইত, লড়াইয়ের নয়, তখন এমন-সকল শ্রোতাও নিশ্চয়ই ছিল যাঁরা সংগীত-ভাটপাড়ার বিধান যাচাইয়া গানের বিচার করিতেন না। কেননা, শুনিবারও প্রতিভা থাকা চাই, কেবল শুনাইবার নয়।

আমাদের কালোয়াতি গানের এই যে রাগরাগিণী, ইহার রসটা কী? রাগ শব্দের গোড়াকার মানে রঙ। এই শব্দটা যখন মনের সম্বন্ধে ব্যবহার করা হয় তখন বোঝায় ভালো লাগা। বাংলায় রাগ কথাটার মানে ক্রোধ। ভালো লাগা আর ক্রোধ এই দুয়ের মধ্যে একটা ঐক্য আছে। এই দুটো ভাবেই চিত্ত উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে। এই দুয়েরই এক রঙ, সেই রঙটা রাঙা। ওটা রক্তের রঙ, হৃদয়ের নিজের আভা।

বিশ্বের একটা হৃদয়ের আভা নিয়ত প্রকাশ পাইতেছে। ভোরবেলাকার আকাশে হাওয়ায় এমন কিছু একটা আছে যেটা কেবলমাত্র বস্তু নয়,ঘটনা নয়, যেটা কেবল রস। এই রসের ক্ষেত্রেই আমাদের অন্তরের সঙ্গে বাহিরের রাগ-অনুরাগের মিল। এই মিলের তত্ত্বটি অনির্বচনীয়। যাহা নির্বাচনীয় তাহা পৃথক, তাহা আপনাতে আপনি সুনির্দিষ্ট। যেখানে পদ্মফুলের নির্বচনীয়তা সেখানে তার আকার আয়তন ও বস্তুপরিমাণ সম্পূর্ণ সীমাবদ্ধভাবে তার আপনারই। কিন্তু যেখানে পদ্মটি অনির্বচনীয় সেখানে সে যেন আপনার সমস্তটার চেয়েও আপনি অনেক বেশি। এই বেশিটুকুই তার সংগীত।

পদ্মের যেখানে এই বেশি সেখানে তার সঙ্গে আমার বেশিরও একটা গভীর মিল। তাই তো গাহিতে পারি–

আজি কমলমুকুলদল খুলিল!
দুলিল রে দুলিল

মানসসরসে রসপুলকে–
পলকে পলকে ঢেউ তুলিল।
গগন মগন হল গন্ধে;
সমীরণ মূর্ছে আনন্দে;
গুন্ গুন্ গুঞ্জনছন্দে
মধুকর ঘিরি ঘিরি বন্দে;
নিখিলভুবনমন ভুলিল,
মন ভুলিল রে
মন ভুলিল।

হৃদয়ের আনন্দে আর পদ্মে অভেদ হইল– ভাষার একেবারে উলটপালট হইয়া গেল। যার রূপ নাই সে রূপ ধরিল, যার রূপ আছে সে অরূপ হইল। এমন-সব অনাসৃষ্টি কাণ্ড ঘটিতেছে কোথায়? সৃষ্টি যেখানে অনির্বচনীয়তায় আপনাকে আপনি ছাড়াইয়া যাইতেছে।

আমাদের রাগ-রাগিণীতে সেই অনির্বচনীয় বিশ্বরসটিকে নানা বড়ো বড়ো আধারে ধরিয়া-রাখার চেষ্টা হইয়াছে। যখন কল হয় নাই তখন কলিকাতার গঙ্গার জল যেমন করিয়া জালায় ধরা হইত। যজ্ঞকর্তা আপন ইচ্ছা ও শক্তি অনুসারে নানা গড়নের ও নানা ধাতুর পাত্রে সেই রস পরিবেশন করিতে পারেন, কিন্তু একই সাধারণ জলাশয় হইতে সেটা বহিয়া আনা।

অর্থাৎ আমাদের মতে রাগ-রাগিণী বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে নিত্য আছে। সেইজন্য আমাদের কালোয়াতি গানটা ঠিক যেন মানুষের গান নয়, তাহা যেন সমস্ত জগতের। ভৈরোঁ যেন ভোরবেলার আকাশেরই প্রথম জাগরণ; পরজ যেন অবসন্ন রাত্রিশেষের নিদ্রাবিহ্বলতা; কানাড়া যেন ঘনান্ধকারে অভিসারিকা নিশীথিনীর পথবিস্মৃতি; ভৈরবী যেন সঙ্গবিহীন অসীমের চিরবিরহবেদনা; মূলতান যেন রৌদ্রতপ্ত দিনান্তের ক্লান্তিনিশ্বাস; পূরবী যেন শূন্যগৃহচারিণী বিধবা সন্ধ্যার অশ্রুমোচন।

ভারতবর্ষের সংগীত মানুষের মনে বিশেষ ভাবে এই বিশ্বরসটিকেই রসাইয়া তুলিবার ভার লইয়াছে। মানুষের বিশেষ বেদনাগুলিকে বিশেষ করিয়া প্রকাশ করা তার অভিপ্রায় নয়। তাই, যে সাহানার সুর অচঞ্চল ও গভীর, যাহাতে আমোদ-আহ্লাদের উল্লাস নাই, তাহাই আমাদের

বিবাহ-উৎসবের রাগিণী। নরনারীর মিলনের মধ্যে যে চিরকালীন বিশ্বতত্ত্ব আছে সেইটিকে সে স্মরণ করাইতে থাকে, জীবজন্মের আদিতে যে দ্বৈতের সাধনা তাহারই বিরাট বেদনাটিকে ব্যক্তিবিশেষের বিবাহঘটনার উপরে সে পরিব্যাপ্ত করিয়া দেয়।

আমাদের রামায়ণ মহাভারত সুরে গাওয়া হয়, তাহাতে বৈচিত্র্য নাই, তাহা রাগিণী নয়, তাহা সুর মাত্র। আর কিছু নয়, ওটুকুতে কেবল সংসারের সমস্ত তুচ্ছতা দীনতা এবং বিচ্ছিন্নতার উপরের দিকে একটু ইশারা করিয়া দেয় মাত্র। মহাকাব্যের ভাষাটা যেখানে একটা কাহিনী বলিয়া চলে, সুর সেখানে সঙ্গে সঙ্গে কেবল বলিতে থাকে– অহো, অহো, অহো! ক্ষিতি অপে মিশাল করিয়া যে মূর্তি গড়া তার সঙ্গে তেজ মরুৎ ব্যোমে যে সংযোগ আছে এই খবরটা মনে করাইয়া রাখে।

আমাদের বেদমন্ত্রগানেও ঐরূপ। তার সঙ্গে একটি সরল সুর লাগিয়া থাকে, মহারণ্যের মর্মরধ্বনির মতো, মহাসমুদ্রের কলগর্জনের মতো। তাহাতে কেবল এই আভাস দিতে থাকে যে, এই কথাগুলি একদিন দুইদিনের নহে, ইহা অন্তহীন কালের, ইহা মানুষের ক্ষণিক সুখদুঃখের বাণী নহে, ইহা আত্মার নীরবতারই যেন আত্মগত নিবেদন।

মহাকাব্যের বড়ো কথাটা যেখানে স্বতই বড়ো, কাব্যের খাতিরে সুর সেখানে আপনাকে ইঙ্গিত মাত্রে ছোটো করিয়া রাখিয়াছে, কিন্তু যেখানে আবার সংগীতই মুখ সেখানে তার সঙ্গের কথাটি কেবলই বলিতে থাকে, “আমি কেহই না, আমি কিছুই না, আমার মহিমা সুরে।’ – এইজন্য হিন্দুস্থানী গানের কথাটা অধিকাংশ স্থলেই যা-খুশি-তাই।

এই-যে পূরবীর গান–

“লইরে শ্যাম এঁদোরিয়ো,
ক্যয়সে ধরুঁ মেরে
শিরো’পর গাগরিয়া’ –

এর মানে, “শ্যাম আমার জলের কলসী রাখবার বিড়েটা চুরি করিয়াছে।’ এই তুচ্ছ কথাটাকে এত বড়ো সুগভীর বেদনার সুরে বাঁধিবামাত্র মন বলে এই-যে কলসী, এই-যে বিড়ে,

এ তো সামান্য কলসী সামান্য বিড়ে নয়, এ এমন একটা-কিছু চুরি যার দাম বলিবার মতো ভাষা জগতে নাই- যার হিসাবের অসীম অঙ্কটা কেবল ঐ পূরবীর তানের মধ্যেই পৌঁছে।

কোনো একটা বিশেষ উদ্দীপনা- যেমন যুদ্ধের সময় সৈনিকদের মনকে রণোৎসাহে উত্তেজিত করা- আমাদের সংগীতের ব্যবহারে দেখা যায় না। তার বেলায় তুরী ভেরী দামামা শঙ্খ প্রভৃতির সহযোগে একটা তুমূল কোলাহলের ব্যবস্থা। কেননা আমাদের সংগীত জিনিসটাই ভূমার সুর; তার বৈরাগ্য, তার শান্তি, তার গম্ভীরতা সমস্ত সংকীর্ণ উত্তেজনাকে নষ্ট করিয়া দিবার জন্যই। এই একই কারণে হাস্যরস আমাদের সংগীতের আপন জিনিস নয়। কেননা বিকৃতিকে লইয়াই বিদ্রূপ। প্রকৃতির ত্রুটিই এই বিকৃতি, সুতরাং তাহা বৃহতের বিরুদ্ধ। শান্তহাস্য বিশ্বব্যাপী, কিন্তু অট্টহাস্য নহে। সমগ্রের সঙ্গে অসামঞ্জস্যই পরিহাসের ভিত্তি। এইজন্যই আমাদের আধুনিক উত্তেজনার গান কিংবা হাসির গান স্বভাবতই বিলিতি ছাঁদের হইয়া পড়ে।

বিলিতির সঙ্গে এই দিশি গানের ছাঁদের তফতাটা কোন্‌খানে? প্রধান তফাত সেই অতিসূক্ষ্ম সুরগুলি লইয়া যাকে বলে শ্রুতি। এই শ্রুতি আমাদের গানের সূক্ষ্ম স্নায়ুতন্ত্র। ইহারই যোগে এক সুর কেবল যে আর-এক সুরের পাশাপাশি থাকে তা নয়, তাদের মধ্যে নাড়ীর সম্বন্ধ ঘটে। এই নাড়ীর সম্বন্ধ ছিন্ন করিলে রাগরাগিণী যদি-বা টেঁকে, তাদের ছাঁদটা বদল হইয়া যায়। আমাদের হাল ফ্যাশানের কন্সর্টের গৎগুলি তার প্রমাণ। এই গতের সুরগুলি কাটা-কাটা হইয়া নৃত্য করিতে থাকে, কিন্তু তাদের মধ্যে সেই বেদনার সম্বন্ধ থাকে না যা লইয়া আমাদের সংগীতের গভীরতা। এই-সব কাটা সুরগুলিকে লইয়া নানা প্রকারে খেলানো যায়- উত্তেজনা বলো, উল্লাস বলো, পরিহাস বলো, মানুষের বিশেষ বিশেষ হৃদয়াবেগ বলো, নানা ভাবে তাদের ব্যবহার করা যাইতে পারে। কিন্তু যেখানে রাগরাগিণী আপনার সুসম্পূর্ণতার গাম্ভীর্যে নির্বিকারভাবে বিরাজ করিতেছে সেখানে ইহারা লজ্জিত।

স্বর্গলোকের একটা মস্ত সুবিধা কিংবা অসুবিধা আছে, সেখানে সমস্তই সম্পূর্ণ। এইজন্য দেবতারা কেবলই অমৃত পান করিতেছেন, কিন্তু তাঁরা বেকার। মাঝে মাঝে দৈত্যরা উৎপাত না করিলে তাঁদের অমরত্ব তাঁদের পক্ষে বোঝা হইয়া উঠিত। তাঁদের স্বর্গোদ্যানে তাঁরা ফুল তুলিয়া মালা গাঁথিতে পারেন, কিন্তু সেখানে ফুলগাছের একটা চান্‌কাও তাঁরা বদল করিয়া সাজাইতে পারেন না, কেননা সমস্ত সম্পূর্ণ। মর্ত্যলোকে যেখানে অপূর্ণতা সেইখানেই নূতনের সৃষ্টি,

বিশেষের সৃষ্টি, বিচিত্রের সৃষ্টি। আমাদের রাগরাগিণী সেই স্বর্গোদ্যান। ইহা চিরসম্পূর্ণ। এইজন্যই আমাদের রাগরাগিণীর রসটি সাধারণ বিশ্বরস। মেঘমল্লার বিশ্বের বর্ষা, বসন্ত বাহার বিশ্বের বসন্ত। মর্ত্যলোকের দুঃখসুখের অন্তহীন বৈচিত্র্যকে সে আমল দেয় না।

যে-কোনো তেলেনা লইয়া যদি পরীক্ষা করিয়া দেখি তবে দেখিতে পাইব যে, তার সুরগুলিকে কাটা-কাটা রাখিলে একই রাগিণীর দ্বারা নানাপ্রকার হৃদয়ভাবের বর্ণনা হইতে পারে। কিন্তু সুরগুলিকে যদি গড়ানে করিয়া পরস্পরের গায়ে হেলাইয়া গাওয়া যায় তা হইলে হৃদয়ভাবের বিশেষ বৈচিত্র্য লেপিয়া গিয়া রাগিণীর সাধারণ ভাবটা প্রকাশ হইয়া পড়ে।

এটা কেমনতরো? যেমন দেখা গেছে খুড়তত জাঠতত মাসতত পিসতত প্রভৃতি অসংখ্য সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পারিবারিক শ্রুতির বাঁধনে যে ছেলেটি অত্যন্ত ঠাসা হইয়া একেবারে ঠাণ্ডা হইয়া থাকে, সেই ছেলেই বৃহৎ পরিবার হইতে বাহির হইয়া, জাহাজের খালাসিগিরি করিয়া নিঃসম্বলে আমেরিকায় গিয়া, আজ খুবই শক্ত সমর্থ সজীব সতেজ ভাবে ধড়্ফড়্ করিয়া বেড়াইতেছে। আগে সে পরিবারের ঠেলাগাড়িতে পূর্বপুরুষের রাস্তায় বাঁধিবরাদ্দমত হাওয়া খাইত। এখন সে নিজে ঘোড়া হাঁকাইয়া চলে এবং তার রাস্তার সংখ্যা নাই। বাঁধনছেড়া সুরগুলো যে গানকে গড়িয়া তোলে তার খেয়াল নাই সে কোন্ শ্রেণীর, সে এই জানে যে “স্বনামা পুরুষো ধন্যঃ’ ।

শুধুমাত্র রসকে ভোগ করা নয় কিন্তু আপনাকে প্রকাশ করা যখন মানুষের অভিপ্রায় হয়, তখন সে এই বিশেষত্বের বৈচিত্র্যকে ব্যক্ত করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া ওঠে। তখন সে নিজের আশা আকাঙক্ষা হাসি কান্না সমস্তকে বিচিত্র রূপ দিয়া আর্টের অমৃতলোক আপন হাতে সৃষ্টি করিতে থাকে। আত্মপ্রকাশের এই সৃষ্টিই স্বাধীনতা। ঈশ্বরের রচিত এই সংসার অসম্পূর্ণ বলিয়া একদল লোক নালিশ করে। কিন্তু যদি অসম্পূর্ণ না হইত তবে আমাদের অধীনতা চিরন্তন হইত। তা হইলে যা-কিছু আছে তাহাই আমাদরে উপর প্রভুত্ব করিত, আমরা তার উপর একটুও হাত চালাইতে পারিতাম না। অস্তিত্বটা গলার শিকল পায়ের বেড়ি হইত। শাসনতন্ত্র যতই উৎকৃষ্ট হোক, তার মধ্যে শাসিতের আত্মপ্রকাশের কোনো ফাঁকই যদি কোথাও না থাকে, তবে তাহা সোনার দড়িতে চিরউদ্বন্ধন। মহাদেব নারদ এবং ভরতমুনিতে মিলিয়া পরামর্শ করিয়া যদি আমাদের সংগীতকে এমন চূড়ান্ত উৎকর্ষ দিয়া থাকেন যে আমরা তাকে কেবলমাত্র মানিতেই

পারি, সৃষ্টি করিতে না পারি, তবে এই সুসম্পূর্ণতার দ্বারাই সংগীতের প্রধান উদ্দেশ্য নষ্ট হইয়াছে বলিতে হইবে।

চৈতন্যের আবির্ভাবে বাংলাদেশে বৈষ্ণবধর্ম যে হিল্লোল তুলিয়াছিল সে একটা শাস্ত্রছাড়া ব্যাপার। তাহাতে মানুষের মুক্তি-পাওয়া চিত্ত ভক্তিরসের আবেগে আত্মপ্রকাশ করিতে ব্যাকুল হইল। সেই অবস্থায় মানুষ কেবল স্থাবরভাবে ভোগ করে না, সচলভাবে সৃষ্টি করে। এইজন্য সেদিন কাব্যে ও সংগীতে বাঙালি আত্মপ্রকাশ করিতে বসিল। তখন পয়ার ত্রিপদীর বাঁধা ছন্দে প্রচলিত বাঁধা কাহিনী পুনঃপুনঃ আবৃত্তি করা আর চলিল না। বাঁধন ভাঙিল– সেই বাঁধন [ভাঙা] বস্তুত প্রলয় নহে, তাহা সৃষ্টির উদ্যম। আকাশে নীহারিকার যে ব্যাপকতা তার একটা অপরূপ মহিমা আছে। কিন্তু সৃষ্টির অভিব্যক্তি এই ব্যাপকতায় নহে। প্রত্যেক তারা আপনাতে আপনি স্বতন্ত্র হইয়া নক্ষত্রলোকের বিরাট ঐক্যকে যখন বিচিত্র করিয়া তোলে, তখন তাহাতেই সৃষ্টির পরিণতি। বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণবকাব্যেই সেই বৈচিত্র্য চেষ্টা প্রথম দেখিতে পাই। সাহিত্যে এইরূপ স্বাতন্ত্র্যের উদ্যমকেই ইংরেজিতে রোম্যান্টিক মুভ্‌মেণ্ট্‌ বলে।

এই স্বাতন্ত্র্য চেষ্টা কেবল কাব্যছন্দের মধ্যে নয়, সংগীতেও দেখা দিল। সেই উদ্যমের মুখে কালোয়াতি গান আর টিঁকিল না। তখন সংগীত এমন-সকল সুর খুঁজিতে লাগিল যাহা হৃদয়াবেগের বিশেষত্বগুলিকে প্রকাশ করে, রাগরাগিণীর সাধারণ রূপগুলিকে নয়। তাই সেদিন বৈষ্ণবধর্ম শাস্ত্রিক পণ্ডিতের কাছে যেমন অবজ্ঞা পাইয়াছিল, ওস্তাদির কাছে কীর্তন গানের তেমনই অনাদর ঘটিয়াছে।

আজ নূতন যুগের সোনার কাঠি আমাদের অলস মনকে ছুঁইয়াছে। কেবল ভোগে আর আমাদের তৃপ্তি নাই, আমাদের আত্মপ্রকাশ চাই। সাহিত্যে তার পরিচয় পাইতেছি। আমাদের নূতন-জাগরূক চিত্রকলাও পুরাতন রীতির আবরণ কাটিয়া আত্মপ্রকাশের বৈচিত্র্যের দিকে উদ্যত। অর্থাৎ, স্পষ্টই দেখিতেছি আমারা পৌরাণিক যুগের বেড়ার বাহিরে আসিলাম। আমাদের সামনে এখন জীবনের বিচিত্র পথ উদ্‌ঘাটিত। নূতন নূতন উদ্‌ভাবনের মুখে আমরা চলিব। আমাদের সাহিত্য বিজ্ঞান দর্শন চিত্রকলা সবই আজ অচলতার বাঁধন হইতে ছাড়া পাইয়াছে। এখন আমাদের সংগীতও যদি এই বিশ্বযাত্রার তালে তাল রাখিয়া না চলে তবে ওর আর উদ্ধার নাই।

হয়তো সেও চলিতে শুরু করিয়াছে। কিছুদূর না এগোলে তার হিসাব পাওয়া যাইবে না। এক দিক হইতে দেখিলে মনে হয় যেন গানের আদর দেশ হইতে চলিয়া গেছে। ছেলেবেলায় কলিকাতায় গাহিয়ে-বাজিয়ের ভিড় দেখিয়াছি; এখন একটি খুঁজিয়া মেলা ভার, ওস্তাদ যদি-বা জোটে শ্রোতা জোটানো আরও কঠিন। কালোয়াতি বৈঠকে শেষ পর্যন্ত সবল অবস্থায় টিঁকিতে পারে এমন ধৈর্য ও বীর্য এ কালে দুর্লভ। এটা আক্ষেপের বিষয়। কিন্তু সময়ের সঙ্গে মিল না রাখিতে পারিলে বড়ো বড়ো মজবুত জিনিসও ভাঙিয়া পড়ে। এমন-কি হালকা জিনিস শীঘ্র ভাঙে না, ভাঙিবার বেলায় বড়ো জিনিসই ভাঙে। তাই আমাদের দেশের প্রাচীন স্থাপত্যের পরিচয় ভগ্নাবশেষে। অন্তত তার ধারা আর সচল নাই। অথচ কুঁড়েঘর আগে যেমন করিয়া তৈরি হইত এখনো তেমনি করিয়া হয়। কেননা, প্রাচীন স্থাপত্য যে-সকল রাজা ও ধনীর বিশেষ প্রয়োজনকে আশ্রয় করিয়াছিল তারাও নাই, সেই অবস্থারও বদল হইয়াছে। কিন্তু দেশের যে জীবনযাত্রা কুঁড়েঘরকে অবলম্বন করে তার কোনো বদল হয় নাই।

আমাদের সংগীতও রাজসভা সম্রাট্‌সভায় পোষ্যপুত্রের মতো আদরে বাড়িতেছিল। সে-সব সভা গেছে, সেই প্রচুর অবকাশও নাই, তাই সংগীতের সেই যত্ন আদর সেই হৃষ্টপুষ্টতা গেছে। কিন্তু গ্রাম্যসংগীত, বাউলের গান, এ-সবের মার নাই। কেননা, ইহারা যে রসে লালিত সেই জীবনের ধারা চিরদিনই চলিতেছে। আসল কথা, প্রাণের সঙ্গে যোগ না থাকিলে বড়ো শিল্পও টিঁকিতে পারে না।

কিন্তু আমাদের দেশের বর্তমান কালের জীবন কেবল গ্রাম্য নহে। তার উপরেও আর-একটা বৃহৎ লোকস্তর জমিয়া উঠিতেছে যার সঙ্গে বিশ্বপৃথিবীর যোগ ঘটিল। চিরাগত প্রথায় খোপখাপের মধ্যে সেই আধুনিক চিত্তকে আর কুলায় না। তাহা নূতন নূতন উপলব্ধির পথ দিয়া চলিতেছে। আর্টের যে-সকল আদর্শ স্থাবর, তার সঙ্গে এর গতির যোগ রহিল না, বিচ্ছেদ বাড়িতে লাগিল। এখন আমরা দুই যুগের সন্ধিস্থলে। আমাদের জীবনের গতি যে দিকে, জীবনের নীতি সম্পূর্ণ সে দিকের মতো হয় নাই। দুটোতে ঠোকাঠুকি চলিতেছে। কিন্তু যেটা সচল তারই জিৎ হইবে।

এই-যে আমাদের নূতন জীবনের চাঞ্চল্য, গানের মধ্যে ইহার কিছু-কিছু লক্ষণ দেখা দিয়াছে। তাই এক দিকে গানবাজনার ‘পরে অনাদরও যেমন লক্ষ্য করা যায়, আর-এক দিকে

তেমনি আদরও দেখিতেছি। আজকাল ঘরে ঘরে হারমোনিয়ম, গ্রামোফোন, পাড়ায় পাড়ায় কন্সর্ট। ইহাতে অনেকটা রুচিবিকার দেখা যায়। কিন্তু চিনি জ্বাল দিবার গোড়ার বলকে রসে অনেকটা পরিমাণ গাদ ভাসিয়া ওঠে। সেই গাদ কাটিতে কাটিতেই রস ক্রমে গাঢ় ও নির্মল হইয়া আসে। আজ টগ্‌বগ শব্দে সংগীতের সেই গাদ ফুটিতেছে; পাড়ায় টেঁকা দায়। কিন্তু সেটা লইয়া উদ্‌বিগ্ন হইবার দরকার নাই। সুখবরটা এই যে, চিনির জ্বাল চড়ানো হইয়াছে।

গানবাজনার সম্বন্ধে কালের যে বদল হইয়াছে তার প্রধান লক্ষণ এই যে, আগে যেখানে সংগীত ছিল রাজা, এখন সেখানে গান হইয়াছে সর্দার। অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ গান শুনিবার জন্যই এখনকার লোকের আগ্রহ, রাগরাগিণীর জন্য নয়। সেই-সকল বিশেষ গানের জন্যই গ্রামোফোনের কাট্‌তি। যুবক মহলে গায়কের আদর সে গান জানে বলিয়া, সে ওস্তাদ বলিয়া নয়।

পূর্বে ছিল দস্তুরের-মই-দিয়া-সমতল-করা চষা জমি। এখন তাহা ফুঁড়িয়া নানাবিধ গানের অঙ্কুর দেখা দিতেছে। ওস্তাদের ইচ্ছা ইহাদের উপর দিয়া দস্তুরের মই চালায়। কেননা যার প্রাণ আছে তার নানান খেয়াল, দস্তুর বুড়োটা নবীন প্রাণের খেয়াল সহিতে পারে না। শাসনকেই সে বড়ো বলিয়া জানে, প্রাণকে নয়।

কিন্তু সরস্বতীকে শিকল পরাইলে চলিবে না, সে শিকল তাঁরই নিজের বীণার তারে তৈরি হইলেও নয়। কেননা মনের বেগই সংসারে সব চেয়ে বড়ো বেগ। তাকে ইন্‌টার্‌ন্ করিয়া যদি সলিটরি সেলের দেয়ালে বেড়িয়া রাখা যায় তবে তাহাতে নিষ্ঠুরতার পরাকাষ্ঠা হইবে। সংসারে কেবলমাত্র মাঝারির রাজত্বেই এমন-সকল নিদারুণতা সম্ভবপর হয়। যারা বড়ো, যারা ভূমাকে মানে, তারা সৃষ্টি করিতেই চায়, দমন করিতে চায় না। এই সৃষ্টির ঝঞ্ঝাট বিস্তর, তার বিপদও কম নয়। বড়ো যারা তারা সেই দায় স্বীকার করিয়াও মানুষকে মুক্তি দিতে চায়, তারা জানে মানুষের পক্ষে সব চেয়ে ভয়ংকর– মাঝারির শাসন। এই শাসনে যা-কিছু সবুজ তা হলদে হইয়া যায়, যা-কিছু সজীব তা কাঠ হইয়া ওঠে।

এইবার এই বর্তমান আনাড়ি লোকটার অপথযাত্রার ভ্রমণবৃত্তান্ত দুই-একটা কথায় বলিয়া লই। কেননা, গান সম্বন্ধে আমি যেটুকু সঞ্চয় করিয়াছি তা ঐ অঞ্চল হইতেই। সাহিত্যে লক্ষ্মীছাড়ার দলে ভিড়িয়াছিলাম খুব অল্প বয়সেই। তখন ভদ্র গৃহস্থের কাছে অনেক তাড়া

খাইয়াছি। সংগীতেও আমার ব্যবহারে শিষ্টতা ছিল না। তবু সে মহল হইতে পিঠের উপর বাড়ি যে কম পড়িয়াছে তার কারণ এখনকার কালে সে দিকটার দেউড়িতে লোকবল বড়ো নাই।

তবু যত দৌরাত্ম্যই করি-না কেন, রাগরাগিণীর এলাকা একেবারে পার হইতে পারি নাই। দেখিলাম তাদের খাঁচাটা এড়ানো চলে, কিন্তু বাসাটা তাদেরই বজায় থাকে। আমার বিশ্বাস এই রকমটাই চলিবে। কেননা, আর্টের পায়ের বেড়িটাই দোষের, কিন্তু তার চলার বাঁধা পথটায় তাকে বাঁধে না।

আমার বোধ হয় য়ুরোপীয় সংগীত-রচনাতেও সুরগুলি রচয়িতার মনে এক-একটা দল বাঁধিয়া দেখা দেয়। এক-একটি গাছ কতকগুলি জীবকোষের সমবায়। প্রত্যেক কোষ অনেকগুলি পরমাণুর সম্মিলন। কিন্তু পরমাণু দিয়া গাছের বিচার হয় না, কেননা তারা বিশ্বের সামগ্রী- এই কোষগুলিই গাছের।

তেমনি রসের জৈব-রসায়নে কয়েকটি সুর বিশেষভাবে মিলিত হইলে তারাই গানের জীবকোষ হইয়া ওঠে। এই-সব দানাবাঁধা সুরগুলিকে নানা আকারে সাজাইয়া রচয়িতা গান বাঁধেন। তাই য়ুরোপীয় গান শুনিতে শুনিতে যখন অভ্যাস হইয়া আসে তখন তার স্বরসংস্থানের কোষ-গঠনের চেহারাটা দেখিতে পাওয়া সহজ হয়। এই স্বরসংস্থানটা রূঢ়ী নয়, ইহা যৌগিক। তবেই দেখা যাইতেছে সকল দেশের গানেই আপনিই কতকগুলি সুরের ঠাঁট তৈরি হইয়া ওঠে। সেই ঠাটগুলিকে লইয়াই গান তৈরি করিতে হয়।

এই ঠাঁটগুলির আয়তনের উপরই গান-রচয়িতার স্বাধীনতা নির্ভর করে। রাজমিস্ত্রি ইঁট সাজাইয়া ইমারত তৈরি করে। কিন্তু তার হাতে ইঁট না দিয়া যদি এক-একটা আস্ত তৈরি দেয়াল কিংবা মহল দেওয়া যাইত তবে ইমারত গড়ায় তার নিজের বাহাদুরি তেমন বেশি থাকিত না। সুরের ঠাঁটগুলি ইঁটের মতো হইলেই তাদের দিয়া ব্যক্তিগত বিশেষত্ব প্রকাশ করা যায়, দেয়াল কিংবা আস্ত মহলের মতো হইলে তাদের দিয়া জাতিগত সাধারণতাই প্রকাশ করা যায়। আমাদের দেশের গানের ঠাঁট এক-একটা বড়ো বড়ো ফালি, তাকেই বলি রাগিণী।

আজ সেই ফালিগুলাকে ভাঙিয়া-চুরিয়া সেই উপকরণে নিজের ইচ্ছামত কোঠা গড়িবার চেষ্টা চলিতেছে। কিন্তু টুকরাগুলি যতই টুকরা হোক, তাদের মধ্যে সেই আস্ত জিনিসটার একটা

ব্যঞ্জনা আছে। তাদের জুড়িতে গেলে সেই আদিম আদর্শ আপনিই অনেকখানি আসিয়া পড়ে। এই আদর্শকে সম্পূর্ণ কাটাইয়া স্বাধীন হইতে পারি না। কিন্তু স্বাধীনতার ‘পরে যদি লক্ষ থাকে, তবে এই বাঁধন আমাদিগকে বাধা দিতে পারিবে না। সকল আর্টেই প্রকাশের উপকরণমাত্রই এক দিকে উপায় আর-এক দিকে বিঘ্ন। সেই-সব বিঘ্নকে বাঁচাইয়া চলিতে গিয়া, কখনো তার সঙ্গে লড়াই কখনো-বা আপস করিতে করিতে আর্ট বিশেষভাবে শক্তি ও নৈপুণ্য ও সৌন্দর্য লাভ করে। যে উপকরণ আমাদের জুটিয়াছে তার অসম্পূর্ণতাকেও খাটাইয়া লইতে হইবে, সেও কাজে লাগিবে।

আমাদের গানের ভাষারূপে এই রাগরাগিণীর টুকরাগুলিকে পাইয়াছি। সুতরাং যেভাবেই গান রচনা করি এই রাগরাগিণীর রসটি তার সঙ্গে মিলিয়া থাকিবেই। আমাদের রাগিণীর সেই সাধারণ বিশেষত্বটি কেমন? যেমন আমাদের বাংলাদেশের খোলা আকাশ। এই অবারিত আকাশ আমাদের নদীর সঙ্গে, প্রান্তরের সঙ্গে, তরুচ্ছায়ানিভৃত গ্রামগুলির সঙ্গে নিয়ত লাগিয়া থাকিয়া তাদের সকলকেই বিশেষ একটি ঔদার্য দান করিতেছে। যে দেশে পাহাড়গুলো উঁচু হইয়া আকাশের মধ্যে বাঁধ বাঁধিয়াছে, সেখানে পার্বতী প্রকৃতির ভাবখানা আমাদের প্রান্তরবাসিনীর সঙ্গে স্বতন্ত্র। তেমনি আমাদের দেশের গান যেমন করিয়াই তৈরি হোক-না কেন, রাগরাগিণী সেই সর্বব্যাপী আকাশের মতো তাহাকে একটি বিশেষ নিত্যরস দান করিতে থাকিবে।

একবার যদি আমাদের বাউলের সুরগুলি আলোচনা করিয়া দেখি তবে দেখিতে পাইব যে, তাহাতে আমাদের সংগীতের মূল আদর্শটাও বজায় আছে, অথচ সেই সুরগুলা স্বাধীন। ক্ষণে ক্ষণে এ রাগিণী, ও রাগিণীর আভাস পাই, কিন্তু ধরিতে পারা যায় না। অনেক কীর্তন ও বাউলের সুর বৈঠকী গানের একেবারে গা ঘেঁষিয়া গিয়াও তাহাকে স্পর্শ করে না। ওস্তাদের আইন অনুসারে এটা অপরাধ। কিন্তু বাউলের সুর যে একঘরে, রাগরাগিণী যতই চোখ রাঙাক সে কিসের কেয়ার করে! এই সুরগুলিকে কোনো রাগকৌলীন্যের জাতের কোঠায় ফেলা যায় না বটে, তবু এদের জাতির পরিচয় সম্বন্ধে ভুল হয় না– স্পষ্ট বোঝা যায় এ আমাদের দেশেরই সুর, বিলিতি সুর নয়।

এমনি করিয়া আমাদের আধুনিক সুরগুলি স্বতন্ত্র হইয়া উঠিবে বটে, কিন্তু তবুও তারা একটা বড়ো আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইবে না। তাদের জাত যাইবে বটে, কিন্তু জাতি যাইবে না। তারা সচল হইবে, তাদের সাহস বাড়িবে, নানারকম সংযোগের দ্বারা তাদের মধ্যে নানাপ্রকার শক্তি ও সৌন্দর্য ফুটিয়া উঠিবে।

একটা উপমা দিলে কথাটা স্পষ্ট হইবে। আমাদের দেশের বিপুলায়ত পরিবারগুলি আজকাল আর্থিক ও অন্যান্য কারণে ভাঙিয়া ভাঙিয়া পড়িতেছে। সেই টুক্‌রা পরিবারের মানুষগুলির মধ্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য স্বভাবতই বাড়িয়াছে। তবু সেই পারিবারিক ঘনিষ্ঠতার ভাবটা আমাদের মন হইতে যায় না। এমন-কি, বাহিরের লোকের সঙ্গে ব্যবহারেও এটা ফুটিয়া ওঠে। এইটেই আমাদের বিশেষত্ব। এই বিশেষত্ব লইয়া ঠিকমত ব্যবহার করিতে পারিলে আমাদের জীবনটা টিকটিকির কাটা লেজের মতো কিংবা কন্সর্টের তারস্বর গৎগুলোর মতো নীরস খাপছাড়া হইবে না, তাহা চারি দিকের সঙ্গে সুসংগত হইবে। তাহা নিজের একটি বিশেষ রসও রাখিবে, অথচ স্বাতন্ত্র্যের শক্তিও লাভ করিবে।

একটা প্রশ্ন এখনো আমাদের মনে রহিয়া গেছে, তার উত্তর দিতে হইবে। য়ুরোপীয় সংগীতে যে হার্মনি অর্থাৎ স্বরসংগতি আছে, আমাদের সংগীতে তাহা চলিবে কিনা। প্রথম ধাক্কাতেই মনে হয়– “না, ওটা আমাদের গানে চলিবে না, ওটা য়ুরোপীয়।’ কিন্তু হার্মনি য়ুরোপীয় সংগীতে ব্যবহার হয় বলিয়াই যদি তাকে একান্তভাবে য়ুরোপীয় বলিতে হয় তবে এ কথাও বলিতে হয় যে, যে দেহতত্ত্ব অনুসারে য়ুরোপে অস্ত্রচিকিৎসা চলে সেটা য়ুরোপীয়, অতএব বাঙালির দেহে ওটা চালাইতে গেলে ভুল হইবে। হার্মনি যদি দেশবিশেষের সংস্কারগত কৃত্রিম সৃষ্টি হইত তবে তো কথাই ছিল না। কিন্তু যেহেতু এটা সত্যবস্তু, ইহার সম্বন্ধে দেশকালের নিষেধ নাই। ইহার অভাবে আমাদের সংগীতে যে অসম্পূর্ণতা সেটা যদি অস্বীকার করি, তবে তাহাতে কেবলমাত্র কণ্ঠের জোর বা দম্ভের জোর প্রকাশ পাইবে।

তবে কিনা ইহাও নিশ্চিত যে, আমাদের গানে হার্মনি ব্যবহার করিতে হইলে তার ছাঁদ স্বতন্ত্র হইবে। অন্তত মূল সুরকে সে যদি ঠেলিয়া চলিতে চায় তবে সেটা তার পক্ষে আস্পর্ধা হইবে। আমাদের দেশে ঐ বড়ো সুরটা চিরদিন ফাঁকায় থাকিয়া চারি দিকে খুব করিয়া ডালপালা মেলিয়াছে। তার সেই স্বভাবকে ক্লিষ্ট করিলে তাকে মারা হইবে। শীতদেশের মতো অত্যন্ত ঘন

ভিড় আমাদের ধাতে সয় না। অতএব আমাদের গানের পিছনে যদি স্বরানুচর নিযুক্ত থাকে, তবে দেখিতে হইবে তারা যেন পদে পদে আলো হাওয়া না আটকায়।

বসিয়া যে থাকে তার সাজসজ্জা প্রচুর ভারী হইলেও চলে, কিন্তু চলাফেরা করিতে হইলে বোঝা হাল্কা করা চাই। লোকসান না করিয়া হাল্কা করিবার ভালো উপায়– বোঝাটাকে ভাগ করিয়া দেওয়া। আমাদের গানের বিপুল তানকর্তব ঐ হার্মনিবিভাগে চালান করিয়া দিলে মূল গানটার সহজ স্বরূপ ও গাম্ভীর্য রক্ষা পায়, অথচ তার গতিপথ খোলা থাকে। এক হাতে রাজদণ্ড, অন্য হাতে রাজছত্র,কাঁধে জয়ধ্বজা এবং মাথায় সিংহাসন বহিয়া রাজাকে যদি চলিতে হয় তবে তাহাতে বাহাদুরি প্রকাশ পায় বটে, কিন্তু তার চেয়ে শোভন ও সুসংগত হয় যদি এই আসবাবগুলি নানা স্থানে ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। তাতে সমারোহ বাড়ে বৈ কমে না। আমাদের গানের যদি অনুচর বরাদ্দ হয়, তবে সংগীতের অনেক ভারী ভারী মালপত্র ওইদিকে চালান করিয়া দিতে পারি। যাই হোক, আমাদের সংগীতের পক্ষে এই একটা বড়ো মহল ফাঁকা আছে, এটা যদি দখল করিতে পারি তবে এই দিকে অনেক পরীক্ষা ও উদ্‌ভাবনার জায়গা পাইব। যৌবনের স্বভাবসিদ্ধ সাহস যাঁদের আছে এবং লক্ষ্মীছাড়ার ক্ষ্যাপা হাওয়া যাঁদের গায়ে লাগিল, এই একটি আবিষ্কারের দুর্গমক্ষেত্র তাঁদের সামনে পড়িয়া। আজ হোক কাল হোক, এ ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই লোক নামিবে।

সংগীতের একটা প্রধান অঙ্গ তাল। আমাদের আসরে সব চেয়ে বড়ো দাঙ্গা এই তাল লইয়া। গানবাজনার ঘোড়দৌড়ে গান জেতে কি তাল জেতে এই লইয়া বিষম মাতামাতি। দেবতা যখন সজাগ না থাকেন তখন অপদেবতার উৎপাত এমনি করিয়াই বাড়িয়া ওঠে। স্বয়ং সংগীত যখন পরবশ তখন তাল বলে “আমাকে দেখো’ সুর বলে “আমাকে’। কেননা, দুই ওস্তাদে দুই বিভাগ দখল করিয়াছে– দুই মধ্যস্থের মধ্যে ঠেলাঠেলি– কর্তৃত্বের আসন কে পায়– মাঝে হইতে সংগীতের মধ্যে আত্মবিরোধ ঘটে।

তাল জিনিসটা সংগীতের হিসাব-বিভাগ। এর দরকার খুবই বেশি সে কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু দরকারের চেয়েও কড়াক্কড়িটা যখন বড়ো হয় তখন দরকারটাই মাটি হইতে থাকে। তবু আমাদের দেশে এই বাধাটাকে অত্যন্ত বড়ো করিতে হইয়াছে, কেননা মাঝারির হাতে কর্তৃত্ব। গান সম্বন্ধে ওস্তাদ অত্যন্ত বেশি ছাড়া পাইয়াছে, এইজন্য সঙ্গে সঙ্গে আর-এক ওস্তাদ যদি

তাকে ঠেকাইয়া না চলে তবে তো সে নাস্তানাবুদ করিতে পারে। কর্তা যেখানে নিজের কাজের ভার নিজেই লন সেখানে হিসাব খুব বেশি কড়া হয় না। কিন্তু নায়েব যেখানে তাঁর হইয়া কাজ করে সেখানে কানাকড়িটার চুলচেরা হিসাব দাখিল করিতে হয়। সেখানে কনট্রোলার আপিস কেবলই খিটিখিটি করে এবং কাজ চালাইবার আপিস বেজার হইয়া ওঠে।

য়ুরোপীয় গানে স্বয়ং রচয়িতার ইচ্ছামত মাঝে মাঝে তালে ঢিল পড়ে এবং প্রত্যেকবারেই সমের কাছে গানকে আপন তালের হিসাব-নিকাশ করিয়া হাঁফ ছাড়িতে হয় না। কেননা, সমস্ত সংগীতের প্রয়োজন বুঝিয়া রচয়িতা নিজে তার সীমানা বাঁধিয়া দেন, কোনো মধ্যস্থ আসিয়া রাতারাতি সেটাকে বদল করিতে পারে না। ইহাতেই সুরে তালে রেষারেষি বন্ধ হইয়া যায়। য়ুরোপীয় সংগীতে তালের বোলটা মৃদঙ্গের মধ্যে নাই, তা হার্মনি-বিভাগে গানের অন্তরঙ্গরূপেই একাসনে বিরাজ করে। লাঠিয়ালের হাতে রাজদণ্ড দিলেও সে তাহা লইয়া লাঠিয়ালি করিতে চায়, কেননা রাজত্ব করা তার প্রকৃতিগত নয়। তাই ওস্তাদের হাতে সংগীত সুরতালের কৌশল হইয়া উঠে। এই কৌশলই কলার শত্রু। কেননা কলার বিকাশ সামঞ্জস্যে, কৌশলের বিকাশ দ্বন্দ্বে।

অনেক দিন হইতেই কবিতা লিখিতেছি, এইজন্য, যতই বিনয় করি-না কেন, এটুকু না বলিয়া পারি না যে– ছন্দের তত্ত্ব কিছু-কিছু বুঝি। সেই ছন্দের বোধ লইয়া যখন গান লিখিতে বসিলাম, তখন চাঁদ সদাগরের উপর মনসার যেরকম আক্রোশ, আমার রচনার উপর তালের দেবতা তেমনি ফোঁস করিয়া উঠিলেন। আমার জানা ছিল ছন্দের মধ্যে যে নিয়ম আছে তাহা বিধাতার গড়া নিয়ম তা কামারের গড়া নিগড় নয়। সুতরাং তা সংযমে সংকীর্ণ করে না, তাহাতে বৈচিত্র্যকে উদ্‌ঘাটিত করিতে থাকে। সে কথা মনে রাখিয়া বাংলা কাব্যে ছন্দকে বিচিত্র করিতে সংকোচ বোধ করি নাই।

কাব্যে ছন্দের যে কাজ, গানে তালের সেই কাজ। অতএব ছন্দ যে নিয়মে কবিতায় চলে তাল সেই নিয়মে গানে চলিবে এই ভরসা করিয়া গান বাঁধিতে চাহিলাম। তাহাতে কী উৎপাত ঘটিল একটা দৃষ্টান্ত দিই। মনে করা যাক আমার গানের কথাটি এই–

কাঁপিছে দেহলতা থরথর,
চোখের জলে আঁখি ভরভর।

দোদুল তমালেরই বনছায়া
তোমার নীলবাসে নিল কায়া- -
বাদল-নিশীথেরই ঝরঝর
তোমার আঁখি-'পরে ভরভর।
যে কথা ছিল তব মনে মনে
চমকে অধরের কোণে কোণে।
নীরব হিয়া তব দিল ভরি
কী মায়া-স্বপনে যে, মরি মরি,
নিবিড় কাননের মরমর
বাদল-নিশীথের ঝরঝর।

এ ছন্দে আমার পাঠকেরা কিছু আপত্তি করিলেন না। তাই সাহস করিয়া ঐটেই ঐ ছন্দেই সুরে গাহিলাম। তখন দেখি যাঁরা কাব্যের বৈঠকে দিব্য খুশি ছিলেন তাঁরাই গানের বৈঠকে রক্তচক্ষু। তাঁরা বলেন– এ ছন্দের এক অংশে সাত আর-এক অংশে চার, ইহাতে কিছুতেই তাল মেলে না। আমার জবাব এই– তাল যদি না মেলে সেটা তালেরই দোষ, ছন্দটাতে দোষ হয় নাই। কেন, তাহা বলি। এই ছন্দ তিন এবং চার মাত্রার যোগে তৈরি এইজন্যই “তোমার নীলবাসে’ এই সাত মাত্রার পর “নিল কায়া’ এই চার মাত্রা খাপ খাইল। তিন মাত্রা হইলেও ক্ষতি হইত না, যেমন– “তোমার নীলবাসে মিলিল’। কিন্তু ইহার মধ্যে ছয় মাত্রা কিছুতেই সহিবে না। যেমন “তোমারি নীলবাসে ধরিল শরীর’। অথচ প্রথম অংশে যদি ছয়ের ভাগ থাকিত তবে দিব্য চলিত, যেমন– “তোমার সুনীল বাসে ধরিল শরীর’। এ আমি বলিতেছি কানের স্বাভাবিক রুচির কথা। এই কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিবার পথ। অতএব, এই কানের কাছে যদি ছাড় মেলে তবে ওস্তাদকে কেন ডরাইব?

আমার দৃষ্টান্তগত ছন্দটিতে প্রত্যেক লাইনেই সবসুদ্ধ ১১ মাত্রা আছে। কিন্তু এমন ছন্দ হইতে পারে যার প্রত্যেক লাইনে সমান মাত্রা-বিভাগ নাই। যেমন–

বাজিবে, সখি, বাঁশি বাজিবে।
হৃদয়রাজ হৃদে রাজিবে।
বচন রাশি রাশি কোথা যে যাবে ভাসি,

অধরে লাজহাসি সাজিবে।
নয়নে আঁখিজল করিবে ছলছল,
সুখবেদনা মনে বাজিবে।
মরমে মূরছিয়া মিলাতে চাবে হিয়া
সেই চরণযুগরাজীবে।

ইহার প্রথম দুই লাইনে মাত্রাভাগ- ৩+৪+৩ = ১০। তৃতীয় লাইনে- ৩+৪+৩+৪ = ১৪। আমার মতে এই বৈচিত্র্যে ছন্দের মিষ্টতা বাড়ে। অতএব উৎসাহ করিয়া গান ধরিলাম। কিন্তু এক ফের ফিরিতেই তালওয়ালা পথ আটক করিয়া বসিল। সে বলিল, “আমার সমের মাশুল চুকাইয়া দাও।’ আমি তো বলি এটা বে-আইনি আবোয়াব। কান-মহারাজার উচ্চ আদালতে দরবার করিয়া খালাস পাই। কিন্তু সেই দরবারের বাহিরে খাড়া আছে মাঝারি শাসনতন্ত্রের দারোগা। সে খপ্ করিয়া হাত চাপিয়া ধরে, নিজের বিশেষ বিধি খাটায়, রাজার দোহাই মানে না।

কবিতায় যেট ছন্দ, সংগীতে সেইটেই লয়। এই লয় জিনিসটি সৃষ্টি ব্যাপিয়া আছে, আকাশের তারা হইতে পতঙ্গের পাখা পর্যন্ত সমস্তই ইহাকে মানে বলিয়াই বিশ্বসংসার এমন করিয়া চলিতেছে অথচ ভাঙিয়া পড়িতেছে না। অতএব কাব্যেই কী, গানেই কী, এই লয়কে যদি মানি তবে তালের সঙ্গে বিবাদ ঘটিলেও ভয় করিবার প্রয়োজন নাই।

একটি দৃষ্টান্ত দিই-

ব্যাকুল বকুলের ফুলে
ভ্রমর মরে পথ ভুলে।
আকাশে কী গোপন বাণী
বাতাসে করে কানাকানি,
বনের অঞ্চলখানি
পুলকে উঠে দুলে দুলে।
বেদনা সুমধুর হয়ে
ভুবনে গেল আজি বয়ে।

বাঁশিতে মায়াতন পুরি
কে আজি মন করে চুরি,
নিখিল তাই মরে ঘুরি
বিরহসাগরের কূলে।

এটা যে কী তাল তা আমি আনাড়ি জানি না। এবং কোনো ওস্তাদও জানেন না। গনিয়া দেখিলে দেখি প্রত্যেক লাইনে নয় মাত্রা। যদি এমন বলা যায় যে, নাহয় নয় মাত্রায় একটা নূতন তালের সৃষ্টি করা যাক, তবে আর-একটা নয় মাত্রার গান পরীক্ষা করিয়া দেখা যাক–

যে কাঁদনে হিয়া কাঁদিছে
সে কাঁদনে সেও কাঁদিল।
যে বাঁধনে মোরে বাঁধিছে
সে বাঁধনে তারে বাঁধিল।
পথে পথে তারে খুঁজিনু,
মনে মনে তারে পূজিনু,
সে পূজার মাঝে লুকায়ে
আমারেও সে যে সাধিল।
এসেছিল মন হরিতে
মহাপারাবার পারায়ে।
ফিরিল না আর তরীতে,
আপনারে গেল হারায়ে।
তারি আপনার মাধুরী
আপনারে করে চাতুরী–
ধরিবে কি ধরা দিবে সে
কী ভাবিয়া ফাঁদ ফাঁদিল।

এও নয় মাত্রা, কিন্তু এর ছন্দ আলাদা। প্রথমটার লয় ছিল তিনে ছয়ে, দ্বিতীয়টার লয় ছয়ে তিনে। আরো একটা নয়ের তাল দেখা যাক–

আঁধার রজনী পোহালো,
জগৎ পুরিল পুলকে–
বিমল প্রভাতকিরণে
মিলিল দ্যুলোকে ভূলোকে।

নয় মাত্রা বটে, কিন্তু এ ছন্দ স্বতন্ত্র। ইহার লয় তিন তিনে। ইহাকে কোন্ নাম দিবে? আরো একটা দেখা যাক–

দুয়ার মম পথপাশে,
সদাই তারে খুলে রাখি।
কখন্ তার রথ আসে
ব্যাকুল হয়ে জাগে আঁখি।
শ্রাবণ শুনি দূর মেঘে
লাগায় গুরু গরগর,
ফাগুন শুনি বায়ুবেগে
জাগায় মৃদু মরমর–
আমার বুকে উঠে জেগে
চমক তারি থাকি থাকি।
কখন্ তার রথ আসে
ব্যাকুল হয়ে জাগে আঁখি।
সবাই দেখি যায় চ'লে
পিছন-পানে নাহি চেয়ে
উতল রোলে কল্লোলে
পথের গান গেয়ে গেয়ে।
শরৎ-মেঘ ভেসে ভেসে
উধাও হয়ে যায় দূরে
যেথায় সব পথ মেশে
গোপন কোন্ সুরপুরে–

স্বপন ওড়ে কোন্ দেশে
উদাস মোর প্রাণপাখি।
কখন্ তার রথ আসে
ব্যাকুল হয়ে জাগে আঁখি।

এও তো আর-এক ছন্দ। ইহার লয় পাঁচে চারে মিলিয়া। আবার এইটেকে উলটাইয়া দিয়া চারে পাঁচে করিলে ন'য়ের ছন্দকে লইয়া নয়-ছয় করা যাইতে পারে। চৌতাল তো বারো মাত্রার ছন্দ। কিন্তু এই বারো মাত্রা রক্ষা করিলেও চৌতালকে রক্ষা করা যায় না এমন হয়। এই তো বারো মাত্রা–

বনের পথে পথে বাজিছে বায়ে
নূপুর রুনুরুনু কাহার পায়ে।
কাটিয়া যায় বেলা মনের ভুলে,
বাতাস উদাসিছে আকুল চুলে–
ভ্রমরমুখরিত বকুল-ছায়ে
নূপুর রুনুরুনু কাহার পায়ে!

ইহা চৌতালও নহে, একতালও নহে, ধামারও নয় ঝাঁপতালও নয়। লয়ের হিসাব দিলেও, তালের হিসাব মেলে না। তালওয়ালা সেই গরমিল লইয়া কবিকে দায়িক করে।

কিন্তু হাল আমলে এ-সমস্ত উৎপাত চলিবে না। আমরা শাসন মানিব, তাই বলিয়া অত্যাচার মানিব না। কেননা, যে নিয়ম সত্য সে নিয়ম বাহিরের জিনিস নয়, তাহা বিশ্বের বলিয়াই তাহা আমার আপনার। যে নিয়ম-ওস্তাদের তাহা আমার ভিতরে নাই, বাহিরে আছে, সুতরাং তাকে অভ্যাস করিয়া বা ভয় করিয়া বা দায়ে পড়িয়া মানিতে হয়। এইরূপ মানার দ্বারাই শক্তির বিকাশ বন্ধ হইয়া যায়। আমাদের সংগীতকে এই মানা হইতে মুক্তি দিলে তবেই তার স্বভাব তার স্বরূপকে নব নব উদ্‌ভাবনার ভিতর দিয়া ব্যক্ত করিতে থাকিবে।

এই তো গেল সংগীতের আভ্যন্তরিক উপদ্রব। আবার বাহিরে একদল বলবান লোক আছেন, তাঁরা সংগীতকে দ্বীপান্তরে চালান করিতে পারিলে সুস্থ থাকেন। শ্যামের বাঁশির উপর

রাগ করিয়া রাধিকা যেমন বাঁশবনটাকে একেবারে ঝাড়ে-মূলে উপাড়িতে চাহিয়াছিলেন ইহাদের সেইরকম ভাব। মাটির উপর পড়িলে গায়ে ধুলা লাগে বলিয়া পৃথিবীটাকে বরখাস্ত করিতে ইহারা কখনোই সাহস করেন না, কিন্তু গানকে ইঁহারা বর্জন করিবার প্রস্তাব করেন এই সাহসে যে, তাঁরা মনে করেন গানটা বাহুল্য, ওটা না হইলেও কাজ চলে এবং পেট ভরে। এটা বোঝেন না যে, বাহুল্য লইয়াই মনুষ্যত্ব, বাহুল্যই মানবজীবনের চরম লক্ষ্য। সত্যের পরিণাম সত্য নহে, আনন্দে। আনন্দ সত্যের সেই অসীম বাহুল্য যাহাতে আত্মা আপনাকেই আপনি প্রকাশ করে– কেবল আপনার উপকরণকে নয়। যদি কোনো সভ্যতার বিচার করিতে হয় তবে এই বাহুল্য দিয়াই তার পরিমাপ। কেজো লোকেরা সঞ্চয় করে। সঞ্চয়ে প্রকাশ নাই, কেননা প্রকাশ ত্যাগে। সেই ত্যাগের সম্পদই বাহুল্য।

সঞ্চয় করাও নহে, ভোগ করাও নহে, কিন্তু আপনাকে প্রকাশ করিবার যে প্রেরণা তাহাতেই আপনার বিকাশ। গান যদি কেবল বৈঠকখানার ভোগবিলাস হয়, তবে তাহাতে নির্জীবতা প্রমাণ করে। প্রকাশের যত রকম ভাষা আছে সমস্তই মানুষের হাতে দিতে হইবে। কেননা, যে পরিমাণে মানুষ বোবা সেই পরিমাণে সে দুর্বল, সে অসম্পূর্ণ। এইজন্য ওস্তাদের গড়খাই-করা গানকে আমাদের সকলের করা চাই। তাহা হইলে জীবনের ক্ষেত্রে গানও বড়ো হইবে, সেই গানের সম্পদে জীবনও বড়ো হইবে।

এতদিন আমাদের ভদ্রসমাজ গানকে ভয় করিয়া আসিতেছিল। তার কারণ, যা সকলের জিনিস, ভোগী তাকে বাঁধ দিয়া আপনার করাতেই তার স্রোত মরিয়াছে, সে দূষিত হইয়াছে। ঘরের বদ্ধ বাতাস যদি বিকৃত হয় তবে দরজা জানালা খুলিয়া দিয়া বাহিরের বাতাসের সঙ্গে তার যোগসাধন করা চাই। ইহাতে ভয় করিবার কারণ নাই, কেননা ইহাতে বাড়িটাকে হারানো হয় না। আজকালকার দেশাভিমানীরা ঐ ভুল করেন। তাঁরা মনে করেন দরজা জানালা খুলিয়া দিয়া বাহিরকে পাওয়াটাই আপনার বাড়িকে হারানো। যেন, যে হাওয়া চৌদ্দ-পুরুষের নিশ্বাসে বিষিয়া উঠিয়াছে তাহাই আমার নিজের হাওয়া, আর ঐ বিশ্বের হাওয়াটাই বিদেশী। এ কথা ভুলিয়া যান ঘরের হাওয়ার সঙ্গে বাহিরের হাওয়ার যোগ যেখানে নাই সেখানে ঘরই নাই, সেখানে কারাগার।

দেশের সকল শক্তিই আজ জরাসন্ধের কারাগারে বাঁধা পড়িয়াছে। তারা আছে মাত্র, তারা চলে না- দস্তুরের বেড়িতে তারা বাঁধা। সেই জরার দুর্গ ভাঙিয়া আমাদের সমস্ত বন্দী শক্তিকে বিশ্বে ছাড়া দিতে হইবে- তা, সে কী গানে, কী সাহিত্যে, কী চিন্তায়, কী কর্মে, কী রাষ্ট্র কী সমাজে। এই ছাড়া দেওয়াকে যার ক্ষতি হওয়া মনে করে তারাই কৃপণ, তারাই আপনার সম্পদ হইতে আপনি বঞ্চিত, তারাই অন্নপূর্ণার অন্নভাণ্ডারে বসিয়া উপবাসী। যারা শিকল দিয়া বাঁধিয়া রাখে তারাই হারায়, যারা মুক্তির ক্ষেত্রে ছাড়িয়া রাখে তারাই রাখে।

ভাদ্র, ১৩২৪

আমাদের সঙ্গীত

সংগীতসংঘ থেকে যখন আমাকে অভ্যর্থনা করবার প্রস্তাব এসেছিল, তখন আমি অসংকোচে সম্মত হয়েছিলেম; কেননা সংগীতসংঘের প্রতিষ্ঠাত্রী, নেত্রী এবং ছাত্রী সকলেই আমার কন্যাস্থানীয়া– তাঁদের কাছ থেকে প্রণাম গ্রহণ করিবার অধিকর আমার আছে। আমাকে কিছু বলতে অনুরোধ করা হয়েছিল, তাতেও আমি কুণ্ঠিত হই নি। তার পরে সহসা যখন সংবাদপত্রে দেখলেম ও সভায় সর্বসাধারণের নিমন্ত্রণ আছে এবং আমার বক্তৃতার বিষয়টি হবে ভারতীয় সংগীত– তখন আমি মনে বুঝলেম এ আমার পক্ষে একটা সংকট। বাল্যকাল থেকে আমি সকল বিদ্যালয়েরই পলাতক ছাত্র, সংগীতবিদ্যালয়েও আমার হাজিরা-বই দেখলে দেখা যাবে আমি অধিকাংশ কালই গরহাজির ছিলেম। এই ব্যাপারে আমার ব্যাকুলতা দেখে উদ্যোগকর্তারা কেউ কেউ আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন, “তোমাকে বেশি বলতে হবে না, দু-চার কথায় বক্তৃতা সেরে দিয়ো।’ আমি তাঁদের এই পরামর্শে আশ্বস্ত হই নি। কেননা, যে লোক খুব বেশি জানে সেই মানুষই খুব অল্প কথায় কর্তব্য সমাধা করতে পারে, যে কম জানে তাকেই ইনিয়ে-বিনিয়ে অনেক কথা বলতে হয়। যাই হোক, এখন আমার আর ফেরবার পথ নেই, অতএব “যাবৎ কিঞ্চিৎ ন ভাষতে’ এই সদুপদেশ পালন করবার সময় চলে গেছে।

বাল্যকালে স্বভাবদোষে আমি যথারীতি গান শিখি নি বটে, কিন্তু ভাগ্যক্রমে গানের রসে আমার মন রসিয়ে উঠেছিল। তখন আমাদের বাড়িতে গানের চর্চার বিরাম ছিল না। বিষ্ণু চক্রবর্তী ছিলেন সংগীতের আচার্য, হিন্দুস্থানী সংগীতকলায় তিনি ওস্তাদ ছিলেন। অতএব ছেলেবেলায় যে-সব গান সর্বদা আমার শোনা অভ্যাস ছিল, সে শখের দলের গান নয়; তাই আমার মনে কালোয়াতি গানের একটা ঠাট আপনা-আপনি জমে উঠেছিল। রাগরাগিণীর বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে অত্যন্ত যাঁরা শুচিবায়ুগ্রস্ত, তাঁদের সঙ্গে আমার তুলনাই হয় না, অর্থাৎ সুরের সূক্ষ্ম খুঁটিনাটি সম্বন্ধে কিছু-কিছু ধারণা থাকা সত্ত্বেও আমার মন তার অভ্যাসে বাঁধা পড়ে নি– কিন্তু কালোয়াতি সংগীতের রূপ এবং রস সম্বন্ধে একটা সাধারণ সংস্কার ভিতরে-ভিতরে আমার মনের মধ্যে পাকা হয়ে উঠেছিল।

যাই হোক, গীতরসের যে সঞ্চয় বাল্যকালে আমার চিত্তকে পূর্ণ করেছিল, স্বভাবতই তার গতি হল কোন্ মুখে, তার প্রকাশ হল কোন্ রূপে, সেই কথাটি যখন চিন্তা করে দেখি তখন তার থেকে বুঝতে পারি সংগীত সম্বন্ধে আমাদের দেশের প্রকৃতি কী। আজ সভায় আমি সেই কথাটির আলোচনা করব।

আমার মনে যে সুর জমে ছিল, সে সুর যখন প্রকাশিত হতে চাইলে তখন কথার সঙ্গে গলাগলি করে সে দেখা ছিল। ছেলেবেলা থেকে গানের প্রতি আমার নিবিড় ভালোবাসা যখন আপনাকে ব্যক্ত করতে গেল, তখন অবিমিশ্র সংগীতের রূপ সে রচনা করলে না। সংগীতকে কাব্যের সঙ্গে মিলিয়ে দিলে, কোন্টা বড়ো কোন্টা ছোটো বোঝা গেল না।

আকাশে মেঘের মধ্যে বাষ্পাকারে যে জলের সঞ্চয় হয়, বিশুদ্ধ জলধারা-বর্ষণেই তার প্রকাশ। গাছের ভিতর যে রস গোপনে সঞ্চিত হতে থাকে, তার প্রকাশ পাতার সঙ্গে ফুলের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে। সংগীতেরও এই রকম দুই ভাবের প্রকাশ। এক হচ্ছে বিশুদ্ধ সংগীত আকারে, আর হচ্ছে কাব্যের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে। মানুষের মধ্যে প্রকৃতিভেদ আছে, সেই ভেদ অনুসারে সংগীতের এই দুই রকমের অভিব্যক্তি হয়। তার প্রমাণ দেখা যায় হিন্দুস্থানে আর বাংলাদেশে। কোনো সন্দেহ নেই যে, বাংলাদেশে সংগীত কবিতার অনুচর না হোক, সহচর বটে। কিন্তু পশ্চিম হিন্দুস্থানে সে স্বরাজে প্রতিষ্ঠিত; বাণী তার “ছায়েবানুগতা’ ভজন-সংগীতের কথা যদি ছেড়ে দিই, তবে দেখতে পাই পশ্চিমে সংগীত যে বাক্য আশ্রয় করে তা অতি তুচ্ছ। সংগীত সেখানে স্বতন্ত্র, সে আপনাকেই প্রকাশ করে।

বাংলাদেশে হৃদয়ভাবের স্বাভাবিক প্রকাশ সাহিত্যে। “গৌড়জন যাহে আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি’– সে দেখতে পাচ্ছি সাহিত্যের মধুচক্র থেকে। বাণীর প্রতিই বাঙালির অন্তরের টান; এইজন্যেই ভারতের মধ্যে এই প্রদেশেই বাণীর সাধনা সব চেয়ে বেশি হয়েছে। কিন্তু একা বাণীর মধ্যে তো মানুষের প্রকাশের পূর্ণতা হয় না– এইজন্যে বাংলাদেশে সংগীতের স্বতন্ত্র পঙ্ক্তি নয়, বাণীর পাশেই তার আসন।

এর প্রমাণ দেখো আমাদের কীর্তনে। এই কীর্তনের সংগীত অপরূপ কিন্তু সংগীত যুগল ভাবে গড়া– পদের সঙ্গে মিলন হয়ে তবেই এর সার্থকতা। পদাবলীর সঙ্গেই যেন তার রাসলীলা; স্বাতন্ত্র্য সে সইতেই পারবে না।

সংগীতের স্বাতন্ত্র্য যন্ত্রে সব চেয়ে প্রকাশ পায়। বাংলার আপন কোনো যন্ত্র নেই, এবং প্রাচীনকালেই হোক আর আধুনিক কালেই হোক, যন্ত্রে যাঁরা ওস্তাদ তাঁরা বাংলার নন। বীণ রবাব শরদ্ সেতার এস্‌রাজ সারেঙ্গী প্রভৃতির তুলনায় আমাদের রাখালের বাঁশি বা বৈরাগীর একতারা কিছুই নয়। তা ছাড়া, গড়ের বাদ্যের বীভৎস ব্যঙ্গরূপে বাংলাদেশে কন্সর্ট্ নামক যে যন্ত্রসংগীতের উৎপত্তি হয়েছে তাকে সহ্য করা আমাদের লজ্জা এবং তাতে “আনন্দ’ পাওয়ায় আমাদের অপরাধ।

এই-সমস্ত লক্ষণ দেখে আমার বিশ্বাস হয় বাংলাদেশে কাব্যের সংযোগে সংগীতের যে বিকাশ হচ্ছে, সে একটি অপরূপ জিনিস হয়ে উঠবে। তাতে রাগরাগিণীর প্রথাগত বিশুদ্ধতা থাকবে না, যেমন কীর্তনে তা নেই; অর্থাৎ গানের জাত রক্ষা হবে না, নিয়মের স্খলন হতে থাকবে, কেননা তাকে বাণীর দাবি মেনে চলতে হবে। কিন্তু এমনতরো পরিণয়ে পরস্পরের মন জোগাবার জন্যে উভয় পক্ষের নিজের জিদ কিছু-কিছু না ছাড়লে মিলন সুন্দর হয় না। এইজন্যে গানে বাণীকেও সুরের খাতিরে কিছু আপস করতে হয়, তাকে সুরের উপযোগী হতে হয়। যাই হোক, বাংলাদেশে এই এক জাতের কাব্যকলা ক্রমশ ব্যাপক হয়ে উঠবে বলে আমি মনে করি। অন্তত আমার নিজের কবিত্বের ইতিহাসে দেখতে পাই– গান-রচনা, অর্থাৎ সংগীতের সঙ্গে বাণীর মিলন-সাধনই এখন আমার প্রধান সাধনা হয়ে উঠেছে।

সংগীত যেখানে আপন স্বাতন্ত্র্যে বিরাজ করে সেখানে তার নিয়ম সংযমের যে শুচিতা প্রকাশ পায়, বাণীর সংযোগে গানরূপে তার সেই শুচিতা তেমন করে বাঁচিয়ে চলা যায় না বটে; কিন্তু পরম্পরাগত সংগীতরীতিকে আয়ত্ত করলে তবেই নিয়মের ব্যত্যয়সাধনে যথার্থ অধিকার জন্মে। কবিতাতেও ছন্দের রীতি আছে– সে রীতি কোনো বড়ো কবি নিখুঁতভাবে সাবধানে বাঁচিয়ে চলবার চেষ্টা করেন না– অর্থাৎ তাঁরা নিয়মের উপরেও কর্তৃত্ব করেন–কিন্তু সেই কর্তৃত্ব করতে গেলেও নিয়মকে স্বীকার করা চাই। স্বাতন্ত্র্য যেখানে উচ্ছৃঙ্খলতা সেখানে কলাবিদ্যার স্থান নেই। এইজন্যে নিজের সৃজনশক্তিকে ছাড়া দিতে গেলেই শিক্ষা ও সংযমশক্তির বেশি দরকার হয়।

সংগীতসংঘ আমাদের দেশের সংগীতকে দেশের মেয়েদের কণ্ঠে প্রতিষ্ঠিত করবার ভার নিয়েছেন। তাঁদের এই সাধনার গভীর সার্থকতা আছে। আমাদের দুই রকমের খাদ্য আছে–

একটি প্রয়োজনের, আর-একটি অপ্রয়োজনের; একটি অন্ন, আর-একটি অমৃত। অন্নের ক্ষুধায় আমরা মর্ত্যলোকের সকল জীবজন্তুর সমান, অমৃতের ক্ষুধায় আমরা সুরলোকের দেবতাদের দলে। সংগীত হচ্ছে অমৃতের নানা ধারার মধ্যে একটি। দেশকে অন্নের পরিবেশন তো মেয়েদের হাতেই হয়– আর অমৃতের পরিবেশনও কি তাঁদের হাতেই নয়?

এ কথা মনে রাখতে হবে, যা অমৃত, যা প্রয়োজনকে অতিক্রম ক'রে আপনাকে প্রকাশ করে, মনুষ্যত্বের চরম মহিমা তাতেই। যে জাতি পেটুক সে কেবলমাত্র নিজের প্রতিদিনের গরজ মিটিয়ে চলেছে, মৃত্যুতেই তার একান্ত মৃত্যু। গ্রীস যে আজও অমর হয়ে আছে সে তার ধনে, ধান্যে, রাষ্ট্রীয় প্রতাপে নয়; আত্মার আনন্দরূপ যা-কিছু সে সৃষ্টি করেছে তাতেই সে চিরদিন বেঁচে আছে। প্রত্যেক জাতির উপরে ভার আছে সে মর্ত্যলোকে আপন অমরলোকের সৃষ্টি করবে। গ্রীস সেই নিজের অমরাবতীতে আজও বাস করছে। সংগীত মানবের সেই আনন্দরূপ– সে মানবের নিজের অভাবমোচনের অতীত ব'লেই সর্বমানবের এবং সর্বকালের– রাজ্য সাম্রাজ্যের ঐশ্বর্য ধ্বংস হয়ে যায়, কিন্তু এই আনন্দরূপ চিরন্তন।

যে-সকল ঘোরতর প্রবীণ লোক ওজন-দরে জিনিসের মূল্য বিচার করেন, সারবান বলতে যাঁরা ভারবান বোঝেন, তাঁরা সংগীত প্রভৃতি কলাবিদ্যাকে শৌখিনতা বলে অবজ্ঞা করে থাকেন। তাঁরা জানেন না যাদের বীর্য আছে সৌন্দর্য তাদেরই। যে শক্তি আপনাকে শক্তিরূপেই প্রকাশ করে সে হল পালোয়ানি, কিন্তু শক্তির সত্যরূপ হচ্ছে সৌন্দর্য। গাছের পূর্ণ শক্তি তার ফুলে; তার মোটা গুঁড়িটার মধ্যে সে কেবল আপনিই থাকে, কিন্তু তার ফুলের মধ্যে সে যে ফল ফলায় তারই বীজের ভিতর ভাবীকালের অরণ্য, অর্থাৎ তার অমরতা। সাহিত্যে, সংগীতে, সর্বপ্রকার কলাবিদ্যায় প্রাণশক্তি আপন অমরতাকে ফলিয়ে তোলে– আপিস-আদালতে কলে-কারাখানায় নয়। উপনিষদ বলেছেন– জন্মেছে বলেই সকলে অমর হয় না, যারা অসীমকে উপলব্ধি করেছে "অমৃতাস্তে ভবন্তি'। অভাবের উপলব্ধিতে কাপড়ের কল, পাটের বস্তার কারখানা– অসীমের উপলব্ধিতেই সংগীত, অসীমের উপলব্ধিতেই আমরা সৃষ্টিকর্তা। যে সৃষ্টিকর্তা চন্দ্রসূর্যের সিংহাসনে বসে দরবার করছেন তিনি যে গুণী জাতিকে শিরোপা দিয়ে বলেন, "সাবাস! আমার সুরের সঙ্গে তোমার সুর মিলছে'– সেই ধন্য, সেই বেঁচে যায়, তাঁর অমৃতসভার পাশে তার চিরকালের আসন পাকা হয়ে থাকে।

ভাদ্র, ১৩২৮

বাউল গান

মুহম্মদ মন্‌সুর উদ্দিনের হারামণি গ্রন্থের ভূমিকা

মুহম্মদ মন্‌সুর উদ্দিন বাউল-সংগীত সংগ্রহে প্রবৃত্ত হয়েছে। এ সম্বন্ধে পূর্বেই তাঁর সঙ্গে আমার মাঝে মাঝে আলাপ হয়েছিল, আমিও তাঁকে অন্তরের সঙ্গে উৎসাহ দিয়েছি। আমার লেখা যাঁরা পড়েছেন তাঁরা জানেন বাউল পদাবলীর প্রতি আমার অনুরাগ আমি অনেক লেখায় প্রকাশ করেছি। শিলাইদহে যখন ছিলাম, বাউল দলের সঙ্গে আমার সর্বদাই দেখাসাক্ষাৎ ও আলাপ-আলোচনা হত। আমার অনেক গানেই আমি বাউলের সুর গ্রহণ করেছি এবং অনেক গানে অন্য রাগরাগিণীর সঙ্গে আমার জ্ঞাত বা অজ্ঞাত-সারে বাউল সুরের মিলন ঘটেছে। এর থেকে বোঝা যাবে বাউলের সুর ও বাণী কোন্‌-এক সময়ে আমার মনের মধ্যে সহজ হয়ে মিশে গেছে। আমার মনে আছে, তখন আমার নবীন বয়স, শিলাইদহ অঞ্চলেরই এক বাউল কলকাতায় একতারা বাজিয়ে গেয়েছিল–

কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ যে রে!
হারায়ে সেই মানুষে তার উদ্দেশে
দেশ-বিদেশে বেড়াই ঘুরে

কথা নিতান্ত সহজ, কিন্তু সুরের যোগে এর অর্থ অপূর্ব জ্যোতিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। এই কথাটিই উপনিষদের ভাষায় শোনা গিয়েছে : তং বেদ্যং পুরুষং বেদ মা বো মৃত্যুঃ পরিব্যথাঃ। যাঁকে জানবার সেই পুরুষকেই জানো, নইলে যে মরণবেদনা। অপণ্ডিতের মুখে এই কথাটিই শুনলুম তার গেঁয়ো সুরে সহজ ভাষায়–যাঁকে সকলের চেয়ে জানবার তাঁকেই সকলের চেয়ে না-জানবার বেদনা–অন্ধকারে মাকে দেখতে পাচ্ছে না যে শিশু তারই কান্নার সুর–তার কণ্ঠে বেজে উঠেছে। ‘অন্তরতর যদয়মাত্মা’ উপনিষদের এই বাণী এদের মুখে যখন ‘মনের মানুষ’ বলে শুনলুম, আমার মনে বড়ো বিস্ময় লেগেছিল। এর অনেক কাল পরে ক্ষিতিমোহন

সেন মহাশয়ের অমূল্য সঞ্চয়ের থেকে এমন বাউলের গান শুনেছি, ভাষার সরলতায়, ভাবের গভীরতায়, সুরের দরদে যার তুলনা মেলে না–তাতে যেমন জ্ঞানের তত্ত্ব তেমনি কাব্যরচনা, তেমনি ভক্তির রস মিশেছে। লোকসাহিত্যে এমন অপূর্বতা আর কোথাও পাওয়া যায় বলে বিশ্বাস করি নে।

সকল সাহিত্যে যেমন লোকসাহিত্যেও তেমন, তার ভালোমন্দর ভেদ আছে। কবির প্রতিভা থেকে যে রসধারা বয় মন্দাকিনীর মতো, অলক্ষ্যলোক থেকে সে নেমে আসে; তার পর একদল লোক আসে যারা খাল কেটে সেই জল চাষের ক্ষেতে আনতে লেগে যায়। তারা মজুরি করে; তাদের হাতে এই ধারার গভীরতা, এর বিশুদ্ধতা চলে যায়–কৃত্রিমতায় নানা প্রকারে বিকৃত হতে থাকে। অধিকাংশ আধুনিক বাউলের গানের অমূল্যতা চলে গেছে, তা চলতি হাটের সস্তা দামের জিনিস হয়ে পথে পথে বিকোচ্ছে। তা অনেক স্থলে বাঁধি বোলের পুনরাবৃত্তি এবং হাস্যকর উপমা তুলনার দ্বারা আকীর্ণ–তার অনেকগুলোই মৃত্যুভয়ের শাসন মানুষকে বৈরাগীদলে টানবার প্রচারকগিরি। এর উপায় নেই, খাঁটি জিনিসের পরিমাণ বেশি হওয়া অসম্ভব–খাঁটির জন্যে অপেক্ষা করতে ও তাকে গভীর করে চিনতে যে ধৈর্যের প্রয়োজন তা সংসারে বিরল। এইজন্যে কৃত্রিম নকলের প্রচুরতা চলতে থাকে। এইজন্যে সাধারণত যে-সব বাউলের গান যেখানে-সেখানে পাওয়া যায়, কী সাধনার কী সাহিত্যের দিক থেকে তার দাম বেশি নয়।

তবু তার ঐতিহাসিক মূল্য আছে। অর্থাৎ, এর থেকে স্বদেশের চিত্তের একটা ঐতিহাসিক পরিচয় পাওয়া যায়। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে ভারতবর্ষীয় চিত্তের যে একটি বড়ো আন্দোলন জেগেছিল, সেটি মুসলমান-অভ্যাগমের আঘাতে। অস্ত্র হাতে বিদেশী এল, তাদের সঙ্গে দেশের লোকের মেলা হল কঠিন। প্রথম অসামঞ্জস্যটা বৈষয়িক, অর্থাৎ বিষয়ের অধিকার নিয়ে, স্বদেশের সম্পদের ভোগ নিয়ে। বিদেশী রাজা হলেই এই বৈষয়িক বিরুদ্ধতা অনিবার্য হয়ে ওঠে। কিন্তু, মুসলমান শাসনে সেই বিরুদ্ধতার তীব্রতা ক্রমশই কমে আসছিল, কেননা তারা এই দেশকেই আপন দেশ করে নিয়েছিল–সুতরাং দেশকে ভোগ করা সম্বন্ধে আমরা পরস্পরের অংশীদার হয়ে উঠলুম। তা ছাড়া, সংখ্যা গণনা করলে দেখা যাবে এ দেশের অধিকাংশ মুসলমানই বংশগত জাতিতে হিন্দু, ধর্মগত জাতিতে মুসলমান। সুতরাং দেশকে ভোগ করবার অধিকার উভয়েরই সমান। কিন্তু তীব্রতর বিরুদ্ধতা রয়ে গেল ধর্ম নিয়ে। মুসলমান শাসনের

আরম্ভকাল থেকেই ভারতের উভয় সম্প্রদায়ের মহাত্মা যাঁরা জন্মেছেন তাঁরাই আপন জীবনে ও বাক্যপ্রচারে এই বিরুদ্ধতার সমন্বয়-সাধনে প্রবৃত্ত হয়েছেন। সমস্যা যতই কঠিন ততই পরমাশ্চর্য তাঁদের প্রকাশ। বিধাতা এমনি করেই দুরূহ পরীক্ষার ভিতর দিয়েই মানুষের ভিতরকার শ্রেষ্ঠকে উদ্‌ঘাটিত করে আনেন। ভারতবর্ষে ধারাবাহিক ভাবেই সেই শ্রেষ্ঠের দেখা পেয়েছি, আশা করি আজও তার অবসান হয় নি। যে-সব উদার চিত্তে হিন্দু-মুসলমানের বিরুদ্ধ ধারা মিলিত হতে পেরেছে, সেই-সব চিত্তে সেই ধর্মসংগমে ভারতবর্ষের যথার্থ মানসতীর্থ স্থাপিত হয়েছে। সেই-সব তীর্থ দেশের সীমায় বদ্ধ নয়, তা অন্তহীন কালে প্রতিষ্ঠিত। রামানন্দ, কবীর, দাদু, রবীদাস, নানক প্রভৃতির চরিতে এই-সব তীর্থ চিরপ্রতিষ্ঠিত হয়ে রইল। এঁদের মধ্যে সকল বিরোধ সকল বৈচিত্র্য একের জয়বার্তা মিলিত কণ্ঠে ঘোষণা করেছে।

আমাদের দেশে যাঁরা নিজেদের শিক্ষিত বলেন তাঁরা প্রয়োজনের তাড়নায় হিন্দু-মুসলমানের মিলনের নানা কৌশল খুঁজে বেড়াচ্ছেন। অন্য দেশের ঐতিহাসিক স্কুলে তাঁদের শিক্ষা। কিন্তু, আমাদের দেশের ইতিহাস আজ পর্যন্ত, প্রয়োজনের মধ্যে নয়, পরন্তু মানুষের অন্তরতর গভীর সত্যের মধ্যে মিলনের সাধনাকে বহন করে এসেছে। বাউল-সাহিত্যে বাউল সম্প্রদায়ের সেই সাধনা দেখি–এ জিনিস হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই; একত্র হয়েছে অথচ কেউ কাউকে আঘাত করে নি। এই মিলনে সভাসমিতির প্রতিষ্ঠা হয় নি; এই মিলনে গান জেগেছে, সেই গানের ভাষা ও সুর অশিক্ষিত মাধুর্যে সরস। এই গানের ভাষায় ও সুরে হিন্দু-মুসলমানের কণ্ঠ মিলেছে, কোরান পুরাণে ঝগড়া বাধে নি। এই মিলনেই ভারতের সভ্যতার সত্য পরিচয়, বিবাদে বিরোধে বর্বরতা। বাংলাদেশের গ্রামের গভীর চিত্তে উচ্চ সভ্যতার প্রেরণা ইস্কুল-কলেজের অগোচরে আপনা-আপনি কিরকম কাজ করে এসেছে, হিন্দু-মুসলমানের জন্য এক আসন রচনার চেষ্টা করেছে, এই বাউল গানে তারই পরিচয় পাওয়া যায়। এইজন্য মুহম্মদ মন্‌সুর উদ্দিন মহাশয় বাউল-সংগীত সংগ্রহ করে প্রকাশ করবার যে উদ্যোগ করেছেন আমি তার অভিনন্দন করি–সাহিত্যের উৎকর্ষ বিচার ক’রে না, কিন্তু স্বদেশের উপেক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে মানবচিত্তের যে তপস্যা সুদীর্ঘকাল ধরে আপন সত্য রক্ষা করে এসেছে তারই পরিচয় পাওয়া লাভ করব এই আশা ক’রে। পৌষ সংক্রান্তি ১৩৩৪

বিশ্ববিদ্যালয়ে সংগীতশিক্ষা

বিশ্ববিদ্যালয়ে সংগীতশিক্ষার ব্যবস্থা সম্বন্ধে যে প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছে তা নিয়ে বাদ-প্রতিবাদ চলছে। ইচ্ছা ছিল না এর মধ্যে প্রবেশ করি। প্রথম কারণ, আমার শরীর অপটু; দ্বিতীয় কারণ, শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রভৃতি সমস্ত ভার সম্প্রতি আমি নিজের হাতে নিয়েছি। শরীর যখন দুর্বল তখন একান্ত আমার আশু কর্তব্যের বাইরে অন্য কর্তব্যের মধ্যে নিজেকে জড়িত করা শক্তির অমিতব্যয়িতা, তাতে ব্যর্থতার সৃষ্টি করে। কিন্তু অকাজকে অগ্রসর হয়ে গ্রহণ না করলেও বাইরে থেকে সে ঘাড়ে এসে পড়ে, তখন তাকে অস্বীকার করতে গেলে জটিলতা আরো বেড়ে যায়।

শিক্ষাবিভাগ থেকে কিছুদিন হল এক পত্র পেয়েছিলুম, তাতে সংগীত-শিক্ষার প্রবর্তন সম্বন্ধে আমার পরামর্শ চাওয়া হয়েছিল। বিষয়ের গুরুত্ব বিচার করে আমি চুপ করে থাকতে পারি নি। উত্তরে লিখেছিলুম-বিশ্ববিদ্যালয়ে সংগীতশিক্ষার ব্যবস্থা গড়ে তোলবার পক্ষে অধ্যাপক ভাট্‌খণ্ডেই যোগ্যতম। আশা করেছিলুম এইখানেই আমার কাজ ফুরোলো। কর্মফলের পরম্পরা এখনো শেষ হয় নি। চিঠিপত্রযোগে তর্কবিতর্কের জালের মধ্যে জড়িত হয়ে পড়েছি। বর্তমানে বাংলাদেশে শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়কে শ্রেষ্ঠ গায়ক বলেছি, এই কারণে কিছু ভুল-বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছে; সেটা পরিষ্কার করা ভালো।

সাধারণত আমরা যাঁদের ওস্তাদ বলি, পুরাতন বিদ্যাধারাকে রক্ষা করা সম্বন্ধে তাঁদের বিশেষ একটা উপযোগিতা আছে। তাঁরা সংগ্রহ করেন, সঞ্চয় করেন, সংগীতব্যাকরণের বিশুদ্ধতা বাঁচিয়ে রাখেন। চিরপ্রচলিত রাগরাগিণীকে চিরপ্রচলিত প্রথার কাঠামোর মধ্যে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে ধরে রাখবার কাজে অক্লান্ত অধ্যবসায়ে তাঁদেরকে প্রবৃত্ত হতে হয়। ছেলেবেলা থেকেই একমাত্র এই কাজেই তাঁদের দেহ মন প্রাণ নিযুক্ত। সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর তাঁদের পক্ষে অত্যাবশ্যক নয়; অনেকের তা নেই, অনেকে তাকে অবজ্ঞাই করেন। গান সম্বন্ধে তাঁদের প্রতিভার স্বকীয়তাও বাহুল্য, এমন-কি, তাতে হয়তো তাঁদের আপন কর্মের ব্যাঘাত ঘটাতে পারে। তাঁরা একান্ত অবিকৃত ভাবে প্রাচীন ধারাকে অনুসরণ করে চলেন এইটেই তাঁদের গর্বের বিষয়। এই রকম রক্ষকতার মূল্য আছে। সমাজ সেই মূল্য তাঁদের যদি না দেয় তবে তাঁদের প্রতিও অন্যায় করে, নিজেরও ক্ষতি ঘটায়।

হিন্দুস্থানী সংগীত এমন একটি কলাবিদ্যা যার রচনার নিয়ম বহুকাল পূর্বেই সমাপ্ত হয়ে গেছে। সেই বহুকাল পূর্বের আদর্শের সঙ্গে মিলিয়েই তার বিচার চলে। যাঁরা সেই আদর্শমতেই বহু পরিশ্রমে এই-জাতীয় সংগীতের সাধনা করেছেন, হিন্দুস্থানী সংগীত সম্বন্ধে তাঁদের সাক্ষ্যকেই প্রামাণ্য বলে গ্রহণ করতে হয়।

এই ওস্তাদ-সম্প্রদায়ের মধ্যেও গুণের তারতম্য নিশ্চয় আছে। কারও গানের সংগ্রহ অন্যের চেয়ে হয়তো বহুতর; রাগরাগিণীর রূপের পরিচয় হয়তো এক ওস্তাদের চেয়ে অন্য ওস্তাদের অধিকতর বিশুদ্ধ; তাল তানের প্রয়োগ সম্বন্ধে কারও বা কসরত অন্যের চেয়ে বিস্ময়জনক।

ওস্তাদির চেয়ে বড়ো একটা জিনিস আছে, সেটা হচ্ছে দরদ। সেটা বাইরের জিনিস নয়, ভিতরের জিনিস। বাইরের জিনিসের পরিমাপ আছে, আদর্শে ধরে সেটা সম্বন্ধে দাঁড়িপাল্লার বিচার চলে। তার চেয়ে বড়ো যেটা সেটাকে কোনো বাইরের আদর্শে মাপা চলে না; সেটা হল সহৃদয়হৃদয়বেদ্য। কে সহৃদয় আর কে সহৃদয় নয় বাইরে থেকে তারও তল পাওয়া যায় না, তার শেষ নিষ্পত্তি করবার ব্যর্থ চেষ্টা মাথা-ফাটাফাটিতে গিয়ে পৌঁছয়–অর্থাৎ যাকে বলে হিংস্র দুঃসহযোগ!

বালককালে যদুভট্টকে জানতাম। তিনি ওস্তাদজাতের চেয়ে ছিলেন অনেক বড়ো। তাঁকে গাইয়ে বলে বর্ণনা করলে খাটো করা হয়। তাঁর ছিল প্রতিভা, অর্থাৎ সংগীত তাঁর চিত্তের মধ্যে রূপ ধারণ করত। তাঁর রচিত গানের মধ্যে যে বিশিষ্টতা ছিল তা অন্য কোনো হিন্দুস্থানী গানে পাওয়া যায় না। সম্ভবত তাঁর চেয়ে বড়ো ওস্তাদ তখন হিন্দুস্থানে অনেক ছিল, অর্থাৎ তাঁদের গানের সংগ্রহ আরো বেশি ছিল, তাঁদের কসরতও ছিল বহুসাধনাসাধ্য, কিন্তু যদুভট্টর মতো সংগীতভাবুক আধুনিক ভারতে আর কেউ জন্মেছে কিনা সন্দেহ। অবশ্য, এ কথাটা অস্বীকার করবার অধিকার সকলেরই আছে। কারণ, কলাবিদ্যায় যথার্থ গুণের প্রমাণ তর্কের দ্বারা স্থির হয় না, যষ্টির দ্বারাও নয়। যাই হোক, ওস্তাদ ছাঁচে ঢেলে তৈরি হতে পারে, যদুভট্ট বিধাতার স্বহস্তরচিত। অতএব চলতি কাজে যদুভট্টদের প্রত্যাশা করা বৃথা। কথাটা হচ্ছে এই যে, হিন্দুস্থানী সংগীতের মতো একটা স্থাবর পদার্থের আধার যখন খুঁজি তখন ওস্তাদকেই সহজে হাতের কাছে পাই। বিশুদ্ধ রাগরাগিণী শুনতে বা শিখতে চাই তখন ওস্তাদকেই খুঁজি। যেমন, যে পূজাবিধি মন্ত্রে ও অনুষ্ঠানে একেবারে অচল করে বাঁধা তার জন্যে পুরুতের দরকার হয়–

তখন এমন লোককে জুটিয়ে আনি, অক্ষরে অক্ষরে যার সমস্ত ক্রিয়াকলাপ অভ্যস্ত। তার মানে বুঝতে পারে এতটুকু সংস্কৃতজ্ঞান এই পুরুতের পক্ষে অনাবশ্যক। কারণ, এইসকল ক্রিয়াকলাপের বাইরের রূপটাই হল প্রধান; সেটা যদি বিশুদ্ধ হয় তা হলেই কাজটা নিষ্পন্ন হতে পারে। যিনি পণ্ডিত তিনি তাঁর অর্থবোধের দ্বারা এই-সকল মন্ত্রে হয়তো প্রাণ দিতে পারেন, কিন্তু একান্ত চর্চার অভাবে বাইরের দিকে তাঁর স্খলন হতে পারে–অন্তত তাঁর পক্ষে কাজটা অনর্গলভাবে সহজ নাও হতে পারে। যেখানে দৃঢ় করে বেঁধে দেওয়া বাহ্যরূপটাই প্রধান সেখানে আয়াসসাধ্য অভ্যাসটাই বেশি কাজে লাগে, সেখানে প্রতিভা লজ্জিত হবে। আপিসের অভিজ্ঞ কেরানি তার স্বস্থানে উপরের অধ্যক্ষের চেয়ে বেশি যোগ্য, কিন্তু সেই যোগ্যতা সেই সীমার মধ্যেই পর্যাপ্ত।

হিন্দুস্থানী গানকে যেহেতু আমরা অতীতকালের নির্দিষ্ট বিধির দ্বারা বিচার করি, সেইজন্যেই তার এমন বাহন চাই যার চর্চা আছে, প্রতিভা যার পক্ষে বাহুল্য–যে আবিষ্কারক নয়, যে ব্যাখ্যাকারক–সংগীত যে জগদীশচন্দ্র বসু নয়, যে বিজ্ঞান-পাঠশালায় ডেমনেস্ট্রেটর। এক কথায় যে ওস্তাদ।

আমাদের যখন অল্প বয়স ছিল তখন কলকাতার ধনীদের ঘরে এইরকম ওস্তাদের সমাগম সর্বদাই দেখেছি। তাতে করে সংগীতের অলংকারশাস্ত্রবোধ অন্তত ধনীসমাজে প্রচলিত ছিল। সেই-সব বনেদী ঘরে গানের অলংকারশাস্ত্রবোধটা না থাকা লজ্জার বিষয় ছিল। ঠিক কোন্‌খানে সুর বা তালের কতটুকু স্খলন হচ্ছে সেটা তাঁরা অনেকেই জানতেন, সেই দিকে কান রেখেই তাঁরা গান শুনতেন। বাঁধা আদর্শের সঙ্গে তান মান লয় সম্পূর্ণ মিলেছে দেখলেই তাঁরা পুলকিত হয়ে উঠতেন। রাগিণীর যে-সব জায়গায় দুরূহ গ্রন্থি, সেইখানটাতে যে-সব গাইয়ে অনায়াসে সংকট পার হয়ে যেত তারাই বরমাল্য পেত।

যে কারণেই হোক, শহরে অনেক দিন থেকেই গাইয়ে-সমাগম বিরল হয়ে এসেছে। তাই হিন্দুস্থানী গানের অলংকারশাস্ত্র সম্বন্ধে জ্ঞানের চর্চা অনেক দিন থেকে শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের মধ্যে নেই বললেই হয়। অথচ হিন্দুস্থানী সংগীতে অলংকারশাস্ত্রবোধটা প্রধান জিনিস। এই কারণেই যখন আমরা হিন্দুস্থানী সংগীতের বিশেষভাবে আলোচনা করতে চাই তখন ওস্তাদকে খুঁজি। সেও পাওয়া দুর্লভ হয়েছে।

আমাদের বাড়িতে একদা নানাপ্রয়োজনবশত এই রকম ওস্তাদের খোঁজ আমরা প্রায়ই করতুম। শেষ যাঁকে পাওয়া গিয়েছিল তিনি খ্যাতনামা রাধিকা গোস্বামী। অন্যান্য গায়কদের মধ্যে যদুভট্টর কাছেও তিনি শিক্ষা পেয়েছিলেন। যাঁদের কাছে তাঁর পরিচয় ছিল তাঁরা সকলেই জানেন রাধিকা গোস্বামীর কেবল যে গানের সংগ্রহ ও রাগরাগিণীর রূপজ্ঞান ছিল তা নয়, তিনি গানের মধ্যে বিশেষ একটি রসসঞ্চার করতে পারতেন। সেটা ছিল ওস্তাদের চেয়ে কিছু বেশি। সেটা যদি নাও থাকত তবু তাঁকে আমরা ওস্তাদ বলেই গণ্য করতুম, এবং ওস্তাদের কাছ থেকে যেটা আদায় করবার তা আমরা আদায় করতুম–আমরা আদায় করেও ছিলুম। সে-সব কথা সকলেরই জানা নেই।

তাঁর মৃত্যুর পরেও ওস্তাদের খোঁজ করবার দরকার ঘটেছিল। শান্তিনিকেতনে হিন্দুস্থানী গান শিক্ষা দেবার প্রয়োজন বোধ করি। নিজেও চেষ্টা করেছি, বন্ধু-বান্ধবদেরকেও অনুরোধ জানিয়েছি, স্বয়ং দিলীপকুমারকেও এ সম্বন্ধে আমার অভাব জ্ঞাপন করেছি। তখনই আবিষ্কার করা গেল বাংলাদেশে একমাত্র হিন্দুস্থানী গানের ওস্তাদ আছেন শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর। আর যাঁরা আছেন তাঁরা কেউ তাঁর সমকক্ষ নন, এবং অনেকে তাঁরই আত্মীয়। আমি তাঁকে শান্তিনিকেতনে শিক্ষকতা কাজের জন্যে পেতে ইচ্ছা করেছিলুম। কিন্তু কলকাতায় তাঁর এত কাজ যে তাঁকে কলকাতার বাইরে পাওয়া সম্ভব হয় নি। দিলীপকুমার তাঁর চেয়ে যোগ্যতর কোনো ওস্তাদের কথা আমাকে জানাতে পারেন নি। আজকের দিনে কলকাতায় যেখানেই সংগীতশিক্ষার প্রয়োজন হয়েছে সেখানেই তাঁকে ডাক পড়েছে। আর যাই হোক, আজকের দিনে সাধারণের মতে তিনিই বড়ো ওস্তাদ বলে স্বীকৃত।

যাঁরা সংগীতব্যবসায়ী নন, বাংলাদেশে তাঁদের মধ্যে গোপেশ্বরবাবুর চেয়ে বড়ো ওস্তাদ কেউ আছেন কি না সে কথা বলা কঠিন। যাঁরা সংগীতব্যবসায়ী তাঁরা শিশুকাল থেকেই একান্তভাবে গান-শিক্ষায় প্রবৃত্ত, অনেক স্থলে তাঁদের বংশের মধ্যে গান-চর্চার ধারা প্রবহমাণ। অতএব গানের সংগ্রহ ও সাধনা সম্বন্ধে তাঁদের উপর নির্ভর করা চলে। এক সময়ে আমি বহুল পরিমাণেই হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার চর্চা করেছিলুম। দৈবাৎ আমার চিকিৎসায় যাঁরা ফল পেয়েছিলেন তাঁরা ব্যবসায়ী চিকিৎসককে ছেড়ে আমার কাছেই আসতেন। তার থেকে আমার পক্ষপাতীর দল যদি বিচার করতেন আমি সত্যিই বড়ো ডাক্তার, তবে তাঁদের সেই বিশ্বাসের জোরে আমার ডাক্তারি বিদ্যার প্রমাণ হত না। অন্যান্য শিক্ষা বা কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে যাঁরা

কোনো-একটি বিদ্যার চর্চা করেন, সাধারণত তাঁদের সঙ্গে তুলনা করা চলে না এমন দলের যাঁরা একান্তভাবেই সেই বিদ্যার চর্চা করেছেন। অব্যবসায়ীদের মধ্যে প্রতিভা-সম্পন্ন লোক থাকতে পারেন, কিন্তু পূর্বেই বলেছি হিন্দুস্থানী সংগীতের মতো প্রাচীন অলংকারশাস্ত্রের দ্বারা প্রায় অচলভাবে নিয়মিত বিদ্যায় কেবল প্রতিভা-দ্বারা ওস্তাদি লাভ করা যায় না, বহুল শিক্ষা ও চর্চার দ্বারাই করা যায়।

আর-একটি বিষয় নিয়ে তর্ক হচ্ছে–গোপেশ্বরবাবুর গানের স্টাইলটা বিষ্ণুপুরী বলে কেউ কেউ তাঁর ওস্তাদিতে কলঙ্ক আরোপ করে থাকেন। সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রে দেখা যায় যে, প্রদেশভেদে সাহিত্যের স্বাভাবিক রীতিভেদ স্বীকার করা হয়েছে। বৈদর্ভী রীতি, গৌড়ীয় রীতি প্রভৃতি রীতির বিশিষ্টতা তিরস্কৃত হয় নি। ভারতীয় স্থাপত্যে দেখা যায় দক্ষিণভারতের স্থাপত্যের সঙ্গে উড়িষ্যার ও উত্তরভারতের অনেক পার্থক্য। মাদুরার মন্দিররচনায় স্থাপত্য পদে পদে যে তান লাগিয়েছে তার অংশে অংশে অলংকার-বৈচিত্র্যের যে অতি বাহুল্য তা কারও কারও ভালো লাগে না। তার সঙ্গে সেকেন্দ্রার স্থাপত্যের তানবিহীনতা ও অলংকারবিরলতার তুলনা করলে সেকেন্দ্রাকেই কারও কারও রুচিতে ভালো ঠেকে। তবুও ভারতীয় স্থাপত্যে দক্ষিণী রীতিকে অস্বীকার করা চলে না। তেমনিই হিন্দুস্থানী গান বাংলাদেশে যদি কোনো বিশেষ রীতি অবলম্বন করে থাকে তবে তার স্বাতন্ত্র্য মেনে নিতে হবে। সেই রীতির মধ্যেও যে উৎকর্ষের স্থান নেই তা বলা চলে না। যদুভট্টদের প্রতিভার প্রথম ভূমিকা এই বিষ্ণুপুরী রীতিতেই; রাধিকা গোস্বামী সম্বন্ধেও সেই কথা বলা চলে। পশ্চিমদেশী শ্রোতারা যদি এই রীতির গান পছন্দ নাও করে, তবে সেটাকেই চরম বিচার বলে মেনে নেওয়া চলে না। রসবোধ সম্বন্ধে মতভেদ অভ্যাসের পার্থক্যের উপর কম নির্ভর করে না। এমনও যদি ঘটে যে, কোনো বিশেষ গায়কের মুখে বিষ্ণুপুরী রীতির গান সত্যই প্রশংসাযোগ্য না হয়ে থাকে, তাতে সাধারণভাবে বিষ্ণুপুরী রীতিকে নিন্দা করা উচিত হয় না। শত শত গায়ক আছে যারা হিন্দুস্থানী দস্তুর-মতোই গান গেয়ে শ্রোতাদেরকে পীড়িত করে, সেজন্যে হিন্দুস্থানী রীতিকে কেউ দায়ী করে না।

আমাদের দেশের কোনো খ্যাতনামা ওস্তাদকে বা বিষ্ণুপুরী রীতিকে কেন আমি বর্তমান আলোচনা-প্রসঙ্গে নিন্দা করতে চাই নে তার কারণ পূর্বেই বললেম। যে তর্ক উপস্থিত হয়েছে তার প্রধান মীমাংসার বিষয় এই যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে সংগীতশিক্ষাবিভাগ গড়ে তোলবার কাজে কে সব চেয়ে যোগ্য ব্যক্তি। আমার মনে সন্দেহমাত্র নেই যে, ভাট্‌খণ্ডেই সেই লোক। ভারতীয় সংগীতবিদ্যা সম্বন্ধে তাঁর যে ভূরিদর্শিতা তা আর কারও নেই, তা ছাড়া তাঁর উদ্ভাবিত

শিক্ষাদানপ্রণালীর অসাধারণ নৈপুণ্য সকলকেই স্বীকার করতে হবে। তিনি গায়ক নন, তিনি গান-শাস্ত্রের মহামহোপাধ্যায়। অন্যত্র তিনি হিন্দুস্থানী গান-শিক্ষার যে ভিত্তি রচনা করেছেন, বাংলাদেশেও যদি তাঁকে সেই ভিত্তি রচনার সুযোগ দেওয়া যায় তবে বিশ্ববিদ্যালয় যথার্থ সফলতালাভ করবেন; এ কাজ তিনি ছাড়া আর কারও দ্বারা সুসম্পূর্ণ হতে পারবে না।

শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে সংগীতের স্থান

বাংলাদেশে আধুনিক যুগের যখন সবে আরম্ভকাল তখন আমি জন্মেছি। পুরাতন যুগের আলো তখন ম্লান হয়ে আসছে কিন্তু একেবারে বিলীন হয় নি। পিছন দিক থেকে কিছু ইঙ্গিতে, কিছু প্রত্যক্ষ, তার কতকটা পরিচয় পেয়েছি। তার মধ্যে জীর্ণ জীবনের বিকার অনেক ছিল, এখনকার আদর্শে বিচার করতে গেলে নানা দিকে তার শৈথিল্য তার দুর্বলতা মনকে লজ্জিত করতে পারে। কিন্তু তখনকার প্রদোষের ছায়ায় এমন-কিছু দেখা গেছে যা অস্তসূর্যের আলোর মতো, সেদিনকার ইতিহাসের রোকড়ের খাতায় তাকে অন্ধকারের কোঠায় ফেলা চলবে না। তার মধ্যে একটি হচ্ছে, সেকালের জীবনযাত্রায় সংগীতের সমাদর।

দেখেছি তখনকার বিশিষ্ট পরিবারে সংগীতবিদ্যার অধিকার বৈদগ্ধ্যের প্রমাণ বলে গণ্য হত। বর্তমান সমাজে ইংরেজির রচনায় বানান বা ব্যাকরণের স্খলনকে যেমন আমরা অশিক্ষার লজ্জাকর পরিচয় বলে চমকে উঠি, তেমনি হত যদি দেখা যেত–সম্মানী পরিবারের কেউ গান শোনাবার সময় সমে মাথা নাড়ায় ভুল করেছে কিংবা ওস্তাদকে রাগরাগিণী ফর্মাশের বেলায় রীত রক্ষা করে নি। তাতে যেন বংশমর্যাদায় দাগ পড়ত। সৌভাগ্যক্রমে তখনো আমাদের সংগীতরাজ্যে বক্‌স হারমোনিয়মের মহামারী কলুষিত করে নি হাওয়াকে। তম্বুরার তারে নিজের হাতে সুর বেঁধে সেটাকে কাঁধে হেলিয়ে আলাপের ভূমিকা দিয়ে যখন বড়ো বড়ো গীতরচয়িতার ধ্রুপদগানে গায়ক নিস্তব্ধ সভা মুখরিত করতেন, সেই ছবির সুগম্ভীর রূপ আজও আমার মনে উজ্জ্বল আছে। দূর প্রদেশ থেকে আমন্ত্রিত গুণীদের সমাদর ক'রে উচ্চ অঙ্গের সংগীতের আসর রচনা করা সেকালে সম্পন্ন অবস্থার লোকের আত্মসম্মানরক্ষার অঙ্গ ছিল। বস্তুত তখনকার সমাজ বিদ্যার যে-কোনো বিষয়কেই শিক্ষণীয় রক্ষণীয় বলে জানত, ধনীরা তাকে বাঁচিয়ে রাখবার দায়িত্বকে গৌরব বলে গ্রহণ করতেন। এই স্বতঃস্বীকৃত ট্যাক্সের জোরেই তখনকার শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা সমাজে উচ্চশিক্ষার পীঠস্থানের সৃষ্টি ও পুষ্টিবিধান করতে পেরেছেন। তখন ধনের অবমাননা ঘটত যদি সমাজের সমস্ত প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখবার মহাসমবায়ে কোনো ধনীর কৃপণতা প্রকাশ পেত। সরস্বতী তখন লক্ষ্মীর দ্বারে ভিক্ষাবৃত্তি করতে এসে মাথা হেঁট করতেন না, লক্ষ্মী স্বয়ং যেতেন ভারতীর দ্বারে অর্ঘ্য নিয়ে নম্রশিরে। এমনি সহজেই আত্মগৌরবের

প্রবর্তনায় ধনীরা দেশে সংগীতের গৌরব রক্ষা করেছেন; সে ছিল তাঁদের সামাজিক কর্তব্য। এর থেকে বোঝা যাবে সংগীতকে তখনকার দিনে সম্মানজনক বিদ্যা বলেই গ্রহণ করেছে।

যে বিদ্যার সঞ্চরণ অক্ষরের ক্ষেত্রে, উপর নীচে তার দুই ভাগ ছিল। এক ছিল শ্রুতি স্মৃতি দর্শন ব্যাকরণের উচ্চ শিখর, আর ছিল জনশিক্ষার নিম্নভূমিবর্তী উপত্যকা। উভয়কেই চিরদিন পালন করে এসেছেন সমাজের গণ্য ব্যক্তিরা। নানা উপলক্ষে তাঁদেরই নিবেদিত দানের নিরন্তর সাহায্যে নিঃস্বপ্রায় অধ্যাপকেরা বিনা বেতনে দুর্গম শাস্ত্রভাণ্ডারের সকল প্রকার বিদ্যা বিতরণ করে এসেছেন। বিশেষ বিশেষ স্থানে এই-সকল বিদ্যার বিশেষ কেন্দ্র ছিল আবার ছোটো আকারে নানা স্থানে নানা গ্রামে এক-একটি ছায়াঘন ফলবান বনস্পতির মতো এরা মাথা তুলেছে। অর্থাৎ দেশের উচ্চ শিক্ষাও দুটি-একটি দূরবর্তী বিশ্ববিদ্যালয়ে নিরুদ্ধ ছিল না, তার দানসত্র ছিল দেশের প্রায় সর্বত্রই। তেমনি আবার প্রাথমিক শিক্ষার জন্য পাঠশালা প্রত্যেক গ্রামের প্রধানদের বৃত্তিতে পালিত এবং তাঁদের দালানে প্রতিষ্ঠিত ছিল, শিক্ষার্থীদের মধ্যে ধনী দরিদ্রের ভেদ ছিল না। এর দায়িত্ব রাজার অধিকারে ছিল না, ছিল সমাজের আপন হাতে। সংগীত সম্বন্ধেও তেমনি ছিল দুই ধারা। উচ্চ সংগীতের ব্যয়সাধ্য চর্চার ক্ষেত্র ছিল ধনশালীদের বৈঠকখানায়। সেই সংগীত সর্বদা কানে পৌঁছত চার দিকের লোকের, গানের সুরসেচনে বাতাস হত অভিষিক্ত। সংগীতে যার স্বাভাবিক অনুরাগ ও ক্ষমতা ছিল সে পেত প্রেরণা, তাতে তার শিক্ষার হত ভূমিকা। যে-সব ধনীদের ঘরে বৃত্তিভোগী গায়ক ছিল তাদের কাছে শিক্ষা পেত কেবল ঘরের লোক নয়, বাইরের লোকও। বস্তুত এই-সকল জায়গা ছিল উচ্চ সংগীত শিক্ষার ছোটো ছোটো কলেজ। বিখ্যাত বাঙালি সংগীতনায়ক যদুভট্ট যখন আমাদের জোড়াসাঁকোর বাড়িতে থাকতেন, নানাবিধ লোক আসত তাঁর কাছে শিখতে; কেউ শিখত মৃদঙ্গের বোল, কেউ শিখত রাগরাগিণীর আলাপ। এই কলরবমুখর জনসমাগমে কোথাও কোনো নিষেধ ছিল না। বিদ্যাকে রক্ষা করবার ও ছড়িয়ে দেবার এই ছিল সহজ উপায়।

এই তো গেল উচ্চ সংগীত। জনসংগীতের প্রবাহ সেও ছিল বহু শাখায়িত। নদীমাতৃক বাংলাদেশের প্রাঙ্গণে প্রাঙ্গণে যেমন ছোটো-বড়ো নদী-নালা স্রোতের জাল বিছিয়ে দিয়েছে, তেমনি বয়েছিল গানের স্রোত নানা ধারায়। বাঙালির হৃদয়ে সে রসের দৌত্য করেছে নানা রূপ ধরে। যাত্রা, পাঁচালি, কথকতা, কবির গান, কীর্তন মুখরিত করে রেখেছিল সমস্ত দেশকে। লোকসংগীতের এত বৈচিত্র্য আর-কোনো দেশে আছে কি না জানি নে। শখের যাত্রা সৃষ্টি করার

উৎসাহ ছিল ধনী-সন্তানদের। এই-সব নানা অঙ্গের গান ধনীরা পালন করতেন, কিন্তু অন্য দেশের বিলাসীদের মতো এ-সমস্ত তাঁদের ধনমর্যাদার বেড়া-দেওয়া নিভৃতে নিজেদেরই সম্ভোগের বস্তু ছিল না। বাল্যকালে আমাদের বাড়িতে নলদময়ন্তীর যাত্রা শুনেছি। উঠোন-জোড়া জাজিম ছিল পাতা-সেখানে যারা সমাগত তাদের অধিকাংশই অপরিচিত, এবং অনেকেই অকিঞ্চন তার প্রমাণ পাওয়া যেত জুতো-চুরির প্রাবল্যে। আমার পিতার পরিচিত ছিল কিশোরী চাটুজ্জে। পূর্ব-বয়সে সে ছিল কোনো পাঁচালির দলের নেতা। সে আমাকে প্রায় বলত, ‘দাদাজি, তোমাকে যদি পাঁচালির দলে পাওয়া যেত তা হলে–’। বাকিটুকু আর ভাষায় প্রকাশ করতে পারত না। বালক দাদাজিরও মন চঞ্চল হয়ে উঠত পাঁচালির দলে খ্যাতি অর্জন করবার অসম্ভব দুরাশায়। পাঁচালির যে গান তার কাছে শুনতুম তার রাগিণী ছিল সনাতন হিন্দুস্থানী, কিন্তু তার সুর বাংলা কাব্যের সঙ্গে মৈত্রী করতে গিয়ে পশ্চিমী ঘাঘরার ঘূর্ণাবর্তকে বাঙালি শাড়ির বাহুল্যবিহীন সহজ বেষ্টনে পরিণত করেছে।–

‘কাতরে রেখো রাঙা পায় মা–
অভয়ে দীনহীন ক্ষীণ জনে যা করো, মা, নিজগুণে–
তারিতে হবে অধীনে, আমি অতি নিরুপায়।’

এই সুর আজও মনে পড়ে। সূর্যের কিরণচ্ছটা বহু লক্ষ যোজন দূর পর্যন্ত উৎসারিত হয়ে ওঠে, এই তার গানের খেলা। আর আমার শ্যামা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল প্রভাতের রুপোলি কল্কা আর সূর্যাস্তকালের সোনালি জরির আঁচ্‌লা নিয়ে তন্বীর গায়ে গায়ে ঘিরে ঘিরে দক্ষিণ হাওয়ায় কাঁপতে থাকে। কিন্তু এও তো ঐশ্বর্য, এও তো চাই।

‘ভালোবাসিবে ব’লে ভালোবাসি নে’

–এতে তানের প্রগল্‌ভতা নেই কিন্তু বেদনা আছে তো। এও যে নিতান্তই চাই সাধারণের জন্যে। শুধু সাধারণের জন্যে কেন বলি, এক সময়ে উচ্চ ঘরের রসনাও তৃপ্তির সঙ্গে এর স্বাদ গ্রহণ করেছে। মেয়েদের অশিক্ষিতপটুত্বের কথা কালিদাস বলেছেন, সরল প্রকৃতির লোকের অশিক্ষিত স্বাদসম্ভোগের কথাটাও সত্য। যে ঘরের পাকশালা দূর পাড়া পর্যন্ত মোগ্‌লাই ভোজের লোভন গন্ধে আমোদিত, সেই ঘরেই বিধবা মাসীমার রাঁধা মশলাবিরল নিরামিষ ব্যঞ্জনের আদর হয়তো তার চেয়েও নিত্য হয়।–

'মনে রইল, সই, মনের বেদনা–
প্রবাসে যখন যায় গো সে
তারে বলি বলি আর বলা হল না।'

–এ যে অত্যন্ত বাঙালির গান। বাঙালির ভাবপ্রবণ হৃদয় অত্যন্ত তৃষিত হয়েই গান চেয়েছিল, তাই সে আপন সহজ গান আপনি সৃষ্টি না করে বাঁচে নি।

তাই আজও দেখতে পাই বাংলা সাহিত্যে গান যখন-তখন যেখানে-সেখানে অনাহূত অনধিকারপ্রবেশ করতে কুণ্ঠিত হয় না।

এতে অন্যদেশীয় অলংকারশাস্ত্রসম্মত রীতিভঙ্গ হয়ে থাকে। কিন্তু আমাদের রীতি আমাদেরই স্বভাবসংগত। তাকে ভর্ৎসনা করি কোন্ প্রাণে? সেদিন আমাদের নটরাজ শিশির ভাদুড়ী মশায় কোনো শোকাবহ অতি গম্ভীর নাটকের জন্য আমার কাছে গান ফর্মাশ করে বসলেন। কোনো বিলাতী নাট্যেশ্বর এমন প্রস্তাব মুখে আনতেন না, মনে করতেন এটা নাট্যকলার মাঝখানে একটা অভ্যুৎপাত। এখনকার ইংরেজি-পোড়োরাও হয়তো এরকম অনিয়মে তর্জনী তুলবেন। আমি তা করি নে, আমি বলি আমাদের আদর্শ আমাদের নিজের মন আপন আনন্দের তাগিদে স্বভাবতই সৃষ্টি করবে। সেই সৃষ্টিতে কলাতত্ত্বের সংযম এবং ছন্দ বাঁচিয়ে চলতে হবে, কিন্তু তার চেহারা যদি সাহেবী ছাঁচের না হয় তবে তকে পিটিয়ে বদল করতেই হবে এ কথা বলতে পারব না। বিদেশী অলংকারশাস্ত্র পড়বার বহু পূর্ব থেকে আমাদের নাট্য, যাকে আমরা যাত্রা বলি, সে তো গানের সুরেই ঢালা। সে যেন বাংলাদেশের ভূসংস্থানেরই মতো; সেখানে স্থলের মধ্যে জলের অধিকারই যেন বেশি। কথকতা, যেটা অলংকারশাস্ত্র-মতে ন্যারেটিভ শ্রেণী-ভুক্ত, তার কাঠামো গদ্যের হলেও স্ত্রীস্বাধীনতা-যুগের মেয়েদের মতোই গীতকলা তার মধ্যে অনায়াসেই অসংকোচে প্রবেশ করত। মনে তো পড়ে–একদিন তাতে মুগ্ধ হয়েছিলুম। সাহিত্যরচনার প্রচলিত পাশ্চাত্য বিধির কথা স্মরণ করে উদ্‌বেল আনন্দকে লজ্জিত হয়ে সংযত করি নি তো।

যাই হোক, আমার বলবার কথা এই যে, আত্মপ্রকাশের জন্যে বাঙালি স্বভাবতই গানকে অত্যন্ত করে চেয়েছে। সেই কারণে সর্বসাধারণে হিন্দুস্থানী সংগীতরীতির একান্ত অনুগত হতে পারে নি। সেইজন্যেই কানাড়া তাড়ানা মালকোষ দরবারী তোড়ির বহুমূল্য গীতোপকরণ থাকা সত্ত্বেও বাঙালিকে কীর্তন সৃষ্টি করতে হয়েছে। গানকে ভালোবেসেছে ব'লেই সে গানকে আদর করে আপন হাতে আপন মনের সঙ্গে মিলিয়ে তৈরি করতে চেয়েছে। তাই, আজ হোক কাল

হোক, বাংলায় গান যে উৎকর্ষ লাভ করবে সে তার আপন রাস্তাতেই করবে, আর-কারও পাথর-জমানো বাঁধা রাস্তায় করবে না।

যে সূত্রে এই প্রবন্ধ রচনা শুরু করেছিলেম, সেই সূত্রটি এইখানে আর-একবার ধরা যাক। দেশের সংস্কৃতিতে সংগীতের প্রাধান্য ছিল, আমাদের বিদায়োন্মুখ পূর্বযুগের দিকে তাকিয়ে সেই কথাটি জানিয়েছে। তার পরে বয়স যতই বাড়তে লাগল ততই অন্য-এক যুগের মধ্যে প্রবেশ করতে লাগলুম, যে যুগে ছেলেরা প্রথম বয়স থেকে কলেজের উচ্চ ডিগ্রির দিকে মাথা উঁচু করে নোট মুখস্থ করতে লেগেছে। তখন গানটাকে সম্মাননীয় বিদ্যা বলে গণ্য করবার ধারণা লুপ্ত হয়ে এল। যে-সব বড়ো ঘরে গাইয়েরা আদর ও আশ্রয় পেয়ে এসেছে সেখানে সংগীতের ভাঙাবাসায় পড়া-মুখস্থ'র গুঞ্জনধ্বনি মুখরিত হয়ে উঠল; তখনকার যুবকদের এমন একটি শুচিবায়ুতে পেয়ে বসল, যাতে দুর্গতিগ্রস্ত গানব্যবসায়ীর চরিত্রের সঙ্গে জড়িত করে গান বিদ্যাটিরই পবিত্র রূপকে বীভৎস বলে কল্পনা করতে লাগল। বাংলাদেশের শিক্ষাবিভাগে সংগীতকে স্বীকার করতে পারে নি। তাই, সংগীতে রুচি অধিকার ও অভিজ্ঞতা না থাকাটাকে অশিক্ষার পরিচয় বলে কোনো লজ্জা বোধ করার কারণ তখনকার শিক্ষিতমণ্ডলীর মনে রইল না। বরঞ্চ সেদিন যে-সব ছেলে, হিতৈষীদের ভয়ে, চাপা গলায় গান গেয়েছে তাদের চরিত্রে হয়েছে সন্দেহ।

অপর পক্ষে সেই সময়টাতে অনেক সৎকাজের সূচনা হয়েছে সে কথা মানতে হবে। তখন আমাদের পলিটিক্স্ সাবধানে দুই কূল বাঁচিয়ে এ দিকে ও দিকে তাকিয়ে মাথা তুলছে, বক্তৃতামঞ্চে ইংরেজি বাণী হাততালি পাচ্ছে, খবরের কাগজের মুখ ফুটতে শুরু করেছে, সাহিত্যে দুই-একজন অগ্রণী পথে বেরিয়েছেন। কিন্তু, দেশে বড়ো বড়ো প্রাচীন সরোবর বুজে গিয়ে তার উপরে আজ যেমন চাষ চলছে, তেমনি তখন সংগীতের রসসঞ্চয় অন্তত শিক্ষিতপাড়ায় প্রায় মরে এসেছে। তার উপরে এগিয়ে চলেছে পাঠ্যপুস্তকের আবাদ।

আপন নীরসতাকে শুচিতা বলে সম্মান দিয়েছিল যে যুগ, সে যে আজও অটল হয়ে আছে তা আমি বলি নে। বাঙালির প্রকৃতি আজ আবার আপন গানের আসর খুঁজে বেড়াচ্ছে, সুরের উপাদান সংগ্রহ করতে সৃষ্টি করছে। দেশের বিদ্যায়তন এই শুভ মুহূর্তে তার আনুকূল্য করবে–একান্ত মনে এই কামনা করি।

দৈবক্রমে যে সুযোগ আমি পেয়েছিলুম সে কথা মনে পড়ছে। আমার ভাগ্যবিধাতাকে আমি নমস্কার করি। আমি যখন জন্ম নিয়েছি তখন আমাদের পরিবারের আশ্রয় জনতার বাইরে।

সমাজে আমরা ব্রাত্য। আমাদের পরিবারে পরীক্ষা-পাসের সাধনা সেদিন গৌরব পায় নি। আমার দাদারা দুই-একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের সিংহদ্বার একটুখানি পেরিয়ে ফিরে এসেছেন ডিগ্রিবর্জিত নিভৃতে। সেটা ভালো করেছেন তা আমি বলি নে। কিন্তু তার ফল হয়েছিল এই যে, ডিগ্রিলাঞ্ছিত শিক্ষা ছাড়া শিক্ষার আর-কোনো পরিচয় গ্রাহ্য নয় এই অন্ধ সংস্কারটা আমাদের ঘরে থাকতেই পারে নি। আমার ভাইরা দিনরাত নিজের ভাষায় তত্ত্বালোচনা করেছেন, কাব্যরসআস্বাদনে ও উদ্ভাবনে তাঁরা ছিলেন নিবিষ্ট, চিত্রকলাও ইতস্তত অঙ্কুরিত হয়ে উঠেছে, তার উপরে নাট্যাভিনয়ে কারও কোনো সংকোচমাত্র ছিল না। আর, সমস্ত ছাড়িয়ে উঠেছিল সংগীত। বাঙালির স্বাভাবিক গীতমুগ্ধতা ও গীতমুখরতা কোনো বাধা না পেয়ে আমাদের ঘরে যেন উৎসের মতো উৎসারিত হয়েছিল। বিষ্ণু ছিলেন ধ্রুপদীগানের বিখ্যাত গায়ক। প্রত্যহ শুনেছি সকালে-সন্ধ্যায় উৎসবে-আমোদে উপাসনামন্দিরে তাঁর গান, ঘরে ঘরে আমার আত্মীয়েরা তম্বুরা কাঁধে নিয়ে তাঁর কাছে গান চর্চা করেছেন, আমার দাদারা তানসেন প্রভৃতি গুণীর রচিত গানগুলিকে আমন্ত্রণ করেছেন বাংলা ভাষায়। এর মধ্যে বিস্ময়ের ব্যাপার এই-চিরাভ্যস্ত সেই-সব প্রাচীন গানের নিবিড় আবহাওয়ার মধ্যে থেকেও তাঁরা আপন-মনে যে-সব গান রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন তার রূপ তার ধারা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, গীতপণ্ডিতদের কাছে তা অবজ্ঞার যোগ্য। রাগরাগিণীর বিশুদ্ধতা নষ্ট করে এখানেও তাঁরা ব্রাত্যশ্রেণীতে ভুক্ত হয়েছেন।

গান বাজনা নাট্যকলাকে অক্ষুণ্ন সম্মান দেবার যে দীক্ষা পেয়েছিলেম তার একটা বিশেষ পরিচয় দিই। আমার ভাইঝিরা শিশুকাল থেকে উচ্চ অঙ্গের গান বিশেষ যত্নে শিখেছিলেন। সেটা তখনকার দিনে নিন্দার্হ না হলেও বিস্ময়ের বিষয় ছিল। আমাদের বাড়ির প্রাঙ্গণে প্রকাশ্য নাট্যমঞ্চে তাঁরা যেদিন গান গেয়েছিলেন সেদিন সামাজিক হাওয়া ভিতরে-ভিতরে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিল। সৌভাগ্যক্রমে তখনকার দিনের খবরের কাগজের বিষদাঁত আজকের মতো এমন উগ্র হয় নি। তা হলে অপমান মারাত্মক হয়ে উঠত। তার পরে এই-জাতীয় অত্যাচার আরও ঘটেছিল। এর চেয়ে উচ্চ সপ্তকে নিন্দা পেয়েও সংকোচ বোধ করি নি। তার কারণ, কেবলমাত্র কলেজি বিদ্যাকে নয়, সকল বিদ্যাকেই শ্রদ্ধা করবার অভ্যাস আমাদের পরিবারে প্রচলিত ছিল।

আমাদের দেশের শিক্ষাবিভাগ কলাবিদ্যার সম্মানকে শিক্ষিত মনে স্বাভাবিক ক'রে দেবেন এই নিবেদন উপস্থিত করবার অভিপ্রায়ে এই ভূমিকামাত্র আজ প্রস্তুত করে এনেছি। আর যা-কিছু আমার করবার আছে সে নানা অসামর্থ্য সত্ত্বেও আমার বিদ্যালয়ে আমি প্রবর্তিত করেছি।

মানুষ কেবল বৈজ্ঞানিক সত্যকে আবিষ্কার করে নি, অনির্বচনীয়কে উপলব্ধি করেছে। আদিকাল থেকে মানুষের সেই প্রকাশের দান প্রভূত ও মহার্ঘ। পূর্ণতার আবির্ভাব মানুষ যেখানেই দেখেছে–কথায়, সুরে, রেখায়, বর্ণে, ছন্দে, মানবসম্বন্ধের মাধুর্যে, বীর্যে–সেইখানেই সে আপন আনন্দের সাক্ষ্যকে অমরবাণীতে স্বাক্ষরিত করেছে। শিক্ষার্থী যারা, তারা সেই বাণী থেকে বঞ্চিত না হোক এই আমি কামনা করি। শুধু উপভোগ করবার উদ্দেশে জগতে জন্মগ্রহণ ক'রে, সুন্দরকে দেখেছি, মহৎকে পেয়েছি, ভালোবেসেছি ভালোবাসার ধনকে–এই কথাটি মানুষকে জানিয়ে যাবার অধিকার ও শক্তি দান করতে পারে এমন শিক্ষার সুযোগ পেয়ে দেশ ধন্য হোক–দেশের সুখ দুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষা অমৃত-অভিষিক্ত গীতলোকে অমরত্ব লাভ করুক।

কথা ও সুর

সুরের মহলে কথাকে ভদ্র আসন দিলে তাতে সংগীতের খর্বতা ঘটে কি না এই নিয়ে কথা-কাটাকাটি চলছে। বিচারকালে সম্পাদক বলছেন আসামীর বক্তব্য শোনা উচিত। সংগীতের বড়ো আদালতে আসামী শ্রেণীতে আমার নাম উঠেছে অনেক দিন থেকে। আত্মপক্ষে আমার যা বলবার সংক্ষেপে বলব। আমার শক্তি ক্ষীণ, সময় অল্প, বিদ্যাও বেশি নেই। আমি যে শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে থাকি সে বিশেষভাবে সংগীতশাস্ত্রও নয়, কাব্যশাস্ত্রও নয়, তাকে বলে ললিতকলাশাস্ত্র–সংগীত ও কাব্য দু'ই তার অন্তর্গত।

কালিদাস রঘুবংশে বলেছেন বাক্য এবং অর্থ একত্রে সম্পৃক্ত। কিন্তু যে বাক্য কাব্যের উপাদান, অর্থকে সে অনর্থ করে দিয়ে তবে নিজের কাজ চালাতে পারে। তার প্রধান কারবার অনির্বচনীয়কে নিয়ে, অর্থের অতীতকে নিয়ে। কথাকে পদে পদে আড় করে দিয়ে ছন্দের মন্ত্র লাগিয়ে অনির্বচনীয়ের জাদু লাগানো হয় কাব্যে, সেই ইন্দ্রজালে বাক্য সুরের সমান ধর্ম লাভ করে। তখন সে হয় সংগীতেরই সমজাতীয়। এই সংগীত-রসপ্রধান কাব্যকে ইংরেজিতে বলে লিরিক, অর্থাৎ তাকে গান গাবার যোগ্য বলে স্বীকার করে। একদা এই-জাতীয় কবিতা সুরেই সম্পূর্ণতা লাভ করত। কবিতর এই সম্মিলিত সম্পূর্ণ রূপ সেদিন গান বলেই গণ্য হত, বৈদিক কালে যেমন সাম-গান।

সুরসম্মিলিত কাব্যের যুগলরূপের সঙ্গে সঙ্গেই সুরহীন কাব্যের স্বতন্ত্ররূপ অনেক দিন থেকেই আসছে। অপেক্ষাকৃত পরে যন্ত্রের সাহায্যে গানের স্বাতন্ত্র্যও ক্রমে উদ্ভাবিত হল। স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে এদের যে বিশেষ পরিচয় উন্মুক্ত হয়েছে সেটা মূল্যবান সন্দেহ নেই, কিন্তু তাই তাদের পরস্পরের সঙ্গ ঠেকাবার জন্যে জেনেনা-রীতি চালাতেই হবে এমন গোঁড়ামি মানতে পারব না।

শুনেছি চরক-সংহিতায় বলেছে তাকেই বলে ভেষজ যাতে হয় আরোগ্য। যারা চিরকাল একমাত্র অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসায় আসক্ত তাদের মতে তাকেই বলে ভেষজ যা অ্যালোপ্যাথিক মেটিরিয়া মেডিকার ফর্দ-ভুক্ত। বৈদ্যশাস্ত্রমতে বড়ি খেয়ে যে লোকটা বলে 'আরাম পেলুম'; তাকে ওরা অশাস্ত্রীয় গ্রাম্য বলেই ধরে নেয়। তারা বলে ডাক্তারি মতেই আরাম হওয়া উচিত, অন্য মতে কদাচ নয়।

সাংগীতিক চরক-সংহিতার মতে তাকেই বলে সংগীত যার থেকে গীতরস পাওয়া যায় কিন্তু ওস্তাদের সাক্রেদ্‌রা বলে সেটাই সংগীত যেটা গাওয়া হয় হিন্দুস্থানী কায়দায়। ঐ কায়দার বাইরে যে গীতকলা পা ফেলে তাকে ওরা বলে স্বৈরিণী, সাধুসমাজের সে বা'র। সমজদারের খাতায় যারা নাম রাখতে চায়, অন্যশ্রেণীর গানে রস পাওয়াই তাদের পক্ষে ভদ্ররীতিবিরুদ্ধ। কিন্তু, আমরা চরক-সংহিতার সঙ্গে মিলিয়ে বলব–গানের রস যেখানে পাই সেখানেই সংগীত, কথার সঙ্গে তার বিশেষ মৈত্রী থাক্‌ বা না থাক্‌। ভালো কারিগরের হাতে শিল্পীত প্রদীপের মুখে শিক্ষা জ্বলে উঠে উৎসবসভা আলোকিত করল। সেই শিখার আলোককে আলোই বলব, সেইসঙ্গেই গুণীর হাতে গড়া প্রদীপটাকেও বাহবা দিলে দোষের হয় না। বস্তুত প্রদীপটা আলোককেই সম্মান দিয়েছে, আর ঐ প্রদীপেরও মুখ উজ্জ্বল করেছে আলোকে। যাঁরা এ রকম সম্মানের ভাগাভাগিকে সংগীতের জাতিনাশ বলে রাগ করেন তাঁরা জ্বালুন-না মশাল–তার বাহনটা নগণ্য হোক, তবু তার আলোর গৌরব মানতে দ্বিধা করব না।

'কারি কারি কমরিয়া গুরুজি মোকো মোল দে' –

অর্থাৎ, 'কালো কালো কম্বল গুরুজি আমাকে কিনে দে'। এটা হল মোটা মশাল, এর চূড়ার উপরে জ্বলছে পরজরাগিণীর আলো; মশালটার কথা মনেও থাকে না। কিন্তু কারুখচিত বাণী সমগ্র গানকে যদি শোভন করে তোলে তা হলে কোনো দিক থেকে মূল্যের কিছু হ্রাস পেতে পারে বলে তো মনে করি নে।

এর পরে তর্ক উঠবে, বাক্যের অনুগত হলে সংগীতে তার পুরো পরিমাণ চালচলন তানকর্তবের ব্যাঘাত হবার কথা। এ সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, স্বক্ষেত্রের বাহিরে আর-কিছুরই অনুগত হওয়া সংগীতের পক্ষে দোষের এ কথা মানি। আমরা যে গানের আদর্শ মনে রেখেছি তাতে কথা ও সুরের সাহচর্যই শ্রদ্ধেয়, কোনো পক্ষেরই আনুগত্য বৈধ নয়। সেখানে সুর যেমন বাক্যকে মানে, তেমনি বাক্যও সুরকে অতিক্রম করে না। কেননা, অতিক্রমণের দ্বারা সমগ্র সৃষ্টির সামঞ্জস্য নষ্ট করা কলারীতিবিরুদ্ধ। যে বিশেষ শ্রেণীর সংগীতে বাক্য ও সুর দুইয়ে মিলে রসসৃষ্টির ভার নিয়েছে সেখানে আপন গৌরব রক্ষা করেও উভয়ের পদক্ষেপ উভয়ের গতি বাঁচিয়ে চলতে বাধ্য। এই পন্থার অনুসারী বিশেষ কলানৈপুণ্য এই শ্রেণীর সংগীতেরই অঙ্গ।

কিন্তু, এমনতরো বাঁচিয়ে চলতে হলে তানকর্তব পল্লবিত করার ব্যাঘাত হতে পারে। এ ভাবনা নিয়ে অন্তত তানসেন অত্যন্ত উদ্‌বিগ্ন হন নি। সংগীত মাত্রই সোরি মিঞার পদানুবর্তী

নয়। অধিকাংশ ধ্রুপদ গানের বাক্যের ঠাসবুনানির মধ্যে অলংকারবাহুল্য স্থান পায় না, শোভাও পায় না। এই স্বরসংযমে তার গৌরব বাড়িয়েছে। ধ্রুপদের এই বিশেষত্ব।

আধুনিক বাংলাগানও একটি স্বাভাবিক বিশেষত্ব নিয়েছে। এই সংগীতে কথাশিল্প ও সুরশিল্পের মিলনে একটি অপরূপ সৃষ্টিশক্তি রূপ নিতে চাচ্ছে। এই সৃষ্টিতে হিন্দুস্থানী কায়দা আপনপুরো সেলামি পাবে না, যেমন পায় নি বাংলার কীর্তন-গানে। তৎসত্ত্বেও বাংলাগানের নূতন ঠাট বাংলার বাহিরের শ্রোতাদের মনে বিশেষ একটি আনন্দ দিয়ে থাকে এ আমাদের পরীক্ষিত। দেয় না তাঁদেরই, সংগীত-ব্যবসায়িকতার বাঁধা বেড়ার মধ্যে যাঁদের মন সঞ্চরণে অভ্যস্ত।

অভিভাষণ

‘সংগীতসংঘ’

১৭ মার্চ [১৯২২] তারিখে য়ুনিভার্সিটি ইনসটিটিউট হলে সংগীতসংঘের পুরস্কার বিতরণসভায় কথিত

যিনি এই সংগীতসংঘের প্রতিষ্ঠাত্রী সেই প্রতিভা আজ পরলোকে। বাল্যকালে প্রতিভা আর আমি একসঙ্গে মানুষ হয়েছিলুম। তখন আমাদের বাড়িতে সংগীতের উৎস নিরন্তর প্রবাহিত হত। প্রতিভার জীবনারম্ভকাল সেই সংগীতের অভিষেকে অভিষিক্ত হয়েছিল। সেই সংগীত শুধু যে তাঁর কণ্ঠে আশ্রয় নিয়েছিল তা নয়, এ তাঁর প্রাণকে পরিপূর্ণ করেছিল। এরই মাধুর্যপ্রবাহ তাঁর জীবনের সমস্ত কর্মকে প্লাবিত করেছে। তাঁর চরিত্রে যে ধৈর্য ছিল, শান্তি ছিল, নম্রতা ছিল, সংযমের যে গাম্ভীর্য ছিল, তার সুর লয় ছিল যেন সেই সংগীতের মধ্যে। সেই সংগীতের মাধুর্যই তাঁর স্বাভাবিক ভগবদ্‌ভক্তিতে নিয়ত প্রকাশ পেত এবং এই সংগীতের প্রভাব সাধ্বী স্ত্রীর সমস্ত কর্তব্যকে সুন্দর করে তুলেছিল।

আমার বিশ্বাস যে, সংগীত কেবল চিত্তবিনোদনের উপকরণ নয়; তা আমাদের মনে সুর বেঁধে দেয়, জীবনকে একটি অভাবনীয় সৌন্দর্য দান করে। আমি তাই মনে করি যে, এই সংগীতসংঘের প্রতিষ্ঠা প্রতিভার জীবনের শ্রেষ্ঠ দান। তাঁর আমরণকালের সাধনাকে তিনি এই সংঘে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। এখানে যে সংগীতের উৎস উৎসারিত হবে তা বাংলাদেশের নানা গৃহে প্রবাহিত হয়ে আমাদের দেশের প্রাণে মধু সঞ্চার করবে। এমনি করে এই গানের প্রবাহই তাঁর জীবনের স্মৃতিকে বহন করতে থাকবে। এর চেয়ে তাঁর স্মৃতিরক্ষার শ্রেষ্ঠতর উপায় হতে পারে না। তিনি দেশের হৃদয়ের মধ্যে তাঁর জীবনের এই বাণীকে স্বয়ং স্থাপিত করেছেন।

যাঁরা আজ সংগীত ও বাদ্য দিয়ে আমাদের আনন্দ দান করলেন, তাঁদের আমি আশীর্বাদ করছি। সংগীতের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বীণাপাণির পদ্মবনে তাঁরা মধু আহরণ করতে এসেছেন– তাঁদের সাধনা সার্থক হোক, মাধুর্যের অমৃতরসের দ্বারা তাঁরা দেশের চিত্তে শক্তি সঞ্চারিত করুন। অনেকের ধারণা আছে যে, বুঝি লড়াই করে দ্বন্দ্বসংঘর্ষের মধ্য দিয়েই শক্তি প্রকাশিত হয়। তারা এ কথা স্বীকার করে না যে, সৌন্দর্য মানুষের বীর্যের প্রধান সহায়। বসন্তকালে

গাছপালার যে নবকিশলয়ের উদ্‌গম হয় তা যেমন তার অনাবশ্যক বিলাসিতা নয়, বাস্তবিক পক্ষে সে যেমন তার বড়ো সৃষ্টির একটি প্রক্রিয়া, তেমনি বড়ো বড়ো জাতির জীবনে যে রসসৌন্দর্যের বিস্তার হয়েছে তা তাদের পরিপুষ্টিরই উপকরণ জুগিয়েছে। এই-সকল রসই জাতির জীবনকে নিত্য নবীন করে রাখে, তাকে জরার আক্রমণ থেকে বাঁচায়, অমরাবতীর সঙ্গে মর্ত্যলোকের যোগ স্থাপন করে, এই রসসৌন্দর্যই মানবচিত্তে আধ্যাত্মিক পূর্ণতায় বিকশিত হয়। পিপাসার জল আহরণ ও অন্ন বিতরণের ভার নারীদের উপরেই। তেমনি আমাদের মনের মধ্যে সংগীতের যে রসপিপাসা আছে তাও পরিতৃপ্ত করবার ভার যদি নারীরাই গ্রহণ করেন তা হলেই সেটা শোভন হয়। জীবের জীবনের ভার মেয়েদের উপর। কিন্তু, কেবল দেহেরই নয়, মনেরও জীবন আছে; এই সংগীত হচ্ছে তারই তৃষ্ণার একটি পানীয়–এই পানীয়ের দ্বারা মনের প্রাণশক্তি সতেজ হয়ে ওঠে।

জীবন নীরস হলে সঙ্গে সঙ্গে তা নির্বীয হয়ে পড়ে। কিন্তু, শুষ্কতার কঠোরতাই যে বীর্য এমন কথা আমাদের দেশে প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায়। অবশ্য, বাহিরে বীর্যের যে প্রকাশ সেটা প্রকাশের মধ্যে একটা কঠিন দিক আছে, কিন্তু অন্তরের যে পূর্ণতা সেই কাঠিন্যকে রক্ষা করে সেই পূর্ণতার পরিপুষ্টি কোথা থেকে? এ হচ্ছে আনন্দরস থেকে। সেইটে চোখে ধরা পড়ে না বলে তাকে আমরা অগ্রাহ্য করি, অবজ্ঞা করি, তাকে বিলাসের অঙ্গ বলে কল্পনা করি।

গাছের গুঁড়ির কাষ্ঠ অংশটাকে দিয়েই তো গাছের শক্তি ও সম্পদের হিসাব করলে চলবে না। সেটাকে খুব স্থূলরূপে স্পষ্ট করে দেখা যায় সন্দেহ নেই; আর গূঢ়ভাবে তার অণুতে অণুতে যে রস সঞ্চারিত হয়, যে রসের সঞ্চারণই হচ্ছে গাছের যথার্থ প্রাণশক্তি, সেটা স্থূল নয়, কঠিন নয়, বাহিরে সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষ নয় বলেই তাকে খর্ব করা সত্যদৃষ্টির অভাব-বশতই ঘটে। গুঁড়ির সত্যটা রসের সত্যের চেয়ে বড়ো নয়, গুঁড়ির সত্য রসের সত্যের উপরেই নির্ভর করে–এই কথাটা আমাদের মনে রাখতে হবে।

যখন দেখতে পাব যে আমাদের দেশে সংগীত ও সাহিত্যের ধারা বন্ধ হয়েছে, তখন বুঝব দেশে প্রাণশক্তির স্রোতও অবরুদ্ধ হয়ে গেছে। সেই প্রাণশক্তিকে নানা শাখা-প্রশাখায় পূর্ণভাবে বহমান করে রাখবার জন্যেই, বিশ্বের গভীর কেন্দ্র থেকে যে অমৃত-রসধারা উৎসারিত হচ্ছে তাকে আমাদের আবাহন করে আনতে হবে। ভগীরথ যেমন ভস্মীভূত সগরসন্তানদের বাঁচাবার জন্যে পুণ্যতোয়া গঙ্গাকে মর্ত্যে আমন্ত্রণ করে এনেছিলেন, তেমনি মানসলোকের ভগীরথেরা

প্রাণহীনতার মধ্যে অমৃতত্ব সঞ্চারিত করবার জন্য আনন্দরসের বিচিত্র ধারাকে বহন করে আনবেন।

সমস্ত বড়ো বড়ো জাতির মধ্যেই এই কাজ চলছে। চলছে বলেই তারা বড়ো। পার্লামেন্টে, বাণিজ্যের হাটে, যুদ্ধের মাঠে, তাঁরা বুক ফুলিয়ে তাল ঠুকে বেড়ান বলেই তাঁরা বড়ো তা নয়। তাঁরা সাহিত্যে সংগীতে কলাবিদ্যায় সকল দেশের মানুষের জন্যে সকল কালের রসস্রোত নিত্যপ্রবহমান করে রাখছেন বলেই বড়ো।

ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ

বিদেশযাত্রার প্রাক্‌কালে প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রগণের অভিনন্দনে কথিত বক্তৃতার একাংশ

বাংলাদেশের নতুন একটা ভাব গ্রহণ করবার সাহস ও শক্তি আছে এবং আমরা তা বুঝিও সহজে। কেননা অভ্যাসের জড়তার বাধা আমরা পাই না। এটা আমাদের গর্বের বিষয়। নতুন ভাব গ্রহণ করা সম্বন্ধে বুদ্ধির দিক থেকে বাধা পড়লে ক্ষতি নেই, কিন্তু জড় অভ্যাসের বাধা পাওয়া বড়ো দুর্ভাগ্যের বিষয়। এই জড় অভ্যাসের বাধা অন্য প্রদেশের চেয়ে বাংলাদেশে কম বলে আমি মনে করি। প্রাচীন ইতিহাসেও তাই। বাংলায় যত ধর্মবিপ্লব হয়েছে তার মধ্যেও বাংলা নিজমাহাত্মের বিশিষ্ট প্রকাশ দেখিয়েছে। এখানে বৌদ্ধধর্ম বৈষ্ণবধর্ম বাংলার যা বিশেষ রূপ, গৌড়ীয় রূপ, তাই প্রকাশ করেছে। আর-একটা খুব বিস্ময়কর জিনিস দেখানো যায়– হিন্দুস্থানী গান বাংলায় আমল পায় নি। এটা আমাদের দৈন্য হতে পারে। অনেক ওস্তাদ আসেন বটে গোয়ালিয়র হতে, পশ্চিমদেশ দক্ষিণদেশ হতে, যাঁরা আমাদের গান বাদ্য শেখাতে পারেন, কিন্তু আমরা সে-সব গ্রহণ করি নি। কেননা আমাদের জীবনের স্রোতের সঙ্গে তা মেলে না। আকবর শা'র সভায় তানসেন যে গান গাইতেন সাম্রাজ্যমদগর্বিত সম্রাটের কাছে তা উপভোগের জিনিস হতে পারে, কিন্তু আমাদের আপনার হতে পারে না। তার মধ্যে যে কারুনৈপুণ্য ও আশ্চর্য শক্তিমত্তা আছে তাকে আমরা ত্যাগ করতে পারি নে, কিন্তু তাকে আমাদের সঙ্গে মিশ খাইয়ে নেওয়া কঠিন। অবশ্য, নিজের দৈন্য নিয়ে বাংলাদেশ চুপ করে থাকে নি। বাংলা কি গান গায় নি? বাংলা এমন গান গাইলে যাকে আমরা বলি কীর্তন। বাংলার সংগীত সমস্ত প্রথা–সংগীতসম্বন্ধীয় চিরাগত প্রথার নিগড় ছিন্ন করেছিল। দশকুশী বিশকুশী কত তালই বেরোল, হিন্দুস্থানী তালের সঙ্গে তার কোনোই যোগ নেই। খোল একটা বেরোল, যার সঙ্গে পাখোয়াজের কোনো মিল নেই। কিন্তু, কেউ বললে না এটা গ্রাম্য বা অসাধু। একেবারে মেতে গেল সব–নেচে কুঁদে হেসে ভাসিয়ে দিলে। কত বড়ো কথা! অন্য প্রদেশে তো এমন হয় নি। সেখানে হাজার-বৎসর আগেকার পাথরে-গাঁথা কীর্তিসমূহ যেমন আকাশের আলোককে অবরুদ্ধ করে রেখেছে, তেমনি সংগীত সম্বন্ধেও সজীব চেষ্টা প্রতিহত হয়েছে। বাংলাদেশের

সাহস আছে, সে মানে নি চিরাগত প্রথাকে। সে বলেছে, ‘আমার গান আমি গাইব।’সাহিত্যেও তাই। এখানে হয়তো অত্যুক্তি করবার একটা ইচ্ছা হতে পারে, কেননা আমি নিজে সাহিত্যিক বলে গর্বানুভব করতে পারি। ছন্দ ও ভাব সম্বন্ধে আমাদের গীতিকাব্য যে-একটা স্বাতন্ত্র্য ও সাহসিকতা দেখিয়েছে অন্য দেশে তা নেই। হয়তো আমার অজ্ঞতাবশত আমি ভুল করেও থাকতে পারি–কোনো কোনো হিন্দিগান আমি শুনেছি যাতে আশ্চর্য গভীরতা ও কাব্যকলা আছে, কিন্তু আমার বিশ্বাস আমাদের বৈষ্ণব কবিরা ছন্দ ও ভাব সম্বন্ধে খুব দুঃসাহসিকতা দেখিয়েছেন। প্রচলিত শব্দ ভেঙে চুরে বা একেবারে অগ্রাহ্য করে–যাতে তাঁদের সংগীত ধ্বনিত হয়, ভাবের স্রোত উদ্‌বেল হয়ে ওঠে, তেমনি শব্দ তাঁরা তৈরি করেছেন। আমি তুলনা করে কিছু বলব না, কেননা আমি সকল প্রদেশের সাহিত্যের কথা জানি নে। কিন্তু, গান সম্বন্ধে আমার কোনো সন্দেহ নেই যে, বাংলাদেশ আপনার গান আপনি গেয়েছে। ভারতবর্ষের অন্যত্র যা সম্পদ আছে তা আমরা নিশ্চয়ই গ্রহণ করব, কিন্তু তুলনা-দ্বারা মূল্যবানের যথার্থ মূল্য যাচাই করে নেব। সুতরাং হিন্দুস্থানী সংগীত শিক্ষা দেবার আমি পক্ষপাতী, কিন্তু এ কথা আমি বলব না যে–‘যা হয়ে গেছে তা আর হবে না।’হয়তো সেটাই উৎকৃষ্ট মনে করে কিছুদিন তার অনুবর্তিতা করতেও পারি, কিন্তু তা টিঁকবে না। তাকে নিজস্ব করে, জীবনের স্রোতের কলধ্বনির সঙ্গে সুর বেঁধে নিয়ে ব্যবহার করতে হবে–নইলে তা টিঁকবে না। আগেও হিন্দুস্থানী গানের চর্চা হয়েছে বটে, কিন্তু তেমন করে নেয় নি। আমাদের দেশের শৌখিন ধনী লোকেরা হিন্দুস্থানী গায়কদের আহ্বান করে আনতেন, কিন্তু বাংলার হৃদয়ের অন্তঃপুরে সে গান প্রবেশ করে নি–যেমন বাউল আর কীর্তন এ দেশকে প্লাবিত করে দিয়েছিল।

নিখিলবঙ্গসংগীতসম্মেলন

২৭ ডিসেম্বর ১৯৩৪, ১১ পৌষ ১৩৪১ তারিখে কলিকাতা সিনেট হাউসে অল বেঙ্গল মিউজিক কন্‌ফারেন্সের উদ্‌বোধন-বক্তৃতা

আজ এখানে এসে আমি শুধু এই কথাই বলব যে, এখানে আমার বলার কী যোগ্যতা আছে। বস্তুত যাকে ধ্রুবপদ্ধতি-সংগীত বলা হয় সে সম্বন্ধে স্বীকার করতেই হবে যে, আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সংকীর্ণ-সেইজন্য আজকের দিনে এই সভায় অবতরণিকার কর্তব্যের ভার যে আমি নিয়েছি তার দায়িত্ব তাঁদের যাঁরা এই ভার দিয়েছেন।

এখানে প্রবেশ করবার প্রারম্ভে আমার কোনো তরুণ বন্ধু অনুরোধ করেছেন সংগীত সম্বন্ধে আমার যা মত তা দীর্ঘ করে এই সুযোগে যেন ব্যাখ্যা করি। তাঁর অনুরোধ পালন করা নানা কারণে আমার অসাধ্য হবে। আজ সকালেই আমি আর- একটি কর্তব্য পালন করে এসেছি- প্রবাসীবঙ্গসাহিত্যসম্মেলনের উদ্‌বোধন করে; সেখানে তেমন কুণ্ঠা বোধ করি নি, কেননা তাতে আমি অভ্যস্ত। সেখানের যত সুখ, যত দুঃখ, যত খ্যাতি, যত অখ্যাতি, তা আজ পঞ্চাশ বৎসর ধরে বরণ করে এসেছি। সেখানে গিয়ে আমাকে পড়তে হয়েছে, তাতে দুর্বল শ্বাসযন্ত্রের প্রতি অত্যাচার হয়েছে। আর অত্যাচার করলে ধর্মঘটের আশঙ্কা আছে।

দ্বিতীয় কথা, সংগীত এমন একটি বিষয় যা নিয়ে সংসারে প্রায়ই পণ্ডিতে পণ্ডিতে এমন দ্বন্দ্ব বাধে যার সমাপ্তি হয় অপঘাতে। অনেক সময় তম্বুরা গদার কার্য করে-সুরাসুরের এমন যুদ্ধ বাধে যা প্রায় য়ুরোপের মহাযুদ্ধের সমকক্ষ। প্রাচীনকালে সংগীত বিষয়ে যে যা বলেছেন সে সম্বন্ধে জ্ঞানের গভীরতা আমার নাই, কাজেই সে সমস্যা আমি এখানে তুলব না। পরবর্তী বক্তারা সে সম্বন্ধে বলবেন। আমি সাধারণভাবে বললে সকলের কাছে তা গ্রাহ্য হবে কিনা জানি না, কিন্তু প্রাচীন শাস্ত্রের প্রতি অশ্রদ্ধা না করে আমার মন্তব্য সরল ভাষায় বলব।

সংগীত একটি প্রাণধর্মী জিনিস এবং প্রাণের প্রকাশ তার মধ্যে আছে এ কথা বলা বাহুল্য। চতুর্দিকের [পারিপার্শ্বিকের] ক্রিয়াবান প্রত্যুত্তর এবং [সে] যা পেয়েছে তার চেয়ে বেশি কিছু পাবার জন্য অন্তরের দাবি, প্রেরণা-এই দুইটি লক্ষণকে মিলিয়ে সংগীতের তত্ত্বকে প্রয়োগ করতে ইচ্ছা করি। যে স্পর্শ আমাদের প্রতিনিয়ত হচ্ছে তারই প্রত্যুত্তররূপে আমাদের চিত্ত থেকে

এটা প্রকাশ পায়। প্রাণের যে ধর্ম, সংগীতেরও হবে সেই ধর্ম। তা যদি হয় তা হলে আমাদের এ কথা চিন্তা করতে হবেই যে ক্রমাগত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে প্রাণের যে গতি প্রতিনিয়ত অগ্রসর হচ্ছে তার কল্লোল, তার ধ্বনি, একটা কোনো নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকতে পারে না। এক সময় মোগলের আমলে রাজৈশ্বর্য যখন উচ্ছ্বসিত–সেই সময় তানসেন প্রভৃতি সুধীগণ সংগীতের যে রূপ দিয়েছিলেন তা তৎকালীন সাম্রাজ্যের সহিত জড়িত। তখনকার কালে শ্রোতাদের কানে যে গান যথার্থ তাঁদের নিজের অন্তরের জিনিস হবে, সেই গানই তাঁরা উপহার দিয়েছিলেন। তা তৎকালীন পারিপার্শ্বি[কের] ক্রিয়াবান প্রত্যুত্তর। সেই surroundings যে আজকে নেই এ কথা নিঃসন্দেহ। বৈদিক যুগে এক রকম সংগীত ছিল–'সামগান'। সেই সামগান নিঃসন্দেহে তখনকার যাঁরা সাধক ছিলেন তাঁদের হৃদয় থেকে উচ্ছ্বসিত হয়েছিল–বিশেষ রূপ নিয়ে তখনকার ক্রিয়াকর্ম যজ্ঞে তা রসরূপ পেয়েছে ও পূর্ণতা লাভ করেছে। পরবর্তীকালে তা এত দূরে গিয়ে পড়েছে যে তখনকার সেই সামগান কিরকম ছিল তা আমরা নিঃসংশয়ে বলতে পারি না। তার পর এল কালিদাস বিক্রমাদিত্যের যুগ। তখনকার সংগীত নৃত্য গীত বিশেষত্ব লাভ করেছিল সেই সময়কার গভীর সাম্রাজ্যগৌরব এবং আবেষ্টনীর মধ্য দিয়ে। আনন্দ যখন হয়ে উঠেছিল অভ্রভেদী, তখন তারই অনুরূপ সংগীত যে জন্মেছিল তাতে সন্দেহ নেই।

কিন্তু বাংলাদেশের একটা বিশেষত্ব আছে; বাঙালি ভাবপ্রবণ জাতি। এই ভাবের উচ্ছ্বাস যখন প্রবল হয়ে ওঠে তখন সে আপনাকে প্রকাশ করে। তার প্রকৃতিতে যখন উদ্‌বৃত্ত হয়, তখন সেই শক্তি যায় [বিসর্জনের] দিকে। পরিমিতভাবে যখন ফলে তখন আপনাকে সে প্রকাশের সম্পদ পায় না। সেই হৃদয়াবেগ যখন তীর ছাপায় তখন সে উচ্ছ্বাসকে সে গানে নৃত্যে উচ্ছ্বসিত করে। দেখুন বৈষ্ণব-সংগীত–সমস্ত হিন্দুস্থানী সংগীতকে পিছনে ফেলে বাঙালির প্রাণ আপনার সংগীতকে উদ্‌ভাসিত করেছে, যেহেতু তার ভেতরের হৃদয়াবেগ সহজ মাত্রা ছাড়িয়ে উঠেছিল, আপনাকে প্রকাশ না করে পারে নি। যে কীর্তন বাঙালি গেয়েছিল তা তৎকালীন পারিপার্শ্বি[কের] ক্রিয়াবান প্রত্যুত্তর। সে তার প্রাণের ধর্ম প্রকাশ করেছে এবং আরো পাবার জন্য দাবি করেছে। এটা আমার কাছে গৌরবের বিষয় বলে মনে হয়। বাইরের স্পর্শে যেই কোনো উদ্দীপনা তাকে জাগিয়ে তুলেছে, অমনি সে সৃষ্টির জন্য উদ্‌গ্রীব হয়েছে। সাহিত্য তার প্রমাণ। আজকের দিনে বাঙালি–যে বাঙালি একদিন কীর্তনের মধ্যে, লোকসংগীতের মধ্যে বিশেষত্ব প্রকাশ করেছে–সে কি আজ নূতন কিছু দেবে না? সে কি কেবলই পুনরাবৃত্তি করবে?

ক্ল্যাসিক্যাল আমাদের কাছে দাবি করে নিখুঁত পুনরাবৃত্তি। তানসেন কী গেয়েছেন জানি না, কিন্তু আজ তাঁর গানে আর-কেউ যদি পুলকিত হন, তবে বলব তিনি এখন জন্মেছেন কেন? আমরা তো তানসেনের সময়ের লোক নই, আমরা কী জড়পদার্থ? আমাদের কি কিছুমাত্র নূতনত্ব থাকবে না? কেবল পুনরাবৃত্তিই করব?

আমার দেশবাসীর কাছে আমার নিবেদন এই যে, পুনরাবৃত্তির পথে চলা আমাদের অভ্যাস নয়। নূতনের পথে ভুল করে যাওয়াও ভালো–তাতে...পরিপূর্ণতা আনে।

আমি স্বীকার করব ক্লাসিক্যাল সংগীতের সৌন্দর্যের সীমা নেই, যেমন অজন্তার মতো কারুকার্য আর কোথাও হয় কিনা সন্দেহ। কিন্তু, ছোটো ছেলের মতো তার উপর দাগা বুলিয়ে পুন [রায়] চিত্রিত করা, সেই কি আমাদের ধর্ম? সেই কি আমাদের আদর্শ? যে পূর্ণতা পূর্বতন [রূপে] আপনাকে প্রকাশ করেছে সেই পূর্ণতাকে উত্তীর্ণ হয়ে আপনাকে যদি প্রকাশ করতে না পারি, তা হলে ব্যর্থ হল আমাদের শিক্ষা। বড়ো বড়ো লোক ... শিক্ষা দিয়েছেন–'তোমরা অনুপ্রেরণা লাভ করো–সেই অনুপ্রেরণাকে তোমাদের শক্তিতে প্রকাশ করো।' তানসেন অনুকরণের কথা বলেন নি এবং কোনো গুণীই তা বলেন নি, বলতে পারেন না।

আজকের দিনে য়ুরোপ অদ্ভুত দুঃসাহসের সঙ্গে নূতন নূতন পথে আপনাকে উন্মুক্ত করতে চলেছে। অন্তরের মধ্যে তাদের কী সে ব্যাকুলতা! তাদের সে প্রকাশ রূঢ় হতে পারে, কুশ্রী হতে পারে, কিন্তু তা যুগের প্রকাশ–তা প্লাবনের প্রকাশ। আমাদেরও তাই দরকার। যদি দেখি হল না, তা হলে বুঝব প্রাণ জাগে নি। আজ পর্যন্ত আমরা [স্বকীয়?] ভাষায় স্বকীয় ভাবে ভাবতে পারি নি। ধিক্ আমাদের। তাদের প্রদর্শিত পথে চললে আমরা মোক্ষলাভ করব? না–কখনোই না। এই-যে গতানুগতিকতা এটা সম্পূর্ণ অশ্রদ্ধেয়। সকল রকম প্রকাশের মধ্যে যুগের প্রকাশ, আত্মপ্রকাশ, হওয়া চাই। কত রকম যুগের বাণী, কত দুঃখ, কত আঘাত আমাদের উপর পড়েছে। তার কিছু কি আমরা রেখে যাব না? একশো বছর পরে আমাদের ভবিষ্যৎ বংশকে আমাদের নব জাগরণের চিত্র কী দেখাব? তাদের কি আমরা এক হাজার বছরের পুরাতন জিনিস দেখাব? ইংরাজের নিজের প্রকৃতিগত রাষ্ট্রনীতিকে দূর দেশ থেকে নিয়ে এসে রোপণ করাব, আর এই কথাই ভবিষ্যৎকে জানাব? আজ চাই নূতনের সন্ধান। তার গান, তার রূপ, তার কাব্য, তার ছন্দ আমাদের মধ্য দিয়ে উদ্‌বুদ্ধ হবে। এই যদি হয় তবে বাঙালি হবে ধন্য। নকলে চলবে না। আমাদের সংগীত, চিত্রকলা, রাষ্ট্রনীতি, আমাদের আপন হোক এই আমার বলার কথা।

আমি বলব আমি কাউকে জানি না, কাউকে মানি না–আমরা যা-কিছু [সৃষ্টি] করি-না কেন, তার মধ্যে ভারতীয় ধারা আপনি [থেকে] যাবে। আমাদের . . . সেই ভারতীয় প্রকৃতি তেমনি আছে যেমন পূর্বতন কালে কীর্তনগানে বাউলে ছিল। সেই রকম আজ যদি বাঙালি আপনাকে সংগীত চিত্রকলায় প্রকাশ করতে ইচ্ছা করে তবে সেই প্রকৃতিকে লঙ্ঘন করতে পারবে না, যদি একমাত্র লক্ষ্য থাকে যা-কিছু করবে নিজেকে মুক্ত করে–নকল করে নয়।

গীতালি

৩০ জুন ১৯৪০, ১৬ আষাঢ় ১৩৪৭, তারিখে কথিত বক্তৃতার অনুলেখন

আজ আমার উপর ভার পড়েছে এই অনুষ্ঠানে তোমাদের কাছে গান সম্বন্ধে কিছু বুঝিয়ে দেওয়া। গান শেখা ভালো এ কথা বলা সহজ, যেমন সহজ বলা যে, চুরি করা ভালো নয়। মেয়েদের গলার গান কানে ভালো শুনায়–এ তো সাদা কথা, ধরা কথা–তাতে আবহাওয়া বেশ একটু সুমধুর হয়।

গানের কথা আমি বলি গানেতেই, গানের কথা আমাকে ফের যদি বলতে হয় ভাষাতে, তবে আমার উপর কি জুলুম হয় না? পুরানো পুঁথিপত্র খুঁজলে দেখবে গান সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ কী বলেছে–যথেষ্ট বলেছে।

আজ বাংলাদেশে গানে একটা খেলো ভাব এসে পড়েছে। কারণ, গান নিয়ে দোকানদারি প্রবল হয়ে পড়েছে। আমি তো ভীত হয়ে পড়েছি। দোকানের মাপেতে দর অনুসারে বাঁকাচোরা করে তার রস-টস চেপেচুপে চলেছে আমারই গান।

এক সময় ছিল যখন, যাঁরা ওস্তাদ তাঁদেরই ছিল গানের ব্যবসায়। তখন গানের যা মূল্য তা তাঁরাই বুঝতেন। তখন টেক্‌নিক্যাল গান ছিল চলতি এবং তার ঠিকমতো সুর তান মান হল কি না তাঁরাই বুঝতেন।

কিন্তু যারা খেটে খায়, অফিসে যায়, তাদের পক্ষে এ-সব গান হয়ে ওঠে না; তাদের পক্ষে ওস্তাদের মতো গলা সাধা শক্ত। সেইজন্য এখনকার গান ব্যবসাদারির বাইরে থাকাই ভালো। আমার গান আপন মনের গান–তাতে আনন্দ পাই, শুনলে আনন্দ হয়। গান হবে যাতে, যারা আশেপাশে থাকে তারা খুশি হয়; আত্মীয়স্বজন যারা অফিস থেকে আসছে, দূর থেকে শুনতে পেলেও, এটা তাদের জন্যও ভালো। ঘরে মাঝে মাঝে ঝগড়াও তো হয়–গান ঘরের মধ্যে মাধুরী পাওয়ার জন্যে, বাইরের মধ্যে হাততালি পাবার জন্যে নয়। ওস্তাদ যাঁরা তাঁদের জন্যে ভাবনা নেই; ভাবনা হচ্ছে যারা গানকে সাদাসিধেরূপে মনের আনন্দের জন্য পেতে চায় তাদের জন্যে। যেমন তোমাদের টি-পার্টি যাকে বলে, সেখানে যারা সাহেবী মেজাজের লোক তাদের কানে কি ভালো লাগবে? এখানে রবীন্দ্রনাথের হালকা গান, সহজ সুর, হয়তো ভালো লাগবে।

তাই বলি আমার গান যদি শিখতে চাও, নিরালায়, স্বগত, নাওয়ার ঘরে কিংবা এমনি সব জায়গায়, গলা ছেড়ে গাবে। আমার আকাঙ্ক্ষার দৌড় এই পর্যন্ত–এর ... বেশি ambition মনে নাই রাখলে।

বাল্যকালে আমাদের ঘরে ওস্তাদের অভাব ছিল না; সুদূর থেকে অযোধ্যা গোয়ালিয়র ও মোরাদাবাদ থেকে, ওস্তাদ আসত। তা ছাড়া বড়ো বড়ো ওস্তাদ ঘরেও বাঁধা ছিল। কিন্তু আমার একটা গুণ আছে–তখনো কিছু শিখি নি, মাস্টারির ভঙ্গি দেখালেই দৌড় দিয়েছি। যদুভট্ট আমাদের গানের মাস্টার আমায় ধরবার চেষ্টা করতেন। আমি তাঁর ঘরের সামনে দিয়ে দৌড় দিতাম। তিনি আমাদের কানাড়া গান শিখাতে চাইতেন। বাংলাদেশে এরকম ওস্তাদ জন্মায় নি। তাঁর প্রত্যেক গানে একটা originality ছিল, যাকে আমি বলি স্বকীয়তা। আমি অত্যন্ত ‘পলাতকা’ ছিলুম বলে কিছু শিখি নি, নইলে কি তোমাদের কাছে আজকে খাতির কম হত? এ ভুল যদি না করতুম, পালিয়ে না বেড়াতুম, তা হলে আজকে তোমাদের মহলে কি নাম হত না? সেটা হয়ে উঠল না, তাই আমি এক কৌশল করেছি–কবিতার-কাছঘেঁষা সুর লাগিয়ে দিয়েছি। লোকের মনে ধাঁধা লাগে; কেউ বলে সুর ভালো, কেউ বলে কথা ভালো। সুরের সঙ্গে কথা, কবি কিনা। কবির তৈরি গান, এতে ওস্তাদি নেই। ভারতীয় সংগীত ব’লে যে-একটা প্রকাণ্ড ব্যাপার আছে, আমার জন্মের পর তার নাকি ক্ষতি হয়েছে–অপমান নাকি হয়েছে। তার কারণ আমার অক্ষমতা। বাল্যকালে আমি গান শিখি নি–এতে সহজে শেখা যায় না, শিখতে কষ্ট হয়, সেই কষ্ট আমি নেই নি। সেজদাদা শিখতেন বটে–তিনি সুর ভাঁজছেন তো ভাঁজছেনই, গলা সাধছেন তো সাধছেনই, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত। হয়তো বর্ষাকাল–মেঘলা হয়েছে–আমার তখন একটু কবিত্ব [জাগল]। তবু যা শুনতাম হয়তো মনে থাকত।

[এইখানে রবীন্দ্রনাথ একটি গান করেন]

খুব মনে পড়ে এই গান যেদিন শিখি। বড়দাদা সেজদাদারা দরজা বন্ধ করে গান শিখতেন। ছেলেমানুষ, আমার তথায় প্রবেশ ছিল না। কারণ, তখনকার দিনে ছেলেমানুষের অনেক অপরাধ ছিল। তানপুরার কান কখনো মুড়ি নি। তবু দরজার পাশে কান দিয়ে শুনেছি, সেটা হয়তো মনে রয়ে গেল। এমনি করে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যা শিখেছি তাই তোমাদের কাছে আওড়ালাম। তোমাদের যা দিয়েছি, এই ছুঁয়ে ছুঁয়ে যা শিখেছি তাই দিয়েছি।

আমার গান যাতে আমার গান ব'লে মনে হয় এইটি তোমরা কোরো। আরো হাজারো গান হয়তো আছে-তাদের মাটি করে দাও-না, আমার দুঃখ নেই। কিন্তু তোমাদের কাছে আমার মিনতি–তোমাদের গান যেন আমার গানের কাছাকাছি হয়, যেন শুনে আমিও আমার গান বলে চিনতে পারি। এখন এমন হয় যে, আমার গান শুনে নিজের গান কিনা বুঝতে পারি না। মনে হয় কথাটা যেন আমার, সুরটা যেন নয়। নিজে রচনা করলুম, পরের মুখে নষ্ট হচ্ছে, এ যেন অসহ্য। মেয়েকে অপাত্রে দিলে যেমন সব-কিছু সইতে হয়, এও যেন আমার পক্ষে সেই রকম।

বুলাবাবু, তোমার কাছে সানুনয় অনুরোধ–এঁদের একটু দরদ দিয়ে, একটু রস দিয়ে গান শিখিয়ো-এইটেই আমার গানের বিশেষত্ব। তার উপরে তোমরা যদি স্টিম রোলার চালিয়ে দাও, আমার গান চেপ্টা হয়ে যাবে। আমার গানে যাতে একটু রস থাকে, তান থাকে, দরদ থাকে ও মীড় থাকে, তার চেষ্টা তুমি কোরো।

আলাপ-আলোচনা

রবীন্দ্রনাথ ও দিলীপকুমার রায়

...কবিবর হেসে বললেন, “তোমার সংগীত সম্বন্ধে লেখা আজ বিজলীতে পড়ছিলাম।’

আমি জিজ্ঞাসুনয়নে তাঁর দিকে চাইলাম। কারণ, আমি তাঁকে একটি চিঠিতে কিছুদিন আগে লিখেছিলাম যে, সম্ভবত হিন্দুস্থানী গান সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে আমার কোনো মতভেদ নেই যেটা বাংলা গান সম্বন্ধে আছে।

কবিবর বললেন, “তোমার লেখার সঙ্গে মূলত আমি একমত। যারা রসরূপের লাবণ্যে মজে জগতে তাদের সংখ্যা অল্প, যারা বাহাদুরিতে ভোলে তাদের সংখ্যাই বেশি। এইজন্য অধিকাংশ ওস্তাদই কসরত দেখিয়ে দিগ্‌বিজয় করে বেড়ায়। ছেলেবেলায় আমি একজন বাঙালী গুণীকে দেখেছিলাম, গান যাঁর অন্তরের সিংহাসনে রাজমর্যাদায় ছিল– কাণ্ঠের দেউড়িতে ভোজপুরী দরোয়ানের মতো তাল-ঠোকাঠুকি করত না; তাঁর নাম তোমরা শুনেছ নিশ্চয়ই। তিনি বিখ্যাত যদুভট্ট, যাঁর কাছে ৺রাধিকাবাবু কিছু শিখেছিলেন।’

আমি বললাম, “কিন্তু আপনার কি তাঁর গান মনে আছে? খুব ছেলেবেলায় আমাদের সংগীত সম্বন্ধে খুব অন্তর্‌দৃষ্টি থাকে না; কাজেই আমার বোধ হয় সে সময়ে উচ্চসংগীতে আমাদের হৃদয় কেমন সাড়া দেয় সেটাও ভালো স্মরণ থাকার কথা নয়।’

কবিবর বললেন, “কিন্তু আমার স্মৃতিতে এখনো সে সংগীতের রেশ লুপ্ত হয় নি। যদুভট্টের জীবনের একটি ঘটনা বলি শোনো। ত্রিপুরার বীরচন্দ্র মাণিক্য তাঁর গানের বড়ো অনুরাগী ছিলেন। একবার তাঁর সভায় অভ্যাগত একজন হিন্দুস্থানী ওস্তাদ নটনারায়ণ রাগে একটি ছোটো গান গেয়ে যদুভট্টের কাছে তারই জুড়ি একটি নটনারায়ণ গানের প্রত্যাশা করেন।

“যদুভট্টের সে রাগটি জানা ছিল না, কিন্তু তিনি পরদিনেই নটনারায়ণ শোনাবেন বলে প্রতিশ্রুত হলেন। ওস্তাদজী গাইলেন। যদুভট্টের কান এমনই তৈরি ছিল যে তিনি সেই দিনই

রাতে বাড়ি গিয়ে চৌতালে নটনারায়ণ রাগে একটি গান বাঁধলেন ও পরদিন সভায় এসে সকলকে শুনিয়ে মুগ্ধ করে দিয়েছিলেন। তাঁর রচিত সেই সুরে জ্যোতিদাদা একটি বাংলা গান রচনা করেছিলেন।’

ব’লে কবিবর গুন গুন করে সে সুরটি একটু শোনালেন।

আমি বললাম, “এ রকম গায়ক এক-একজন করে যাচ্ছেন তাতে দুঃখ করা এক রকম বৃথা, কারণ গায়কও সংগীতের খাতিরে কিছু অমর হতে পারেন না। তবে আক্ষেপের বিষয় হচ্ছে এই যে, আমাদের দেশে সংগীতরাজ্যে একজন গুণী গেলে তাঁর স্থান পূর্ণ করবার লোক আর মেলে না। আমাদের দেশে গায়কদের মধ্যে যথার্থ শিল্পী ক্রমেই যে কী রকম বিরল হয়ে উঠছে তা জানেন এক যথার্থ সংগীতানুরাগী। য়ুরোপে এ রকমটা হয় না। সেখানে এক গায়ক যায় বটে, কিন্তু তার স্থানে অন্য গায়ক জন্মায়।’

কবিবর বললেন, “তা সত্য।’ বলে একটু চুপ করে বললেন, “আজ তোমার সঙ্গে একটা আলাপ করতে চাই।’

আমি সাগ্রহে বললাম, “বলুন।’

কবিবর বললেন, “অনেক সময়ে আমরা পরস্পরের মধ্যে যে মতভেদের কল্পনা করি, আলোচনা করতে গিয়ে দেখা যায় তার অনেকখানিই ফাঁকি। বাংলা ও হিন্দুস্থানী গান নিয়ে তোমার সঙ্গে আমার মতভেদ যদি বা থাকে তা হলে অন্তত তার সীমাটি স্পষ্ট করে নির্দিষ্ট হওয়া ভালো। নইলে সত্যের চেয়ে ছায়াটা বড়ো হয়ে অমিলটা প্রকাণ্ড দেখতে হয়। গোড়াতেই একটা কথা জোর করে ব’লে রাখি, ছেলেবেলা থেকে ভালো হিন্দুস্থানী গান শুনে আসছি বলে তার মহত্ত্ব ও মাধুর্য সমস্ত মন দিয়েই স্বীকার করি। ভালো হিন্দুস্থানী গানে আমাকে গভীরভাবে মুগ্ধ করে।’

আমি বললাম, “এ কথাটা আমার ভারি ভালো লাগল। আর, আপনার মতন গুণগ্রাহী শিল্পীমনের কাছে আমি তো এই’ই আশা করেছিলাম। আপনার “জীবনস্মৃতি’তে হিন্দুস্থানী

সংগীত সম্বন্ধে একটা যথার্থ অন্তর্‌দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। তবে অনেকের আপনার সহজ হালকা সুরের গান শুনে উল্‌টো ধারণা জন্মে থাকে যে, ওস্তাদি সংগীতের আপনি বিরোধী।'

কবিবর বললেন, "মোটেই না। হিন্দুস্থানী সংগীতের যে-একটি উদার বিশেষত্ব, যেটাকে তুমি বলেছ সুরের মধ্য দিয়ে শিল্পীর নিত্যনিয়ত নব নব সৌন্দর্যসৃষ্টির স্বাধীনতা- সেটা য়ুরোপের সংগীতের সঙ্গে তুলনা করে আরো স্পষ্ট বুঝতে পারি।'

আমি বললাম, "এটা খুবই ঠিক। আমারও য়ুরোপে অনেকবার মনে হয়েছিল যে, আমাদের শুধু সংগীত নয়, সভ্যতায়ও, ভারতীয় বৈশিষ্ট্যটি ঠিক-ঠিক বুঝতে হলে একবার পাশ্চাত্য সভ্যতার বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে পরিচয় লাভ করা খুব দরকার। নইলে আমাদের বিশিষ্ট দানটি সম্বন্ধে আমাদের ঠিক যেন চোখে ফোটে না।'

কবিবর বললেন, "সত্যি কথা। কিন্তু, একটা বিষয় আমি তোমাকে আজ একটু বিশেষ করে বলতে চাই। তুমি এটা কেন মানবে না যে, হিন্দুস্থানী সংগীতের ধারার বিকাশ যে ভাবে হয়েছে, আমাদের বাংলা সংগীতের ধারা সে ভাবে বিকাশ লাভ করে নি? এ দুটোর মধ্যে প্রকৃতিভেদ আছে। বাংলার সংগীতের বিশেষত্বটি যে কী তার দৃষ্টান্ত আমাদের কীর্তনে পাওয়া যায়। কীর্তনে আমরা যে আনন্দ পাই সে তো অবিমিশ্র সংগীতের আনন্দ নয়। তার সঙ্গে কাব্যরসের আনন্দ একাত্ম হয়ে মিলিত।'

আমি বললাম, "কিন্তু সুর-'

কবিবর বললেন, "কীর্তনে সুরও অবশ্য কম নয়; তার মধ্যে কারুনিয়মের জটিলতাও যথেষ্ট আছে। কিন্তু, তা সত্ত্বেও কীর্তনের মুখ্য আবেদনটি হচ্ছে তার কাব্যগত ভাবের, সুর তারই সহায় মাত্র। এ কথাটা আরো স্পষ্ট বোঝা যায় যদি কীর্তনের প্রাণ অর্থাৎ আঁখর কী বস্তু সেটা একটু ভেবে দেখা যায়। সেটা শুধু কথার তান নয় কি? হিন্দুস্থানী সংগীতে আমরা সুরের তান শুনে মুগ্ধ হই,সংগীতের সুরবৈচিত্র্য তানালাপে কেমন মূর্ত হয়ে উঠতে পারে সেইটেই উপভোগ করি- নয় কি? কিন্তু, কীর্তনে আমরা পদাবলীর মর্মগত ভাবরসটিকেই নানা আঁখরের মধ্য দিয়ে বিশেষ করে নিবিড়ভাবে গ্রহণ করি। এই আঁখর, অর্থাৎ বাক্যের তান, অগ্নিচক্র থেকে স্ফুলিঙ্গের মতো কাব্যের নির্দিষ্ট পরিধি অতিক্রম করে বর্ষিত হতে থাকে। সেই বেগবান অগ্নিচক্রটি হচ্ছে

সংগীত-সম্মিলিত কাব্য। সংগীতই তাকে সেই আবেগবেগের তীব্রতা দিয়েছে যাতে করে নূতন নূতন আঁখর তা থেকে ছিটিয়ে পড়তে পারে। গীতহীন কাব্য যেখানে স্তব্ধ থাকে সেখানে আঁখর চলে না। বিদ্যাপতি-পাঠকালে পাঠক তাতে নূতন বাক্য যোজনা করলে ফৌজদারি চলে। কারণ, পাঠক তো বিদ্যাপতি নয়। কিন্তু ছন্দোবদ্ধ বিশুদ্ধ কাব্য হিসাবে আঁখরে যে দৈন্য অনিবার্য, কীর্তনের সুরের ঐশ্বর্য সেটাকে পূরণ করে দেয় ব'লেই সেটাতে রসের সহায়তা করে। অতএব দেখা যাচ্ছে কীর্তনে– সুরে বাক্যে অর্ধনারীশ্বর যোগ হয়েছে। যোগের এই দুই অঙ্কের মধ্যে কে বড়ো কে ছোটো সে বিচারের চেষ্টা করা উচিত নয়। উভয়ের যোগে যে সৌন্দর্য সম্পূর্ণতা লাভ করেছে, উভয়কে বিচ্ছিন্ন করে দিলে সেই সৌন্দর্যকেই হারাতে হবে। জলের থেকে অক্সিজেন্‌কেই নিই বা হাইড্রোজেন্‌কেই নিই, তাতে জলটাই যায় মারা। বাংলা পদগান জলেরই মতো যৌগিক সৃষ্টি, তা দুইয়ে মিলে অখণ্ড। হিন্দুস্থানী গান রূঢ়িক, তা একাই বিশুদ্ধ। সৃষ্টি ব্যাপারে রূঢ়িক শ্রেষ্ঠ না যৌগিক শ্রেষ্ঠ এ তর্কের কোনো অর্থ নেই। ভালো যা তা ভালো ব'লেই ভালো– রূঢ়িক ব'লেও না, যৌগিক ব'লেও না।' ...

আমি বললাম, "বাংলার-যে কাব্যে একটা নিজস্ব দান আছে এ কথা কে না মানবে? কিন্তু, তাই ব'লে কি প্রমাণ হয় যে আমাদের সংগীতের বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে না। আমাদের দেশে বড়ো বড়ো কবি জন্মেছেন সত্য; কিন্তু তা থেকে তো সিদ্ধান্ত করা চলে না যে, আমাদের দেশে সংগীতকার জন্মাতেই পারে না। আমাদের দেশে ধরুন যদুভট্ট, অঘোর চক্রবর্তী, রাধিকা গোস্বামী, সুরেন্দ্র মজুমদার প্রমুখ বড়ো বড়ো গায়কও তো জন্মেছেন? তবে?

রবীন্দ্রনাথ বললেন, "জন্মেছেন বটে, কিন্তু তাঁরা কেবলমাত্র গাইয়ে, অর্থাৎ সুর-আবৃত্তিকার, হিন্দুস্থানীর কাছ থেকে শিখে। হিন্দুস্থানীদের মধ্যে বিশুদ্ধ সংগীতে একটা স্বাভাবিক স্ফূর্তি আছে, যেটা তাদের একটা সত্যকার সম্পদ, ধার-করা জিনিস নয়। কাজেই এ উৎস তাদের মধ্যে সহজে শুকিয়ে যেতে পারে না। কিন্তু, আমাদের দেশে বিশুদ্ধ সংগীতে, অর্থাৎ হিন্দুস্থানী সংগীতে, বড়ো গায়ক মানে কী জান? যেন খাল কেটে জল আনা, যা একটু দৃষ্টি না রাখলেই শুকিয়ে যেতে বাধ্য। ওদের দেশে কিন্তু বিশুদ্ধ সংগীতের বিকাশ খাল কেটে টেনে আনা নয়, নদীর স্রোতের মতনই স্বচ্ছন্দগতি– চলার চালেই মাতোয়ারা।'

রবীন্দ্রনাথ একটু থেমে আবার বলতে আরম্ভ করলেন, “বাংলার বৈশিষ্ট্য যে অবিমিশ্র সংগীতে নয় তার একটা প্রমাণ যন্ত্রসংগীতের ক্ষেত্রে মেলে। সংগীতের বিশুদ্ধতম রূপ কিসে? না, যন্ত্রসংগীতে। এ কথা তো অস্বীকার করা চলে না? কিন্তু, দেখো, বাংলাদেশ কখনো হিন্দুস্থানীদের মতো যন্ত্রীর জন্ম দিয়েছে কি? আরো দেখো ওরা কেমন অকিঞ্চিৎকর কথা গানের মধ্যে অম্লানবদনে চালিয়ে দেয়। অক্ষমতাবশত নয়, সুরের তুলনায় তাদের কাছে কথার খাতির কম ব’লে। বাঙালি ভাগ্যদোষে কুকাব্য লিখতে পারে, কিন্তু অকাব্য লিখতে কিছুতেই তার কলম সরবে না। “সামলিয়ানে মোরি এঁদোরিয়া চোরিরে।’ এঁদোরিয়া মানে বুঝি জলের ঘড়ার বিড়ে। শ্যামচাঁদ সেটি চুরি করেছেন, কাজেই তার অভাবে শ্রীরাধার জল আনার মহা অসুবিধা ঘটছে। এইটেই হল সংগীতের বাক্যাংশ। অপর পক্ষে বাঙালি কবি এঁদোরিয়া চুরি নিয়ে পুলিস-কেসের আলোচনা করতে পারে, কিন্তু গান লিখতে পারে না।’

... আমি বললাম, “এ কথা আমি মানি। কিন্তু তাই ব’লে কি আপনি বলতে চান যে ওদের গান শেখা আমাদের পণ্ডশ্রম মাত্র?’

কবিবর জোরের সঙ্গে বলে উঠলেন, “কখনোই নয়। আমরা কি ইংরেজি শিখি না? শিখি তো? কেন শিখি? ইংরেজি সাহিত্যকে আমাদের সাহিত্যে হুবহু নকল করবার জন্য নয়। তার রসপানে আমাদের ভাষা ও সাহিত্যের অন্তর্‌গূঢ় স্বকীয় শক্তিকেই নূতন উদ্যমে ফলবান করে তোলবার জন্যে। রেনেসাঁস-যুগে ইংরেজি সাহিত্য ধাক্কা পেয়েছিল ইটালি থেকে, কিন্তু তার জাগরণটা তার নিজেরই। শেক্‌সপিয়রের অধিকাংশ নাট্যবস্তুই বিদেশের আমদানি, কিন্তু তাই ব’লেই শেক্‌স্‌পিয়রের রচনা ইংরেজি সাহিত্যে চোরাই মাল এমন কথা তো বলা চলে না। গানের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই; হিন্দুস্থানী সংগীত ভালো করে শিখলে তা থেকে আমরা লাভ না করেই পারব না। তবে এ লাভটা হবে তখনই যখন আমরা তাদের দানটা যথার্থ আত্মসাৎ করে তাকে আপন রূপ দিতে পারব। তর্জমা করে বা ধার করে সত্যিকার রসসৃষ্টি হয় না; সাহিত্যেও না, সংগীতেও না।’

আমি বললাম, “তা তো বটেই। তবে কোনো সভ্যতার দানই তো অনড় অচল থাকতে পারে না। তাই, বাঙালির গান কেন হিন্দুস্থানী সংগীত থেকে লাভ করবে না! এ লাভ করাই তো স্বাভাবিক; কারণ সত্য লাভে তো মৌলিকতা নষ্ট হয় না, অনুকরণেই হয়। আমরা আমাদের

নিত্য-নতুন বিচিত্র অভিজ্ঞতা দিয়েই তো শিল্পজগতে নতুন সৃষ্টি করে থাকি? এবং এতেই তো সমৃদ্ধতর হার্মনি গড়ে ওঠে?'

কবিবর বললেন, "ওঠেই তো। দেখো, য়ুরোপীয় সভ্যতার সংস্পর্শে কি আমরা একটা নতুন সমৃদ্ধি লাভ করি নি? না, যদি না করতাম তবে সেটাই বাঞ্ছনীয় হত?'

আমি বললাম, "অবান্তর হলেও এখানে আপনাকে একটা প্রশ্ন করি। অনেকে বলেন যে, অমুক বাঙালি নাট্যকারই হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি সাহিত্যিক। যুক্তি জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা উত্তর দেন যে, বর্তমান বাংলা সাহিত্যিকদের মধ্যে এক তাঁর মধ্যেই য়ুরোপের বিন্দুমাত্রও প্রভাব প্রতিফলিত হয় নি। আমার সত্যিই আশ্চর্য মনে হয় যখন আমি বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান লোকের মুখেও অম্লানবদনে এরূপ যুক্তি প্রযুক্ত হতে শুনি। এরূপ কূপমণ্ডূকতা বোধ হয় আমাদের দেশে যে রকম নির্বিচারে হাততালি পায় অন্য কোনো সভ্যদেশে সেভাবে গৃহীত হতে পারে না– নয় কি? আমার তো ব্যক্তিগতভাবে ঁপিতৃদেবের ভাষা, refinement, সমৃদ্ধ রসিকতা, আপনার অপূর্ব লিখনভঙ্গি বা শরৎবাবুর লেখাও– সে খাঁটি বাঙালি সাহিত্যিকের লেখার চেয়ে ঢের উচ্চশ্রেণীর লেখা মনে হয়। আপনার কি মনে হয় না যে, এ রকম নিয়ত "খাঁটি বাঙালি হও' "খাঁটি বাঙালি হও' করে চীৎকার করা শুধু সাহিত্যিক chauvinism মাত্র?'

কবিবর বললেন, "তা তো বটেই। দুর্গম গিরিশিখরের উৎস থেকে যে আদি নির্ঝরটি ক্ষীণ ধারায় বইছে তাকেই বিশুদ্ধ গঙ্গা ব'লে মানব আর যে ভাগীরথী উদার ধারায় সমুদ্রে এসে মিলেছে, তার সঙ্গে পথে বহু উপনদীর মিশ্রণ ঘটেছে ব'লে তাকেই অশুদ্ধ ও অপবিত্র বলব– এমন কথা নিশ্চয়ই অশ্রদ্ধেয়। প্রাণের একটা শক্তি হচ্ছে গ্রহণ করার শক্তি, আর-একটা শক্তি হচ্ছে দান করার। যে মন গ্রহণ করতে জানে না সে ফসল ফলাতেও জানে না, সে তো মরুভূমি। যদি বাঙালির বিরুদ্ধে কেউ এ অভিযোগ আনে যে, তার মনের উপর য়ুরোপীয় সভ্যতা সব আগে প্রভাব বিস্তার করেছে, তা হলে আমি তো অন্তত তাতে বিন্দুমাত্রও লজ্জা পাই না, বরং গৌরব বোধ করি। কারণ, এই'ই জীবনের লক্ষ্য।'

আমি বললাম, "আপনার কথাগুলি আমার ভারি ভালো লাগল। আর্টজগতে চিন্তারাজ্যের একটু খবর রাখলেই তো দেখা যায় যে, এক সভ্যতা নিত্য অপর সভ্যতা থেকে নূতন সম্পদের খোরাক জুগিয়ে নিয়েছে– নয় কি? তাই যে দু-চার জন লোক থেকে থেকে তারস্বরে রোদন

করে ওঠেন যে “গেল গেল– য়ুরোপীয় সভ্যতার সংস্পর্শে এসে বাঙালির বাঙালিত্ব ঘুচে গেল’, তাঁদের সে আর্তনাদে অন্তত আমার মন তো সাড়া দিতে চায় না।’

কবিবর বললেন, “তা তো বটেই। তা ছাড়া, কোন্‌টা বাঙালির আর কোন্‌টা বাঙালির নয়, তার বিচার শোনবার জন্য আমরা কি কোনো স্পেশাল ট্রিবিউনালের মুখ তাকিয়ে থাকব? বাঙালি গ্রহণ-বর্জনের দ্বারাই আপনি তার বিচার করছে। হাজার প্রমাণ দাও-না যে, বিজয়বসন্ত বাংলার বিশুদ্ধ কথাসাহিত্য, বঙ্কিমের নভেল বিশুদ্ধ বঙ্গীয় বস্তু নয়, তবু বাংলার আবালবৃদ্ধবনিতা বিজয়বসন্তকে ত্যাগ করে বিষবৃক্ষকে গ্রহণ করার দ্বারাই প্রমাণ করছে যে, ইংরাজি-সাহিত্য-বিশারদ বঙ্কিমের নভেল বাংলার নিজস্ব জিনিস। আমি তো একবার তোমার পিতার গানের সম্বন্ধে লিখেছিলাম যে, তাঁর গানের মধ্যেও য়ুরোপীয় আমেজ যদি কিছু এসে থাকে তবে তাতে দোষের কিছু থাকতে পারে না, যদি তার মধ্য দিয়ে একটা নূতন রস ফুটে উঠে বাঙালির রূপ গ্রহণ করে। আর দেখো য়ুরোপীয় সভ্যতা আমাদের দুয়ারে এসেছে ও আমাদের পাশে শতবর্ষ বিরাজ করেছে। আমি বলি– আমরা কি পাথর না বর্বর, যে, তার উপহারের ডালি প্রত্যাখ্যান করে চলে যাওয়াই আমাদের ধর্ম হয়ে উঠবে? যদি একান্ত অবিমিশ্রতাকেই গৌরবের বিষয় বলে গণ্য করা হয়, তা হলে বনমানুষের গৌরব মানুষের গৌরবের চেয়ে বড়ো হয়ে দাঁড়ায়। কেননা, মানুষের মধ্যেই মিশেল চলছে, বনমানুষের মধ্যে মিশেল নেই।’

আমি বললাম, “আপনার এ কথাগুলি আমাকে ভারি স্পর্শ করেছে। আমারও মনে হত যে, এ বিষয়ে এ বাঙালি এ অ-বাঙালি ব’লে তারস্বরে চীৎকার করা মূঢ়তা, কষ্টিপাথর হচ্ছে– আনন্দের গভীরতা ও স্থায়িত্ব।’

কবিবর বললেন, “নিশ্চয়। আমি বলি এই কথা যে, যখন কোনো কিছু হয়, ফুটে ওঠে, তখনই সেইটাই তার চরম সমর্থন। যদি একটা নূতন সুর দেশ গ্রহণ করে, তখন ওস্তাদ হয়তো আপত্তি করতে পারেন। তিনি তাঁর মামুলি ধারণা নিয়ে বলতে পারেন, “এঃ, এখানটা যেন– যেন– কী রকম অন্যরূপ শোনালো– এখানে এ পর্দাটা লাগল যে!’ আমি বলব, “লাগলই বা।’ রস-সৃষ্টিতে আসল কথা “কেন হল’ এ প্রশ্নের জবাবে নয়, আসল কথা “হয়েছে’ এই উপলব্ধিটিতে।’

আমি গানের প্রসঙ্গে ফিরে আসার জন্য বললাম, “এপর্যন্ত আপনার সঙ্গে আমার মতভেদ তো কিছুই নেই। আমি কেবল আপনার গানের সুরে একটা অনড় রূপ বজায় রাখার বিরোধী।’

রবীন্দ্রনাথ বললেন, “এইখানেই তোমার সঙ্গে আমার মতভেদ। আমি যে গান তৈরি করেছি তার ধারার সঙ্গে হিন্দুস্থানী সংগীতের ধারার একটা মূলগত প্রভেদ আছে– এ কথাটা কেন তুমি স্বীকার করতে চাও না? তুমি কেন স্বীকার করবে না যে, হিন্দুস্থানী সংগীতে সুর মুক্তপুরুষভাবে আপনার মহিমা প্রকাশ করে, কথাকে শরিক বলে মানতে সে যে নারাজ– বাংলায় সুর কথাকে খোঁজে, চিরকুমারব্রত তার নয়, সে যুগলমিলনের পক্ষপাতী। বাংলার ক্ষেত্রে রসের স্বাভাবিক টানে সুর ও বাণী পরস্পর আপস করে নেয়, যেহেতু সেখানে একের যোগেই অন্যটি সার্থক। দম্পতির মধ্যে পুরুষের জোর, কর্তৃত্ব, যদিও সাধারণত প্রত্যক্ষভাবে প্রবল, তবুও উভয়ের মিলনে যে সংসারটির সৃষ্টি হয় সেখানে যথার্থ কে বড়ো কে ছোটো তার মীমাংসা হওয়া কঠিন। তাই মোটের উপর বলতে হয় যে, কাউকেই বাদ দিতে পারি নে। বাংলা সংগীতের সুর ও কথার সেইরূপ সম্বন্ধ। হয়তো সেখানে কাব্যের প্রত্যক্ষ আধিপত্য সকলে স্বীকার করতে বাধ্য নয়, কিন্তু কাব্য ও সংগীতের মিলনে যে বিশেষ অখণ্ড রসের উৎপত্তি হয় তার মধ্যে কাকে ছেড়ে কাকে দেখব তার কিনারা পাওয়া যায় না। হিন্দুস্থানী গানে যদি কাব্যকে নির্বাসন দিয়ে কেবল অর্থহীন তা-না-না ক’রে সুরটাকে চালিয়ে দেওয়া হয় তা হলে সেটা সে গানের পক্ষে মর্মান্তিক হয় না। যে রসসৃষ্টিতে সংগীতেরই একাধিপত্য সেখানে তানকর্তা রাস্তা যতটা অবাধ, অন্যত্র, অর্থাৎ যেখানে কাব্যসংগীতেরই একাসনে রাজত্ব সেখানে, তেমন হতেই পারে না। বাংলা সংগীতের, বিশেষত আধুনিক বাংলা সংগীতের, বিকাশ তো হিন্দুস্থানী সংগীতের ধারায় হয় নি। আমি তো সে দাবি করছিও না। আমার আধুনিক গানকে সংগীতের একটা বিশেষ মহলে বসিয়ে তাকে একটা বিশেষ নাম দাও-না, আপত্তি কী! বটগাছের বিশেষত্ব তার ডাল-আবডালের বহুল বিস্তারে, তালগাছের বিশেষত্ব তার সরলতায় ও শাখা-পল্লবের বিরলতায়। বটগাছের আদর্শে তালগাছকে বিচার কোরো না। বস্তুত তালগাছ হঠাৎ বটগাছের মতো ব্যবহার করতে গেলে কুশ্রী হয়ে ওঠে। তার ঋজু অনাচ্ছন্ন রূপটিতেই তার সৌন্দর্য। সে সৌন্দর্য তোমার পছন্দ না হয় তুমি বটতলার আশ্রয় করো– আমার দুই’ই ভালো লাগে, অতএব বটতলায় তালতলায় দুই জায়গাতেই আমার রাস্তা রইল। কিন্তু তাই ব’লে বটগাছের ডাল-

আবডাল-গুলোকে তালের গলায় বেঁধে দিয়ে যদি আনন্দ করতে চাও তা হলে তোমার উপর তালবনবিলাসীদের অভিসম্পাত লাগবে।’

আমি বললাম, “এখানে আপনার কথাগুলো সম্বন্ধে আমার কিছু বলবার আছে। প্রথমত আমি বলতে চাই এই কথা যে, আপনি যে উপমাটিকে এত বড়ো করে তুললেন সেটি মনোজ্ঞ হলেও কলাকারুর আপেক্ষিক বিচারে এরূপভাবে উপমাকে প্রধান করাতে মূল বিষয়টি সম্বন্ধে অনেক সময় একটু ভুল বোঝার সহায়তা করা হয় ব’লে আমার অনেক সময়ে মনে হয়। ধরুন, হিন্দুস্থানী সুর ও বাংলা গান দুটো সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস এ কথা আপনিই বেশি জোর করে বলছেন। অথচ, উপমা দিচ্ছেন দুটো গাছের সঙ্গে, যেন হিন্দুস্থানী সংগীত ও বাংলা সংগীতের মধ্যে প্রকৃতি-ভেদটি অনেকটা বটের শাখাপত্র ও তালের ঋজু রূপের মধ্যে প্রভেদেরই মতন। কিন্তু বস্তুতই কি এ দুই সংগীতের প্রকৃতি-ভেদটি এইরূপ? অন্তত এটা স্বতঃসিদ্ধবৎ ধরে নেওয়া চলে না, এটা প্রমাণসাপেক্ষ, এটা তো মানেন? তবে এ কথা যাক। আমি শুধু আর্টের ক্ষেত্রে রিলেটিভ মূল্য-নির্ধারণের উপমার একান্ত বিশ্বাসযোগ্যতার উপর খুব নির্ভর করা সব সময়ে ঠিক নয় এই কথাটিই বলতে চাই। এখন আমি আপনার মূল যুক্তির সম্পর্কে দু-চারটি কথা বলব। আপনি যে ভাবে রচয়িতার অনুভূতিটিকেই প্রামাণ্য বলে মনে করছেন আমি স্বীকার করি কোনো শিল্প বা শিল্পীর সৃষ্টিকে সে ভাবে দেখা যেতে পারে। কিন্তু, আর-একটা view-pointও আছে, যেটা নিতান্ত অগভীর নয়, এ কথাও আপনাকে স্বীকার করতে হবে। আনাতোল ফ্রান্স্ কোথায় বেশ বলেছেন যে, “প্রত্যেক সুকুমার’ সাহিত্যের একটা মস্ত মহিমা এই যে, প্রতি পাঠক তার মধ্যে নিজেকেই দেখে। আপনার কবিতার আবেদনও যে বিভিন্ন লোকের কাছে বিভিন্ন রকমের হতে বাধ্য। এ কথা তো আপনাকে মানতেই হবে। তা হলে গানের ক্ষেত্রেই বা তা না হবে কেন? আমার তো মনে হয় শিল্পীর শিল্পসৃষ্টির ভিতরকার কথাটা– শিল্পের মধ্য দিয়ে একটা বিশ্বজনীনতার তারে আঘাত দেওয়া। অর্থাৎ, আমার মনে হয় আসল কথা নানা লোকে আপনার কবিতার মধ্যে দিয়ে কত রকম suggestion-এর খোরাক সংগ্রহ করে। আপনি ঠিক কী ভেবে আপনার নানান কবিতা লিখেছেন বা নানান গান রচনা করেছেন সেটা তো গ্রহীতার কাছে সব চেয়ে বড়ো কথা নয়– বিশেষত যখন একজন কখনোই অপর কারুর প্রাণটি ঠিক ধরতে পারে না। আপনি নিজেই কি লেখেন নি যে, কবিকে লোকে যেমন ভাবে কবি তেমন নয়? তাই আমার মনে হয় যে, সব চেয়ে বড়ো কথা হচ্ছে আপনার কবিতা বা গানের মধ্য দিয়ে

ভিন্ন ভিন্ন লোকে কী রকম ভিন্ন ভিন্ন রস সঞ্চয় করে। এ কথাটার খুব extreme সিদ্ধান্তটিও আমার কাছে ভুল মনে হয় না। অর্থাৎ, যদি একজন যথার্থ শিল্পী আপনার কোনো গানকে সম্পূর্ণ নতুন সুরে গেয়ে আনন্দ পান ও পাঁচজনকে আনন্দ দেন, এমন-কি তা হলেও আপনার তাতে দুঃখ না পেয়ে আনন্দই পাওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। কেননা, আর্টের কষ্টিপাথর হচ্ছে আনন্দের গভীরতা। অথচ, আপনি বলতে পারেন যে, এ ক্ষেত্রে আপনার গানের মধ্যে “আপনি’ যে সুরটি ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন সেটা বজায় রইল না। মান্‌লাম। কিন্তু– কিছু মনে করবেন না– তাতে কি সত্যই খুব আসে যায়? বিশেষত যখন ভারতীয় গানের ধারায় শিল্পী চিরকাল কম-বেশি স্বাধীনতা পেয়ে এসেছেন এ কথা আপনি অস্বীকার করতে পারেন না।’

কবিবর বললেন, “না, এ কথা আমি অস্বীকার করি না বটে। কিন্তু, তাই বলে তুমি কি বলতে চাও যে, আমার গান যার যেমন ইচ্ছা সে তেমনিভাবে গাইবে? আমি তো নিজের রচনাকে সেরকম ভাবে খণ্ডবিখণ্ড করতে অনুমতি দেই নি। আমি যে এতে আগে থেকে প্রস্তুত নই। যে রূপসৃষ্টিতে বাহিরের লোকের হাত চালাবার পথ আছে তার এক নিয়ম, আর যার পথ নেই তার অন্য নিয়ম। মুখের মধ্যে সন্দেশ দাও– খুশির কথা। কিন্তু, যদি চোখের মধ্যে দাও তবে ভীম নাগের সন্দেশ হলেও সেটা দুঃসহ। হিন্দুস্থানী সংগীতকার, তাঁদের সুরের মধ্যকার ফাঁক গায়ক ভরিয়ে দেবে এটা যে চেয়েছিলেন। তাই কোনো দরবারী কানাড়ার খেয়াল সাদামাটা ভাবে গেয়ে গেলে সেটা নেড়া-নেড়া না শুনিয়েই পারে না। কারণ, দরবারী কানাড়া তানালাপের সঙ্গেই গেয়, সাদামাটা ভাবে গেয় নয়। কিন্তু আমার গানে তো আমি সেরকম ফাঁক রাখি নি যে, সেটা অপরে ভরিয়ে দেওয়াতে আমি কৃতজ্ঞ হয়ে উঠব।’

আমি বললাম, “মাফ করবেন কবিবর! আপনার এ কথাগুলির মধ্যে অনেকখানি সত্য থাকলেও এর বিপক্ষে দু-চারটে কথা বলার আছে। প্রথম কথা এই যে, আপনার সন্দেশের উপমাটি আপনার অনুপম উপমাশক্তির একটা সুন্দর দৃষ্টান্ত হলেও, এতেও আবার সেই ভুল বোঝার প্রশ্রয় দেওয়া হতে পারে এ আশঙ্কা আমার হয়। কারণটা একটু খুলে বলি। সন্দেশ চোখে দিলে তা দুঃসহ হয় মানি, কিন্তু সেটা স্বতঃসিদ্ধ বলে নয় এ কথা খুব জোর করেই বলা যেতে পারে। অর্থাৎ সন্দেশ চোখে দিলে দুঃসহ হয় এই কারণে যে, এটা মানুষ পরীক্ষা করে দেখেছে। নইলে অন্তত ভোজনবিলাসীর পক্ষে নিখরচায় একটা বাড়তি ভোজনেন্দ্রিয় লাভ হলে

তাতে তার বোধ হয় আপত্তি হত না। বাংলা গান সম্বন্ধেও ওই কথা। বাংলা গান যথেষ্ট তান দিয়ে গাওয়া যদি অসমীচীন হয় তবে সেটা এক “ফলেন পরিচিয়তে’ই হতে পারে- আগে থাকতে স্বতঃসিদ্ধ বলে গণ্য হতে পারে না। কারণ, যদি কেউ আপনাকে গেয়ে দেখিয়ে দিতে পারে যে, বাংলা গান যথেষ্ট তানালাপের সঙ্গে গাইলেও তা পরম সুশ্রাব্য হয়ে উঠতে পারে, তা হলে তো আপনার সত্যের খাতিরে স্বীকার করে নিতেই হবে যে, হিন্দুস্থানী ও বাংলা গানেরর মধ্যে যে একটা অনুপনেয় গণ্ডি আপনি টানতে চান সেটা সীতাহরণের গণ্ডির মতন অলঙ্ঘ্য নয়। অর্থাৎ, গায়কের মধ্যে শুধু প্রয়োগজ্ঞানের অভাবেই এ সাময়িক গণ্ডির সৃষ্টি। শ্রেষ্ঠ শিল্পী এ গণ্ডি অতিক্রম করলেও সীতার মতন বিপদে না পড়ে যথেচ্ছ বিচরণ করতে পারেন। আমি শুধু তর্কের জন্য এ নিছক “যদি’র আশ্রয় নিচ্ছি মনে করবেন না, এটা অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব দেখেছি ব’লেই এ “যদি’বাদ করলাম জানবেন। তবে সে কথা যাক। আমি আর-একটা কথা আপনাকে বলতে চাই ও সেটা এই যে, আপনার শত আশঙ্কা ও সতর্কতা সত্ত্বেও আপনার গানকে আপনি তার মৌলিক সুরের গণ্ডির মধ্যে টেনে রাখতে পারবেন বলে আমার মনে হয় না। আপনার গানেরই একজন ভক্ত আগে আমার সঙ্গে ঠিক এই কথা বলেই তর্ক করতেন যে, যদি আপনার গানে প্রত্যেক গায়ককে তার স্বাধীন সৃষ্টির অবসর দেওয়া হয় তা হলে আপনার সুরের আর কিছু থাকবে না। কিন্তু সেদিন তিনিও আমার কাছে স্বীকার করলেন যে, আপনার “সীমার মাঝে অসীম তুমি’-রূপ সহজ সুরটিও একজন তাঁর সামনে এমন বিকৃত করে গেয়েছিলেন যে, তার গ্রাম্যতা না শুনলে কল্পনা করাও কঠিন। আমারও মনে হয় না যে, আপনি শুধু ইচ্ছা করলেই আপনার মৌলিক সুর হুবহু বজায় থেকে যাবে। আপনি কখ্‌খনো পারবেন না, এ আমি আগে থেকেই বলে রাখছি। যদি আমাদের গান harmonized হত ও ঠিক য়ুরোপীয়দের মতন সর্বদা স্বরলিপি দেখে গাওয়া হত, তা হলে হয়তো আপনি যা চাইছেন তা সাধিত হতে পারত। কিন্তু আমাদের গান যে অন্তত শীঘ্র এ ভাবে গৃহীত হতে পারে না এটা যদি আপনি মেনে নেন তা হলে বোধ হয় আপনার স্বীকার না করেই গত্যন্তর নেই যে, আপনি যেটা চাইছেন সেটা কার্যক্ষেত্রে সংঘটিত হওয়া অসাধ্য না হোক, একান্ত দুঃসাধ্য তো বটেই। আর, তানালাপের স্বাধীনতা না দিলেই কি আপনি আপনার গানের কাঠামোটা হুবহু বজায় রাখতে পারবেন মনে করেন? সহজ সুরের ধরাকাঠের মধ্যে কি বিকৃতি কম হয়? আপনার অনেক সহজ গানও আমি এ ভাবে গাইতে শুনেছি যে, মাফ করবেন, তা সত্যিই vulgar শোনায়। তবে আশা করি এ কথাটি ব্যবহৃত করার জন্য আমাকে ভুল বুঝবেন না।’

কবিবর একটু ম্লান হেসে বললেন, "না, না, আমি তোমায় ভুল বুঝি নি মোটেই। তুমি যা বলছ তা আমারও যে আগে মনে হয় নি তা নয়। আমার গানের বিকার প্রতিদিন আমি এত শুনেছি যে আমারও ভয় হয়েছে যে, আমার গানকে তার স্বকীয় রসে প্রতিষ্ঠিত রাখা হয়তো সম্ভব হবে না। গান নানা লোকের কণ্ঠের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয় বলেই গায়কের নিজের দোষগুণের বিশেষত্ব মনকে নিয়তই কিছু-না-কিছু রূপান্তরিত না করেই পারে না। ছবি ও কাব্যকে এই দুর্গতি থেকে বাঁচানো সহজ। ললিতকলার সৃষ্টির স্বকীয় বিশেষত্বর উপরই তার রস নির্ভর করে। গানের বেলাতে তাকে, রসিক হোক অরসিক হোক, সকলেই আপন ইচ্ছামতো উলট-পালট করতে সহজে পারে বলেই তার উপরে বেশি দরদ থাকা চাই। সে সম্বন্ধে ধর্মবুদ্ধি একেবারে খুইয়ে বসা উচিত নয়। নিজের গানের বিকৃতি নিয়ে প্রতিদিন দুঃখ পেয়েছি বলেই সে দুঃখকে চিরস্থায়ী করতে ইচ্ছা করে না।' …

আমি বললাম, "আপনি এতে যে কতটা ব্যথা পেয়ে থাকবেন সেটা আমি অনেকটা কল্পনা করতে পারছি। কিন্তু ট্রাজিডি তো জগতে আছেই, শিল্পেও আছে, সুতরাং তাকে মেনে নেওয়া ছাড়া উপায়ও নেই। এজন্য আমার মনে হয় যে, যে ট্রাজিডি অবশ্যম্ভাবী তাকে নিবারণ করবার প্রয়াস নিষ্ফল। যদি আপনিও বিফল প্রয়াস করতে যান তা হলে আপনার উদ্দেশ্যসিদ্ধি হবে না, হবে কেবল– তার স্থলে একটা অহিত সাধন করা। অর্থাৎ, আপনি এতে করে বাজে শিল্পীর দ্বারা আপনার গানের caricature নিবারণ করতে পারবেন না। পারবেন কেবল সত্য শিল্পীকে তার সৃষ্টিকার্যে বাধা দিতে। কথাটা একটু পরিস্কার করে বলি। আপনি নিজেই স্বীকার করছেন যে, আপনি চেষ্টা করলেও আপনার মৌলিক সুর বজায় রাখতে পারবেন না। কিন্তু তবু আপনার গানে শিল্পীর নিজের expressionদিয়ে গাওয়াটা আপনার কাছে ব্যথার বিষয় বলে অনেক সত্যকার শিল্পী হয়তো আপনার গান তাদের নিজের মতন করে গাইতে চাইবে না। আপনার অনিচ্ছা না থাকলে হয়তো তারা আপনার গানের মূল কাঠামোটা বজায় রেখে তাদের ইচ্ছামতো স্বরবৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে আপনার গানকে একটা নূতন সৌন্দর্যে গরীয়ান করে তুলতে পারত। কিন্তু, আপনার সুর হুবহু বজায় রাখতে হবে– আপনার এই ইচ্ছা বা আদেশের দরুন তাদের নিজেদের অনুভূতির রঙ ফলিয়ে আপানর গান গাওয়া তাদের কাছে একটা সংকোচের কারণ না হয়েই পারবে না। কথাটা একটু ভেবে দেখবেন। শিল্পীকে এ স্বাধীনতা দিলে অবশ্য আপনার

গানের মূল ভাবটি (spirit) বজায় রাখা কঠিনতর হবে এ কথা আমি মানি। কিন্তু, risk-এর গুরুত্বের জন্য তো আদর্শকে ছোটো করা চলে না।’

কবিবর একটু ভেবে বললেন, “অবশ্য, যারা সত্যকার গুণী তাদের আমি অনেকটা বিশ্বাস করে এ স্বাধীনতা দিতে পারতাম। তবে একটা কথা– না দিলেই বা মানছে কে? দ্বারী নেই, শুধু দোহাই আছে, এমন অবস্থায় দস্যুকে ঠেকাতে কে পারে? কেবল আমি এ সম্পর্কে তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি যে, বাংলা গানে হিন্দুস্থানী সংগীতের মতন অবাধ তানালাপের স্বাধীনতা দিলে তার বিশেষত্ব নষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে এ কথা তুমি মান কি না?’

আমি বললাম, “মানি– যদি বাংলা গানে হুবহু হিন্দুস্থানী গানের তানালাপের পদ্ধতি নকল করা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। আমি এ কথা ইতিপূর্বে লিখেছি যে, বাংলা গানে, বিশেষত কবিত্বময় ও ভাবময় গানে, তাদের একটু সংযম করতেই হয়। সেইজন্য বাংলা গানে হিন্দুস্থানী সংগীতের অপূর্ব রস পুরোপুরি আমদানি করা চলে না। কিন্তু, তবু অনেকখানি চলে এ কথা আপনাকে মানতে হবে– বিশেষত সত্যকার শিল্পীর হাতে। কারণ, সত্যকার শিল্পী একটা সহজ সৌষ্ঠবজ্ঞান (sense of proportion) ও সংযমজ্ঞান নিয়ে জন্মান এ কথা বোধ হয় সত্য। আপনি যদি বিখ্যাত রসিক রায়বাহাদুর সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের মুখে আপনারই গান শুনতেন তা হলে বুঝতেন আমি কেন আপনার কাছ থেকে এ স্বাধীনতা চাইছি। অবশ্য, এক শ্রেণীর বাংলা গান আছে যা নিতান্তই সহজ সুরে রচিত ও সহজ সুরেই গেয়। সেগুলির সঙ্গে আমার বিবাদ নেই এবং সেগুলির সম্বন্ধে আমি এ স্বাধীনতা চাইছি না। আমি কেবল বলি এই কথা যে, আর-এক শ্রেণীর বাংলা গান কেন সৃষ্টি করা অসম্ভব হবেই যার মধ্যে হিন্দুস্থানী সংগীতের, সম্পূর্ণ না হোক, অনেকখানি সৌন্দর্যের আমদানি করা চলবে? আমার সম্প্রতি অতুলপ্রসাদ সেনের কতকগুলি গান শুনে আরো বেশি করে মনে হয়েছে যে, এটা শুধু সম্ভব তাই নয়, এটা হবেই। আমি আরো একটু বেশি বলতে চাই যে, এ দিকে বাংলা গানের বিকাশ অনেকটা ইতিমধ্যেই হয়েছে যার হয়তো আপনি সম্পূর্ণ খবর রাখেন না। এবং আমরা হিন্দুস্থানী সংগীতকে নিয়ে একটু উদারভাবে চেষ্টা করলে এ বিকাশ পরে আরো সমৃদ্ধতর হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। তাই আমার মোট কথাটি এই যে, বাংলা গান বাংলা বলেই তাতে তান দেওয়া চলবে না এ কথা আমার সংগত মনে হয় না।’

উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বললেন, “আমি তো কখনো এ কথা বলি নি যে, কোনো বাংলা গানেই তান দেওয়া চলে না। অনেক বাংলা গান আছে যা হিন্দুস্থানী কায়দাতেই তৈরি, তানের অলংকারের জন্য তার দাবি আছে। আমি এ রকম শ্রেণীর গান অনেক রচনা করেছি। সেগুলিকে আমি নিজের মনে কত সময়ে তান দিয়ে গাই।’ ব’লে কবিবর স্বরচিত একটি ভৈরবী তান দিয়ে গাইলেন।

তার পর তিনি বললেন, “হিন্দুস্থানী গানের সুরকে তো আমরা ছাড়িয়ে যেতে পারিই না। আমাকেও তে নিজের গানের সুরের জন্য ঐ হিন্দুস্থানী সুরের কাছেই হাত পাততে হয়েছে। আর, এতে যে দোষের কিছুই নেই এ কথাও তো আমি সাহিত্যের উপমা দিয়ে বললাম। কাজে কাজেই হিন্দুস্থানী গান ভালো করে শিখলে তার প্রভাবে যে বাংলা সংগীতে আরো নূতন সৌন্দর্য আসবে এটাই তো আশা করা স্বাভাবিক। তাই তোমরা এ চেষ্টা যদি কর তবে তোমাদের উদ্যোগে আমার অনুমোদন আছে এ কথা নিশ্চয় জেনো। কেবল আমি তোমাকে বাংলার বিশেষত্ব সম্বন্ধে যে-কয়টি কথা বললাম সে কথা ক’টি মনে রেখো। বাংলার বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে কেমন করে নূতন সৌন্দর্য বাংলা সংগীতে ফুটানো যেতে পারে এটা একটা সমস্যা। তবে চেষ্টা করলে এ সমস্যার সমাধানও না মিলেই পারে না। এ কথা স্মরণ রেখে যদি তুমি হিন্দুস্থানী সংগীত assimilate ক’রে বাংলার বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে তার সামঞ্জস্য সাধন করতে পার, তা হলে তুমি সগরের মতনই সুরের সুরধুনী বইয়ে দিতে পারবে– নইলে সুরের জলপ্লাবনই হবে, কিন্তু তাতে তৃষিতের তৃষ্ণা মিটবে না।’

আমি বললাম, “আপনার সঙ্গে তো দেখছি এখন আমার কোনোই মতভেদ নেই।’

কবিবর তাঁর স্বভাবসিদ্ধ স্নিগ্ধ হাসি হাসলেন। …

২

সকালবেলা। কবিবরকে একটু শ্রান্ত দেখাচ্ছিল, তবে দিন দশেক আগে যতটা শ্রান্ত দেখিয়েছিল ততটা নয়।

আমি বললাম, “আমি আপনাকে আজ একটা প্রশ্ন করতে চাই। সেটা এই যে, সংগীতের ভাষা বিশ্বজনীন- the language of music is universal ব’লে যে একটা কথা আছে সেটা সত্য কিনা। আমার মনে হয় সত্য নয়। এ ধারণা আমার মন থেকে কিছুতেই যাচ্ছে না। আমার এ সংশয়ের প্রধান কারণ এই যে, আমি বার বার দেখেছি যে য়ুরোপীয় সংগীত আমাদের মনে বা ভারতীয় সংগীত ওদের মনে কখনোই একটা খুব বড়ো রকম অনুরণন তুলতে পারে না। এ সম্বন্ধে আমার বিখ্যাত সংগীতরসিক রোম্যাঁ রোলাঁর সঙ্গে প্রায়ই তর্ক হত। তাঁর বার বার বলা সত্ত্বেও আমি আজ অবধি তাঁর কথা বিশ্বাস করতে পারি নি যে, সংগীতের আবেদন দেশ-কাল-পাত্রের অতিরিক্ত।’

রবীন্দ্রনাথ বললেন, “সকল সৃষ্টির মধ্যেই একটি দ্বৈত আছে; তার একটা দিক হচ্ছে অন্তরের সত্য, আর-একটা দিক হচ্ছে তার বাহিরের বাহন। অর্থাৎ, এক দিকে ভাব, আর-এক দিকে ভাষা। দুইয়ের মধ্যে প্রাণগত যোগ আছে, কিন্তু প্রকৃতিগত ভেদ দুইয়ের মধ্যে আছে। ভাষা সার্বজনীন নয়, অথচ এই সত্য সার্বজনীন। এই সর্বজাতীয় সম্পদ্‌কে আয়ত্ত করতে গেলে তার বিশেষজাতীয় আধারটিকে আয়ত্ত করতে হয়। কবি শেলির কাব্যের সার্বজনীন রসটি উপভোগ করতে গেলে ইংরেজ নামে একটি বিশেষ জাতির ভাষা শিখে নেওয়া চাই। সেই ভাষার সঙ্গে সেই রসের এমনি নিবিড় মিলন যে, দুইয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ একেবারেই চলে না। গানের ভিতরকার রসটি সর্বজাতির কিন্তু ভাষা, অর্থাৎ তার বাহিরের ঠাটখানা, বিশেষ বিশেষ জাতির। সেই পাত্রটি যথার্থ রীতিতে ব্যবহারের অভ্যাস যদি না থাকে তবে ভোজ ব্যর্থ হয়ে যায়। তাই ব’লে ভোজের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ করা অন্যায়। য়ুরোপীয়রা আপন সংগীতের যে প্রভূত মূল্য দেয় এবং তার দ্বারা যে সুগভীরভাবে বিচলিত হয় সেটা আমরা দেখেছি- এই সাক্ষ্যকে শ্রদ্ধা না করাই মূঢ়তা। কিন্তু, এ কথাও মানতে হয় যে, এই সংগীতের রসকোষের মধ্যে প্রবেশ করার ক্ষমতা আমার নেই, কেননা এর ভাষা আমি জানি নে। ভাষা যারা নিজে জানে তারা অন্যের না-জানা সম্বন্ধে অসহিষ্ণু হয়। সময়ে বুঝতে পারে না না-জানাটাই স্বাভাবিক। ভাষা যখনই বুঝি তখনই রস ও রূপ অখণ্ড এক হয়ে আমাদের কাছে প্রকাশ পায়। কাব্যের ও গানের ভাষা সম্বন্ধে বিশেষ দেশকালের যেমন বিশেষত্ব আছে, ছবির ভাষায় তেমন নেই; কারণ, ছবির উপকরণ হচ্ছে দৃশ্য পদার্থ- অন্য ভাষার মতন সে তো একটা সংকেত নয় বা প্রতীক নয়। গাছ শব্দটা একটা সংকেত, তার প্রত্যক্ষ পরিচয় শব্দটার মধ্যেই নেই, কিন্তু

গাছের রূপরেখা আপন পরিচয় আপনি বহন করে। তৎসত্ত্বেও চিত্রকলার ভাষা যতক্ষণ না সুপরিচিত হয় ততক্ষণ তার রসবোধে বাধা ঘটে। এই কারণেই চীন জাপান ভারতের চিত্রকলার আদর বুঝতে য়ুরোপের অনেক বিলম্ব ঘটেছে। কিন্তু যখন বুঝেছে তখন উভয়কে এক করে তবেই বুঝেছে। তেমনি সংগীতকেও বোঝবার একান্ত বাধা। কিন্তু তার প্রকাশের যে বাহ্যরীতি বিশেষ দেশে বিশেষভাবে গড়ে উঠেছে, তাকে জোর করে ডিঙিয়ে সংগীতকে পূর্ণভাবে পাওয়া অসম্ভব। কোনো আভাসই পাওয়া যায় না তা বলি নে, কিন্তু সেই অশিক্ষিতের আভাস নির্ভরযোগ্য নয়।

“এক ভাষায় বিশেষ শব্দের যে বিশেষ নির্দিষ্ট অর্থ আছে অন্য ভাষার প্রতিশব্দে তাকে পাওয়া যায়। কিন্তু তাতে আমাদের ব্যবহারের যে ছাপ লাগে, হৃদয়াবেগের যে রঙ ধরে, সেটা তো অন্য ভাষায় মেলে না। কারণ, চরণকমলকে feet lotus বললে কি কিছু বলা হয়? অথচ এই শব্দটির মধ্যে ভাবের যে সুরটি পাই সেই সুরটি যে-কোনো উপায়ে যে-কেউ পাবে, সেই আনন্দও তার তেমনি সুগম হবে। অতএব এই বাহিরের জিনিসটাকে পাওয়ার অপেক্ষা করতেই হবে, তা হলেই ভিতরের জিনিসটিও ধরা দেবে। আমরা ইংরেজি সাহিত্যের রস অনেকটা পরিমাণেই পাই, তার কারণ- ইংরেজি শব্দের কেবলমাত্র যে অর্থ জানি তা নয়, অনেক পরিমাণে তার সুরটি তার রঙটিও জেনেছি। য়ুরোপীয় সংগীতের ভাষা সম্বন্ধে কিন্তু এ কথা বলতে পারি নে। কীট্‌সের Ode to a Nightingale-এ fairy land forlorn-Hl perilous sea-র ঊর্ধ্বে magic casement-এর ছবি যে অপূর্বসুন্দর হয়ে প্রকাশ পেয়েছে তাকে আমাদের ভাষায় ব্যক্ত করা অসম্ভব। ওর শব্দগত সংগীত প্রতিশব্দে দুর্লভ বলেই এ বাধা, তা নয়। ওদের পরীর দেশের কল্পনার সঙ্গে যে-সমস্ত বিচিত্রতার অনুভাব জড়িয়ে আছে আমাদের তা নেই। কিন্তু কীট্‌সের কবিতার মাধুর্য আমাদের কাছে তো ব্যর্থ হয় নি। কারণ, দীর্ঘকালের অভ্যাস ও সাধনায় আমরা ইংরেজি সাহিত্যের বাহির দরজা পেরিয়ে গেছি। য়ুরোপীয় সংগীতে আমাদের সেই সুদীর্ঘ সাধনা নেই, দ্বারের বাইরে আছি। তাই এটুকু বুঝেছি যে, সংগীতের সৌন্দর্য বিশ্বজনের, কিন্তু তার ভাষার দ্বারী বিশ্বজনের নিমক খায় না।’

আমি বললাম, “রসের বিশ্বজনীনতার কথা বললেন, কিন্তু রুচিভেদ–‘

কবিবর বললেন, “অবশ্য, রুচিভেদ নিয়ে মানুষ সৃষ্টির আদিমকাল থেকেই বিবাদ করে আসছে।’

আমি বললাম, “কিন্তু, তা হলে কি বলতে হবে যে, আর্টে absolute values সম্বন্ধে মানুষের মনের মধ্যে অনৈক্যটাই কায়েম হয়ে থাকবে, মতৈক্য কখনো গড়ে উঠবে না?’

কবিবর বললেন, “উঠবে। তবে সেটার কষ্টিপাথর হচ্ছে কাল। একমাত্র কালই এ বিষয়ে অভ্রান্ত বিচারক। সাময়িক মতামত যে প্রায়ই শিল্পের বা শিল্পীদের relative value সম্বন্ধে ভুল করে বসে এ কথা কে না জানে?’

আমি বললাম, “ঠিক কথা। শেক্স্পীয়রের সময়ে লোকে বলত যে, বেন্ জন্সন্ তাঁর চেয়ে বড়ো। কিন্তু, আজ আমাদের এ কথা শুনলে হাসি পায়।’

কবিবর হেসে বললেন, “শেক্স্পীয়রের দৃষ্টান্তটি খুব সুপ্রযুক্ত। তাঁর সময়ে লোকে তাঁকে বিজ্ঞভাবে মূর্খ ব’লে বেন্ জন্সন্কে মস্ত পণ্ডিত হিসাবে বড়ো করে ধরতে চেয়েছিল। কিন্তু, দেখছ তো কাল কেমন ধীরে ধীরে আজ বেন্ জন্সনেরই উচ্চ আসনে মূর্খ শেক্স্পীয়রকে বসিয়েছে? তাই, রুচিভেদ নিয়ে আমাদের কালের রায় গ্রহণ করা ছাড়া এ সম্বন্ধে সমস্যার কোনো চরম সমাধান হতে পারে না।’ ...

৩

সকাল নটায় গানের আসর বসল। আমি আর অতুলদা দুই-একটা গান গাওয়ার পরে কবি আমার দিকে চেয়ে বলতে আরম্ভ করলেন, “যে আদর্শ ধরে আমি গান তৈরি করি সে সম্বন্ধে আমার জবাবদিহি পূর্বেই দুই-একবার তোমার কাছে দাখিল করেছি। তোমার জবানি তার রিপোর্ট্ কাগজে বেরিয়েছে, পড়েও দেখেছি। তাই কথাটা আরো একবার স্পষ্ট করা অনাবশ্যক বোধ হচ্ছে না।

“হিন্দুস্থানী গানের রীতি যখন রাজা বাদশাদের উৎসাহের জোরে সমস্ত উত্তর ভারতে একচ্ছত্র হয়ে বসল তখনো বাঙালির মনকে বাঙালির কণ্ঠকে সম্পূর্ণ দখল করতে পারে নি।

“বাংলার রাধাকৃষ্ণের লীলাগান দিলে হিন্দুস্থানী গানের প্রবল অভিযানকে ঠেকিয়ে। এই লীলারসের আশ্রয় একটি উপাখ্যান। সেই উপাখ্যানের ধারাটিকে নিয়ে কীর্তনগান হয়ে উঠল পালাগান।

“স্বভাবতই পালাগানের রূপটি নাট্যরূপ। হিন্দুস্থানী সংগীতে নাট্যরূপের জায়গা নেই। উপমা যদি দেওয়া চলে তা হলে বলতে হবে ঐ সংগীতে আছে এক-একটি রত্নের কৌটা। ওস্তাদ জহুরী ঘটা ক'রে প্যাঁচ দিয়ে তার ঢাকা খোলে। আলোর ছটায় ছটায় তান লাগিয়ে দিকে দিকে তাকে ঘুরিয়ে দেখায়। সমঝদার তার জাত মিলিয়ে দেখে, তার দাম যাচাই করে। ব'লে দিতে পারে এটা হীরে না নীলা, চুনি না পান্না।

“কীর্তন হচ্ছে রত্নমালা রূপসীর গলায়। যেমন রসিক, সে প্রত্যেক রত্নটিকে প্রিয়কণ্ঠে স্বতন্ত্র করে দেখতে পায় না– দেখতে চায় না। রত্নগুলিকে আত্মসাৎ করে যে সমগ্র রূপটি নানা ভাবে হিল্লোলিত, সেইটেই তার দেখবার বিষয়। কিন্তু, এটা হিন্দুস্থানী কায়দা নয়।

“মনে পড়ছে– আমার তখন অল্প বয়স, সংগীতসমাজে নাট্য-অভিনয়। ইন্দ্র চন্দ্র দেবতারা নাটকের পাত্র। উদ্যোগকর্তা অভিনেতারা ধনী ঘরের। সুতরাং দেবতাদের গায়ের গহনা না ছিল অল্প, না ছিল ঝুঁটো, না ছিল কম দামের। সেদিন প্রধান দর্শক রাজোপাধিধারী পশ্চিম প্রদেশের এক ধনী। তাঁকে নাটকের বিষয় বোঝাবার ভার আমার উপরে; আমি পাশে ব'সে। অল্পক্ষণের মধ্যেই বোঝা গেল, সেখানে বসানো উচিত ছিল হ্যামিল্টনের দোকানের বেচনদারকে। মহারাজের একাগ্র কৌতূহল গয়নাগুলির উপরে। অথচ অলংকারশাস্ত্রে সামান্য যে পরিমাণ দখল আমার সে বাক্যালংকারের, রত্নালংকারে আমি আনাড়ি।

“সেদিন অভিনয় না হয়ে যদি কীর্তন হত তা হলেও এই পশ্চিমে মহারাজা গানের চেয়ে রাগিণীকে বেশি করে লক্ষ্য করতেন, সমগ্র কলাসৃষ্টির সহজ সৌন্দর্যের চেয়ে স্বরপ্রয়োগের দুরূহ ও শাস্ত্রসম্মত কারুসম্পদের মূল্যবিচার করতেন– সে আসরেও আমাকে বোকার মতো বসে থাকতে হত।

“মোট কথা হচ্ছে– কীর্তনে জীবনের রসলীলার সঙ্গে সংগীতের রসলীলা ঘনিষ্ঠভাবে সম্মিলিত। জীবনের লীলা নদীর স্রোতের মতো নতুন নতুন বাঁকে বাঁকে বিচিত্র। ডোবা বা

পুকুরের মতো একটি ঘের-দেওয়া পাড় দিয়ে বাঁধা নয়। কীর্তনে এই বিচিত্র বাঁকা ধারার পরিবর্ত্যমান ক্রমিকতাকে কথায় ও সুরে মিলিয়ে প্রকাশ করতে চেয়েছিল।

“কীর্তনের আরো একটি বিশিষ্টতা আছে। সেটাও ঐতিহাসিক কারণেই। বাংলায় একদিন বৈষ্ণবভাবের প্রাবল্যে ধর্মসাধনায় বা ধর্মরসভোগে একটা ডিমোক্রাসির যুগ এল। সেদিন সম্মিলিত চিত্তের আবেগ সম্মিলিত কণ্ঠে প্রকাশ পেতে চেয়েছিল। সে প্রকাশ সভার আসরে নয়, রাস্তার ঘাটে। বাংলার কীর্তনে সেই জনসাধারণের ভাবোচ্ছ্বাস গলায় মেলাবার খুব একটা প্রশস্ত জায়গা হল। এটা বাংলাদেশের ভূমিপ্রকৃতির মতোই। এই ভূমিতে পূর্ববাহিনী দক্ষিণবাহিনী বহু নদী এক সমুদ্রের উদ্দেশে পরস্পর মিলে গিয়ে বৃহৎ বিচিত্র একটি কলধ্বনিত জলধারার জাল তৈরি করে দিয়েছে।

“হিন্দুস্থানে তুলসীদাসের রামায়ণ সুর করে পড়া হয়। তাকে সংগীতের পদবী দেওয়া যায় না। সে যেন আখ্যান-আসবাবের উপরিতলে সুরের পাতলা পালিশ। রসের রাসায়নিক মতে সেটা যৌগিক পদার্থ নয়, সেটা যোজিত পদার্থ। কীর্তনে তা বলবার জো নেই। কথা তাতে যতই থাক্, কীর্তন তবুও সংগীত। অথচ কথাকে মাথা নিচু করতে হয় নি। বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস জ্ঞানদাসের পদকে কাব্য হিসাবে তুচ্ছ বলবে কে!

“কীর্তনে বাঙালির গানে, সংগীত ও কাব্যের যে অর্ধনারীশ্বর মূর্তি, বাঙালির অন্য সাধারণ গানেও তাই। নিধুবাবু শ্রীধরকথকের টপ্পা গানে, হরুঠাকুর রামবসুর কবির গানে, সংগীতের সেই যুগলমিলনের ধারা।’

বললাম, “এ সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে আমার মতভেদ নেই। জীবনে দাম্পত্যমিলনের সুখশান্তি সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা না থাকলেও, গানের ক্ষেত্রে দাম্পত্য বলতে কী বোঝায় সেটা আমি বুঝি বলেই আমার বিশ্বাস। কেবল, আপনি যেমন সুরের পক্ষে কথাকে ছাড়িয়ে যাওয়াটা অপরাধ বলে মনে করেন, আমিও তেমনি কথার পক্ষে সুরকে দাবিয়ে রাখার দোষ দেখাতে চাই– এইমাত্র। তাই আমার মনে হয় আপনার সঙ্গে, আমার মতভেদ ঘটে প্রধানত কোথায় সীমা নির্দেশ করবেন তাই নিয়ে, মূলনীতি নিয়ে নয়। আমার মনে হয় আপনি গানের সুরের যতটা দাবি মানতে রাজি, আমি সুরকে তার চেয়ে বড়ো স্থান দিয়ে থাকি। এটা শুধু আমার তর্কের খাতিরে বলা নয়– এ নিয়ে আমি সত্যই যাকে বলে এক্সপেরিমেণ্ট্ করতে

করতে নিত্য নূতন আলো পাচ্ছি বলে মনে করি। কাজেই, আমার এই অনুভূতিকে কেমন করে অস্বীকার করি?’

কবি বললেন, “তোমার এই তর্কে দুটো ভাগ দেখছি- একটা মূলনীতি, আর-একটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। মূলনীতি জিনিসটা নির্ব্যক্তিক, সেটা হল আর্টের গোড়াকার কথা। নানা উপাদানের মধ্যে সামঞ্জস্যেই কলারচনার পূর্ণতা এই অত্যন্ত সাদা কথাটা তুমিই মানো আর আমিই মানি নে এমন যদি হয়, তবে শুধু সংগীত কেন, কাব্য সম্বন্ধেও কথা কবার অধিকার আমাকে হারাতে হয়। বাক্য এবং ছন্দ, কবিতার এই দুই অঙ্গ। বাক্য যদি ছন্দের রন্ধন ছাড়িয়ে অর্থের অহংকারে কড়াগলায় হাঁকডাক করে, কাব্যে সেটাও যেমন রূঢ়তা তেমনি ছন্দের অতিপ্রচুর ঝংকার অর্থ-সমেত বাক্যকে ধ্বনি চাপা দিয়ে মারলে সেটাও একটা পাপের মধ্যে। গানে সেই মূলতত্ত্বটা আমি অর্ধেক মানি অর্ধেক মানি নে এত বড়ো মূঢ়তা প্রমাণ হলে, রসিকমণ্ডলীতে আমার জাত যাবে। নিশ্চয়ই তুমি আমাকে জাতে ঠেলবার যোগ্য বলে মনে করো না।

“তা হলেই দাঁড়াচ্ছে ব্যক্তিগত বিচারের কথা। অর্থাৎ নালিশটা এই যে, আমার রচিত অধিকাংশ গানেই আমি সুরকে খর্ব করে কথার প্রতি পক্ষপাত প্রকাশ করে থাকি, তুমি তা করো না। অর্থাৎ, সর্বজনসম্মত মূলনীতি প্রয়োগ করবার বেলায় অন্তত সংগীতে আমার ওজন-জ্ঞান থাকে না।

“এখানে মূলনীতির আইনের বই খুলে আমাকে আসামীরূপে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছ। ফস্ করে আমি যে “প্লীড্ গিল্‌টি’ করব নিশ্চয়ই তুমি ততটা আশা করো না। এই জাতের তর্ক অনেক সময়েই কথা-কাটাকাটি থেকে মাথা-কাটাকাটিতে গিয়ে পৌঁছায়। সুতরাং তর্কের চেষ্টা না করাই নিরাপদ। তবু, বিনা তর্কে আমার পক্ষে যতটা কথা বলা চলে তাই আমি বলব।

“য়ুরোপীয় সাহিত্যে এক শ্রেণীর কবিতাকে “লিরিক’ নাম দেওয়া হয়েছে। তার থেকেই বোঝা যায় সেগুলি গান গাবার যোগ্য। এমন-কি, কোনো-এক সময়ে গাওয়া হত। মাঝখানে ছাপাখানা এসে শ্রাব্য কবিতাকে পাঠ্য করেছে। বর্তমানে গীতিকাব্যের গীতি অংশটা হয়েছে উহ্য। কিন্তু, উহ্য বলেই যে সে পরলোকগত তা নয়, যা শ্রোতার কানে ছিল এখন তা আছে পাঠকের মনে। তাই এখনকার গীতিকাব্যে অশ্রুত সুর আর পঠিত কথা দুইয়ে মিলে আসর

জমায়। এইজন্যে স্বভাবতই গীতিকাব্যে চিন্তাযোগ্য বিষয়ের ভিড় কম, আর তাতে তত্ত্বের-ছাপওয়ালা কথা যথাসম্ভব এড়িয়ে চলতে হয়। চণ্ডীদাসের গান আছে–

কেবা শুনাইল শ্যাম নাম!
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো,
আকুল করিল মোর প্রাণ।

এর শ্রুত বা পঠিত কথাগুলি কঠিন ও উঁচু হয়ে উঠে অশ্রুত সুরকে হোঁচট খাইয়ে মারছে না। ঐ কবিতাটিকে এমন করে লেখা যেতে পারে–

শ্যামনাম রূপ নিল শব্দের ধ্বনিতে।
বাহ্যেন্দ্রিয় ভেদ করি অন্তর-ইন্দ্রিয়ে মরি
স্মৃতির বেদনা হয়ে লাগিল রণিতে।

এর তত্ত্বটা মন্দ না। শ্যাম নামটি অপরূপ। ধ্বনিতে সেটা রূপ নিল। তার পরে অন্তরে প্রবেশ করে স্মৃতিবেদনায় পুনশ্চ অরূপ হয়ে রণিত হতে লাগল। বসে বসে ভাবা যেতে পারে, মনস্তত্ত্বের ক্লাসে ব্যাখ্যা করাও চলে, কিন্তু কোনোমতেই মনে মনেও গাওয়া যেতে পারে না। যাঁরা সারবান্ সাহিত্যের পক্ষপাতী তাঁরা এটাকে যতই পছন্দ করুন-না কেন, গীতিকাব্যের সভায় এর উপযুক্ত মজবুত আসন পাওয়া যাবে না। এখানে বাক্য এবং তত্ত্ব দুই পালোয়ানে মিলে গীতকে একেবারে হটিয়ে দিয়েছে।

“নিজের রচনা সম্বন্ধে নিজে বিচারক হওয়া বেদস্তুর, কিন্তু দায়ে পড়লে তার ওকালতি করা চলে। সেই অধিকার দাবি করে আমি বলছি– আমার গানের কবিতাগুলিতে বাক্যের আসুরিকতাকে আমি প্রশ্রয় দিই নি– অর্থাৎ, সেই-সব ভাব, সেই সব কথা ব্যবহার করেছি, সুরের সঙ্গে যারা সমান ভাবে আসন ভাগ করে বসবার জন্যেই প্রতীক্ষা করে। এর থেকে বুঝতে পারবে তোমার মূলনীতিকে আমি সুরের দিকেও মানি, কথার দিকেও মানি।

“তবু তুমি বলতে পারো নীতিতে যেটাকে সম্পূর্ণ পরিমাণে মানি, রীতিতে সেটাকে আমি যথেষ্ট পরিমাণে মানি নে। অর্থাৎ, আমার গানের কবিতাতে কথার খেলাকে যতই কম করি-না

কেন, তবু তোমার মতে মূলনীতি অনুসারে তাতে আরো যতটা বেশি সুরের দেখা দেওয়া উচিত তা আমি দিই নে। কথাটা ব্যক্তিগত হয়ে উঠল। তুমি বলবে তুমি অভিজ্ঞতা থেকে অনুভব করেছ, আমিও তোমার উল্‌টো দিকে দাঁড়িয়ে ঠিক সেই একই কথা বলব।’

আমি বললাম, “কাব্যে গানে ব্যক্তিগত অনুভূতিকে বাদ দিয়ে চলবার জো নেই। কেননা, অনুভূতিতেই তার সমাপ্তি। বুদ্ধিকে নিয়ে তার কারবার নয়, তার কারবার বোধকে নিয়ে। তাই আমার ব্যক্তিগত বোধেরই দোহাই দিয়ে আমাকে বলতে হবে যে, মনোজ্ঞ কাব্যকে সুরের সমৃদ্ধির মধ্য দিয়ে যে রকম নিবিড় ভাবে পাওয়া যায়, সুরের একান্ত সরলতার মধ্য দিয়ে সে ভাবে পাওয়া যায় না। কারণ, ললিতকলায় একান্ত সারল্য কি অনেকটা রিক্ততারই সামিল নয়?’

কবি বললেন, “ঐ “একান্ত’ বিশেষণ পদের বাটখারাটা যখনই বেমালুম তুমি দাঁড়িপাল্লায় কেবল এক দিকেই চাপালে তখনই তোমার এক-ঝোঁকা বিচারের চেহারাটা ধরা পড়ল। সুরের সারল্য একান্ত হলেও যত বড়ো দোষ, সুরের বাহুল্য একান্ত হলেও দোষটা তত বড়োই। “একান্ত’ বিশেষণের যোগে যে কথাটা বলছ ভাষান্তরে সেটা দাঁড়ায় এই যে, সুরের দূষণীয় সরলতা দোষের- যেন সুরের দূষণীয় বাহুল্য দোষের নয়! অর্থাৎ, বাহুল্যের দিকে দোষটা তোমার সহ্য হয়, সারল্যের দিকের দোষটা তোমার কাছে অসহ্য। তোমার মতে; অধিকন্তু ন দোষায়। সর্বমত্যন্তং গর্হিতং- এটাতে তোমার মন সায় দেয় না।

“কিন্তু পরস্পরের ব্যক্তিগত মেজাজ নিয়ে তর্ক করে কী হবে? জবার মালা মাথায় জড়িয়ে শাক্ত যদি সরস্বতীর শ্বেতপদ্মের দিকে কটাক্ষ করে বলে “তুমি নেহাত সাদা যাকে বলে রিক্ত’ তা হলে সরস্বতীর চেলাও জবাকে বলবে, “তুমি নেহাত রাঙা যাকে বলে উগ্র।’ এতে কেবল কথার ঝাঁজ বেড়ে ওঠে, তার মীমাংসা হয় না। আমি তাই তর্কের দিকে না গিয়ে সারল্য সম্বন্ধে আমার মনোভাবটা বলি।

“অনেক দিন আছি শান্তিনিকেতনে। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্যে অরণ্য গিরি নদীর আয়োজন নেই। যদি থাকত সেটাকে উপযুক্তভাবে ভোগ করা কঠিন হত না। কারণ সৌন্দর্যসম্পদ ছাড়াও বহুবৈচিত্র্যের একটা জোর আছে, সেটা পরিমাণগত। নানা দিক থেকে সে আমাদের চোখকে বেড়াজালে ঘেরে, কোথাও ফাঁক রাখে না।

"এখানকার দৃশ্যে আয়েজনের বিরলতায় আমাকে বিশেষ আনন্দ দেয়। সকাল বিকাল মধ্যাহ্ন এই অবারিত আকাশে আলোছায়ার তুলিতে কত রকমের সূক্ষ্ম রঙের মরীচিকা এঁকে যায়, আমার মিতভোগী অক্লান্ত চোখের ভিতর দিয়ে আমার মন তার সমস্তটার স্বাদ পুরোপুরি আদায় করে। এখানকার বাধাহীন আকাশসভায় বর্ষা বসন্ত শরৎ তাদের ঋতুবীণায় যে গভীর মীড়গুলি দিতে থাকে তার সমস্ত সূক্ষ্ম শ্রুতি কানে এসে পৌঁছয়। এখানে রিক্ততা আছে ব'লেই মনের বোধশক্তি অলস হয়ে পড়ে না, অথবা বাইরের চাপে অভিভূত হয় না।

"একটা উপমা দিই। একজন রূপরসিকের কাছে গেছে একটি সুন্দরী। তার পায়ে চিত্র-বিচিত্র-করা একজোড়া রঙিন মোজা। রূপদক্ষকে পায়ের দিকে তাকাতে দেখে মেয়েটি জিজ্ঞাসা করলে মোজার কোন্ অংশে তাঁর নজর পড়েছে। গুণী দেখিয়ে দিলেন মোজার যে অংশ ছেঁড়া। রূপসীর পা-দুটি ঐ যে মোজার ফুলকাটা কারুকাজে তানের পর তান লাগিয়েছে নিশ্চয়ই আমাদের হিন্দুস্থানী মহারাজ তার প্রতি লক্ষ করেই বলতেন "বাহবা', বলতেন "সাবাস'। কিন্তু গুণী বলেন বিধাতার কিংবা মানুষের রসরসচনায় বাণী যথেষ্টের চেয়ে একটুমাত্র বেশি হলেই তাকে মর্মে মারা হয়। সুন্দরীর পা-দুখানিই যথেষ্ট, যার দেখবার শক্তি আছে দেখে তার তৃপ্তির শেষ হয় না। যার দেখবার শক্তি অসাড়, ফুলকাটা মোজার প্রগল্ভতায় মুগ্ধ হয়ে সে বাড়ি ফিরে আসে।

"অধিকাংশ সময়েই উপাদানের বিরলতা ব্যঞ্জনার গভীরতাকে অভ্যর্থনা করে আনে। সেই বিরলতাকে কেউ-বা বলে শূন্য, কেউ পূর্ণ ব'লে অনুভব করে। পূর্বে তোমাকে একটা উপমা দিয়েছি, এবার একটা দৃষ্টান্ত দিই।

"বাংলা গীতাঞ্জলির কবিতা ইংরেজিতে আপন মনেই তর্জমা করেছিলুম। শরীর অসুস্থ ছিল, আর-কিছু করবার ছিল না। কোনোদিন এগুলি ছাপা হবে এমন স্পর্ধার কথা স্বপ্নেও ভাবি নি। তার কারণ, প্রকাশযোগ্য ইংরেজি লেখবার শক্তি আমার নেই- এই ধারণা আমার মনে বদ্ধমূল ছিল।

"খাতাখানা যখন কবি য়েট্সের হাতে পড়ল তিনি একদিন রোদেন্স্টাইনের বাড়িতে অনেকগুলি ইংরেজ সাহিত্যিক ও সাহিত্যরসজ্ঞকে তার থেকে কিছু আবৃত্তি করে শোনাবেন

ব’লে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। আমি মনের মধ্যে ভারি সংকুচিত হলেম। তার দুটি কারণ ছিল। নিতান্ত সাদাসিধে দশ-বারো লাইনের কবিতা শুনিয়ে, কোনোদিন আমি কোনো বাঙালি শ্রোতাকে যথেষ্ট তৃপ্তি পেতে দেখি নি। এমন-কি, অনেকেই আয়তনের খর্বতাকে কবিত্বের রিক্ততা ব’লেই স্থির করেন। একদিন আমার পাঠকেরা দুঃখ করে বলেছিলেন ইদানীং আমি কেবল গানই লিখছি। বলেছিলেন– আমার কাব্যকলায় কৃষ্ণপক্ষের আবির্ভাব, রচনা তাই ক্ষয়ে ক্ষয়ে বচনের দিকে ছোটো হয়েই আসছে।

“তার পরে আমার ইংরেজি তর্জমাও আমি সসংকোচে কোনো-কোনো ইংরেজি-জানা বাঙালি সাহিত্যিককে শুনিয়েছিলেম। তাঁরা ধীর গম্ভীর শান্ত ভাবে বলেছিলেন– মন্দ হয় নি, আর ইংরেজি যে অবিশুদ্ধ তাও নয়। সে সময়ে এন্‌ড্‌রুজের সঙ্গে আমার আলাপ ছিল না।

য়েট্‌স্‌ সেদিনকার সভায় পাঁচ-সাতটি মাত্র কবিতা একটির পর আর-একটি শুনিয়ে পড়া শেষ করলেন। ইংরেজ শ্রোতারা নীরবে শুনলেন, নীরবে চলে গেলেন– দস্তুর-পালনের উপযুক্ত ধন্যবাদ পর্যন্ত আমাকে দিলেন না। সে রাত্রে নিতান্ত লজ্জিত হয়েই বাসায় ফিরে গেলেম।

“পরের দিন চিঠি আসতে লাগল। দেশান্তরে যে খ্যাতি লাভ করেছি তার অভাবনীয়তার বিস্ময় সেই দিনই সম্পূর্ণভাবে আমাকে অভিভূত করেছে।

“যাই হোক, আমার বলবার কথাটা হচ্ছে এই যে, সেদিনকার আসরে যে ডালি উপস্থিত করা হল তার উপহারসামগ্রী আয়তনে যেমন অকিঞ্চিৎকর, উপাদানে তেমনি তার নিরলংকার বিরলতা। কিন্তু, সেইটুকুই রসজ্ঞদের আনন্দের পক্ষে এত অপর্যাপ্ত হয়েছিল যে, তার প্রত্যুত্তরে সাধুবাদের বিরলতা ছিল না। অলংকারবাহুল্য শ্রোতার বা স্রষ্টার নিজের মনের জন্যে কিছু জায়গা ছেড়ে দেয় না। যার মন আছে তার পক্ষে সেটা ক্লেশকর।

“কিন্তু অনেক মানুষ আছে যারা নিজের মনোহীনতার গহ্বর ভরাবার জন্যেই রসের ভোজে যায়, তারা বলে না “যৎ স্বল্পং তদিষ্টং’। তারা থিয়েটারে টিকিট কেনে শুধু নাটক শুনবে বলে নয়, রাত্তির চারটে পর্যন্ত শুনবে বলে। তারা নিজেকে চিরকাল ফাঁকি দেয়, কেবলই সেরা জিনিসটির বদলে মোটা জিনিসটাকে বাছে। সাজাই করার চেয়ে বোঝাই করাটাতে তাদের আনন্দ। এই কারণে তুমি যাকে সারল্য বলছ সেটা তাদের পক্ষে রিক্ততা নয় তো কী!’

কবি একটু থেমে বললেন, “তুমি যেমন নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলেছ, আমিও তেমনি বলব। আমি গান রচনা করতে করতে, সে গান বার বার নিজের কানে শুনতে শুনতেই বুঝেছি যে, দরকার নেই “প্রভূত’ কারু-কৌশলের। যথার্থ আনন্দ দেয় রূপের সম্পূর্ণতায়– অতি সূক্ষ্ম, অতি সহজ ভঙ্গিমার দ্বারাই সেই সম্পূর্ণতা জেগে ওঠে। ’

বললাম “কথাগুলি আমার খুবই ভালো লাগল। এর মধ্যে দুই-একটি নতুন suggestionআমি পেলাম। সেগুলি ভেবে দেখব ... তবুও আমার মনে হয় যে, সব ললিতকলার বিকাশধারাই যে অতিমাত্রায় সরলতার দিকে হবে এমন কথা জোর করে বলা যায় না। কেননা, অনেক শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর ললিতসৃষ্টি দেখা যায় যার মধ্যে একটা complex structure, একটা বৃহৎ সুষমা, একটা সমষ্টিগত মনোজ্ঞ সমাবেশ পাওয়া যায় ও তার মধ্যে একটা সত্য ও গভীর রস-উৎস বিরাজ করে। যেমন, ধরুন, বীণার তানের আনন্দঝোরার বিচিত্র লাবণ্য, য়ুরোপীয় সিম্‌ফনির বিরাট গরিমাময় গঠনকারুকলা, মধ্যযুগের য়ুরোপের অপূর্ব স্থাপত্য, তাজমহলের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাস্কর্যের গাথা।’

কবি বললেন, “এ কথা কি আমিই মানি নে? আমি কেবল বলতে চাই– সরলতায় বস্তু কম ব’লে রসরচনায় তার মূল্য কম এ কথা স্বীকার করা চলবে না, বরঞ্চ উল্‌টো। ললিতকলার কোনো-একটি রচনায় প্রথম প্রশ্নটি হচ্ছে এই যে, তাতে আনন্দ দিচ্ছে কি না। যদি দিচ্ছে হয়, তা হলে তার মধ্যে উপাদানের যতই স্বল্পতা থাকবে ততই গৌরব। বিপুল ও প্রয়াসসাধ্য উপায়ে একজন লোক যে ফল পায়, আর-একজন সংক্ষিপ্ত ও স্বল্পায়াস উপায়েই সেই ফল পেলে আর্টের পক্ষে সেইটেই ভালো; বস্তুত আর্টের সৃষ্টিতে উপায় জিনিসটা যতই হালকা ও প্রচ্ছন্ন হবে ততই সৃষ্টির দিক থেকে তার মর্যাদা বাড়বে। এই মূলনীতি যদি মানো তা হলে সকল প্রকার আর্টেই পদে পদে সতর্ক হয়ে বলতে হবে : অলমতি বিস্তরণ। বলতে হবে আর্টে প্রগল্‌ভতার চেয়ে মিতভাষ, বাহুল্যের চেয়ে সারল্য শ্রেষ্ঠ। আর্টে complex structureঅর্থাৎ বহুগ্রন্থিল কলেবরের দৃষ্টান্ত-স্বরূপে তাজমহলের উল্লেখ করেছ। আমি তো তাজমহলকে সহজ রূপেরই দৃষ্টান্ত বলে গণ্য করি। একবিন্দু অশ্রুজল যেমন সহজ তাজমহল তেমনি সহজ। তাজমহলের প্রধান লক্ষণ তার পরিমিতি– ওতে এক টুকরো পাথরও নেই যাতে মনে হতে পারে হঠাৎ তাজমহল কানে হাত দিয়ে তান লাগাতে শুরু করেছে। তাজমহলে তান নেই; আছে

মান, অর্থাৎ পরিমাণ। সেই পরিমাণের জোরেই সে এত সুন্দর। পরিমাণ বলতেই বোঝায় উপাদানের সংযম। আমের সঙ্গে কাঁঠালের তুলনা ক'রে দেখো-না। কাঁঠালের উপরকার আবরণ থেকে ভিতরকার উপকরণ পর্যন্ত সমস্তটার মধ্যেই আতিশয্য; সবটা মিলে একটা বোঝা। যেন একটা বস্তা। বাহাদুরির দিক থেকে দেখলে বাহবা দিতেই হবে। কাঁঠালের শস্যঘটিত তানবাহুল্যে মিষ্টতা নেই তাও বলতে পারি নে- নেই সৌষ্ঠব, কলারচনায় যে জিনিসটি অত্যাবশ্যক। কাঁঠালকে আমের মতো সাদাসিধে বলে না; তার কারণ এ নয় যে, কাঁঠাল প্রকাণ্ড এবং ওজনে ভারী। যার অংশগুলির মধ্যে সুগঠিত ঐক্য, সেই হচ্ছে সিম্প্‌ল্‌। যদি নতুন কথা বানাতে হয় তা হলে সেই জিনিসকে বলা যেতে পারে সংকল, অর্থাৎ তার সমস্ত কলাগুলি সুসংগত। আমাদের শাস্ত্রে ব্রহ্মকে বলে নিষ্কল, তার মধ্যে অংশ নেই, তিনি হচ্ছেন অসীম সিম্প্‌ল্‌– অথচ তাঁর মধ্যে সমস্তই আছে, সমস্তকে নিয়ে তিনি অখণ্ড। সূর্যের যে রশ্মিকে আমরা সাদা বলি তার মধ্যে বর্ণরশ্মির বিরলতা আছে তা নয়, তার মধ্যে সকল রশ্মির ঐক্য। তাজমহলও তেমনি সাদা, তার মধ্যে সমস্ত উপকরণের সুসংঘটিত সামঞ্জস্য। এই সামঞ্জস্যের সুষমাকে যদি আমরা ছিন্ন করে দেখি তবে তার মধ্যে বৈচিত্র্যের অন্ত দেখব না। রাসায়নিক বিশ্লেষণ করে দেখলে একটি অশ্রুবিন্দুতেও আমরা বহুকে দেখতে পাই, কিন্তু যে দেখাটিকে অশ্রু বলি সে নিতান্ত সাদা, সে এক। সেখানে সৃষ্টিকর্তা তাঁর ঐশ্বর্যের আড়ম্বর করতে চান নি, সরলভাবে তাঁর রূপদক্ষতা দেখিয়েছেন। তাঁর অশ্রুজলে রিক্ততা আছে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক যখন সেই অশ্রুজলের হিসাবের খাতা বের করে দেখান তখন ধরা পড়ে রিক্ততার পিছনে কতখানি শক্তি। তখন বুঝতে পারি অতিরিক্ততাই সৃষ্টিশক্তির অভাব প্রকাশ করে, আর যারা অতিরিক্ত না হলে দেখতে পায় না তাদের মধ্যে দৃষ্টিশক্তিরই দীনতা।'

কবির এ কথাটি আমার খুবই ভালো লাগল। তবে আমার সাফাই এই যে, সারল্যের মধ্যেকার এই গরিমার সম্বন্ধে আমি নিজেকে একটু সচেতন বলেই মনে করি। আবু পাহাড়ের দিলওয়ারা মন্দিরের কারুকার্য-বাহুল্যের বিরুদ্ধ সমালোচনায় এ কথা আমি লিখেছি (অর্থাৎ ললিতকলায় সারল্যের স্থান কোথায় সে সম্বন্ধে মতামত প্রকাশের সময়) –ওস্তাদি গানের সম্পর্ক তো কথাই নেই। কেবল আমার এ অবধি মনে হয়েছে যে, শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর complexity-র আবেদন অন্তত আধুনিক মনের কাছে শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর simplicity-র আবেদনের চেয়ে ঢের বেশি সাড়া পায়। সুরকে সরল করে গাওয়াকে আমি যে কারণেই হোক কখনো মনে প্রাণে

ভালোবাসতে পারি নি, যেমন বেসে এসেছি তার মধ্যে স্বরবিন্যাসের কলাকারুকে, নানান অনুভূতির আলোছায়ার বিচিত্র সমাবেশকে, সুরকে লীলোচ্ছলভাবে উৎসারিত করে তুলতে পারবে– এক কথায় স্বরসম্পদ্‌সৃষ্টিতে উদ্দাম প্রেরণাকে।

আমি কবিকে শুধু বললাম, “এ কথাটাকে আমি ভালো করে ভেবে দেখব। তাই, এখন আপনার এ মতটির সম্বন্ধে কোনো আলোচনা না করে কেবল আপনাকে এইটুকুমাত্র বলে রাখতে চাই যে, আমার এই অনুভূতিটি খুবই গভীর যে সুরসম্পদ্‌ যথাযথ ভাবে বাড়ালে তাতে করে গানের রস নিবিড়তরই হয়ে ওঠে। এটা আমি দৃষ্টান্ত দিয়ে বোধ হয় প্রমাণ করতে পারি।’

কবি বললেন, “কিরকম?’

আমি বললাম, “ধরুন, যেমন পিতৃদেবের “এ জীবনে পূরিল না সাধ’ বা “মলয় আসিয়া’ গানে। আমি আমার অনেক সুকুমারহৃদয় বন্ধুর কাছে এ গানদুটি একটু সুরের নিবিড় ব্যঞ্জনার মধ্যে গেয়ে বেশি সাড়া পেয়েছি।’

কবি বললেন, “যেটা হয়েছে সেটা হয়েছে এই সহজ কথা অস্বীকার করব কেন? যদি পূর্বপ্রচলিত কোনো বাঁধা নিয়মের সঙ্গে সেই হওয়াটা না মেলে, তা হলে বলব নিয়মটা ছিল সংকীর্ণ। কিংবা হয়তো এমনও বলতে পারি নিয়মটা ভাঙা হয়েছে বলে যে প্রতীয়মান হচ্ছে সেটাই ভুল। কিন্তু, সেইসঙ্গে এ কথা ভুললেও চলবে না যে, ব্যক্তিবিশেষের আনন্দ পাওয়াকেই এ ক্ষেত্রে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি বলে মেনে নেওয়া চলে না। রসসৃষ্টি করতেও যেমন সহজ শক্তির দরকার, রসের দরদ বোধ সম্বন্ধেও তেমনি সহজ শক্তি। রসের মূল্যনির্ধারণ মাথাগন্‌তি ভোটের দ্বারা হয় না। রসিক ও রসের সাধকদের কাছে বিধান নিতে হয়, শিক্ষা নিতে হয়। যার সহজ রসবোধ আছে তার কোনো বালাই নেই।

আমি বললাম, “তাই, যাঁরা শুধু কাব্য-অনুরাগী তাঁদের আমিও বলি যে, সুরসম্পদ্‌কে বাড়ালে গানের রস নিবিড় হল না নিষ্প্রভ হল এ সম্বন্ধে তাঁদের বিচার ভালো লাগা না-লাগাই প্রামাণ্য নয়, যেহেতু তাঁরা বরাবর গানকে বেশি কাব্য-ঘেঁষা করে দেখার দরুন সুরসম্পদ্‌বৈচিত্র্যের যথার্থ মূল্য নির্ধারণ করবার অন্তর্‌দৃষ্টিটি অর্জন করেন নি। এ ক্ষেত্রে শুধু সুর বোঝেন এমন লোকের রায়ও যেমন সন্তোষজনক হতে পারে না, শুধু কাব্য বোঝেন এমন

লোকের রায়ও তেমন নির্ভরযোগ্য হতে পারে না। আমাদের যেতে হবে তাঁদের কাছে যাঁরা কমবেশি দুইয়েরই রসজ্ঞ।’

কবি বললেন, “তোমার এই তর্কের মধ্যে ব্যক্তিগত বিশেষ ঘটনার ইঙ্গিত আছে, সুতরাং এটা তর্কের ক্ষেত্রের বাইরে। অর্থাৎ, এখানে মতের বিচার ছাড়িয়ে ব্যক্তির বিচার এসে পড়ল, অথচ ব্যক্তিটি রইল অগোচরে। বোঝা যাচ্ছে গান সম্বন্ধে কোনো-কোনো মানুষের সঙ্গে তোমার মতের মিল হয় না, তুমি যাদের সরাসরি ভাবে কাব্য-ঘেঁষা বলে জরিমানা করতে চাও; অথচ, তাদের হাতে যদি বিচারভার থাকে তা হলে তারাও তোমাকে বিশেষণ মাত্রের দ্বারা লাঞ্ছিত করতে পারে। কিন্তু, বিশেষণ তো বিচার নয়।

“আজকের আলোচনার কথাটা এই যে, আমি যে-সব গান রচনা করি তাতে সুরের যথেষ্ট প্রাচুর্য নেই ব’লে তোমার ভালো লাগে না। তুমি তার উপরে নিজের ইচ্ছামত প্রাচুর্য আরোপ করে গাইতে চাও। তার পরে যদি সেটা কারও ভাল না লাগে তবে তার কপালে কাব্য-ঘেঁষা ছাপ মেরে গীতরসিক সভা থেকে বরখাস্ত করে দেবার বিধান তোমার।

“কিন্তু, তুমি যেমন বিচারের অধিকারী, অন্য ব্যক্তিও তেমনি। এমন অবস্থায় সহজ মীমাংসা এই যে, যে ব্যক্তি গান রচনা করেছে তার সুরটিকে বহাল রাখা। কবির কাব্য সম্বন্ধেও এই রীতি প্রচলিত, চিত্রকরের চিত্র সম্বন্ধে। রচনা যে করে, রচিত পদার্থের দায়িত্ব একমাত্র তারই; তার সংশোধন বা উৎকর্ষসাধনের দায়িত্ব যদি আর-কেউ নেয় তা হলে কলাজগতে অরাজকতা ঘটে। এ কথা নিশ্চিত যে, ওস্তাদ-পরম্পরার দুর্গম কণ্ঠ-তাড়নায় তানসেনের কোনো গানেই আজ তানসেনের কিছুই বাকি নেই। প্রত্যেক গায়কই কল্পনা করে এসেছেন যে, তিনি উৎকর্ষ সাধন করছেন। রামের কুটির থেকে সীতাকে চুলে ধ’রে টেনে রাবণ যখন নিজের রথের ‘পরে চড়িয়েছিলেন তখন তিনিও সীতার উৎকর্ষসাধন করেছিলেন। তবুও রামের ভার্যারূপে বনবাসও সীতার পক্ষে শ্রেয়, রাবণের স্বর্ণপুরীও তাঁর পক্ষে নির্বাসন- এই দাম্পত্য মূলনীতিটুকু প্রমাণ করবার জন্যেই সাতকাণ্ড রামায়ণ। ললিতকলাতেও ধর্মনীতির অনুশাসন এই যে, যার যেটি কীর্তি তার সম্পূর্ণ ফলভোগ তার একলারই।

“সাহিত্যে সংগীতে এমন একদিন ছিল যখন রচয়িতার সৃষ্টিকে একান্তভাবে রচয়িতার অধিকার দেওয়া দুরূহ ছিল। আল ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে নিজের নিজের রুচি অনুসারে সর্বসাধারণে

তার উপরে হস্তক্ষেপ করে এসেছে। বর্তমান যুগে যারা দ্রব্যসম্পত্তিতে এই রকম অবারিত কম্যুনিজ্‌ম্‌ মানে আর তাই নিয়ে রক্তে যারা পৃথিবী ভাসিয়ে দিচ্ছে, তারাও কলারাজ্যে এটাকে মানে না। আদিম কালে কলাভাণ্ডারে না ছিল কুলুপ, না ছিল পাহারা। সেইজন্যেই কলারচনায় সরকারি কার্তবীর্যার্জুনের বহুহস্তক্ষেপ নিষেধ করবার উপায় ছিল না। আজকালকার দিনে ছাপাখানা ও স্বরলিপি প্রভৃতি উপায়ে নিজের রচনায় রচয়িতার দায়িত্ব পাকা করে রাখা সম্ভব, তাই রচনাবিভাগে সরকারি যথেচ্ছাচার নিবারণ করা সহজ এবং করা উচিত। নইলে দাঁড়ি টানবে কোথায়? এক কাব্যে এক রচয়িতার স্বত্ব বিচার করা সহজ, কিন্তু এক কাব্যে অসংখ্য রচয়িতার স্বত্ব বিচার করবে কে এবং কী উপায়ে? এ যে পঞ্চপাণ্ডবের পাঞ্চালীর বাড়া, এ যে পঞ্চাশ হাজার রানী।

“তুমি বলবে আমাদের দেশের গানের বৈশিষ্ট্যই তাই, গায়কের রুচি ও শক্তিকে সে দরাজ জায়গা ছেড়ে দেয়। কিন্তু, সর্বত্র এ কথা খাটে না। খাটে কোথায়? যেখানে গানের চেয়ে রাগিণী প্রধান। রাগিণী জিনিসটা জলের ধারা; বস্তুত সেই রকম আকৃতি-পরিবর্তনের দ্বারাই তার প্রকৃতির পরিচয়। কিন্তু, আমি যাকে গান বলি সে হচ্ছে সজীব মূর্তি, যে যেমন-খুশি তার হাত পা নাক চোখের বদল করতে থাকলে জীবনের ধর্ম ও মূর্তির মূল প্রকৃতিকেই নষ্ট করা হয়। সে হয় কেমন? যেমন, চাঁপা ফুল পছন্দ নয় ব’লে তাকে নিয়ে স্থলপদ্ম গড়বার চেষ্টা। সে স্থলে উচিত চাঁপার বাগান ত্যাগ করে স্থলপদ্মের বাগানে আসন পাতা। কারণ, যে জিনিস জীবধর্মী তাকে উপেক্ষা করলেও চলে, কিন্তু উৎপীড়ন করলে অন্যায় হয়।’

৪

…দিলীপদা বললেন, “সাঙ্গীতিকীর সম্পর্কে আপনি আমাকে যে চিঠিগুলি লিখেছেন তাতে একটা কথা প্রমাণ হয় নি কি, যে, আপনি আপনার পূর্ব মত বদলেছেন? জীবনস্মৃতিতে গান নিয়ে যে-সব কথা আপনি লিখেছেন আপনি তো তার বিরুদ্ধ মতই পোষণ করছেন আজকাল।’

কবি বললেন, “সারাজীবন ভরে একটা নির্দিষ্ট মতের অনুবর্তন করে চলাটা মনের স্বধর্মের পরিচায়ক নয়। আমার মত যদি বদলেই থাকে তাতে আমি ক্ষোভ করি নে। একটা কথা আমি ভেবে দেখেছি– গানের ক্ষেত্রে, শুধু গানের ক্ষেত্রে কেন, সমস্ত চারুশিল্পের ক্ষেত্রে নতুন সৃষ্টির পথ যদি খোলা না’ই রইল তবে তা কিছুতেই শিল্পের পাঙ্‌ক্তেয় হতে পারে না। শিল্পী নিজের

পথ নিজে করে নেবে, প্রাচীন সংগীতের কণ্ঠে ঝুলে থাকাটা তার সইবে কেন? পুরাতনকে বর্জন করতে বলি নে, কিন্তু নতুন সৃষ্টির পথে যদি তাতে কাঁটার বেড়া দেখা দেয় তবে তা নৈব নৈব চ। আকবর শা'র দরবারে তানসেন মস্ত বড়ো গাইয়ে ছিলেন, কেননা তাঁর শিল্পপ্রতিভা নিত্য নতুন সৃষ্টির খাতে রসের বান ডাকিয়েছিল– আকবর শা'র যুগে ছিল সে ঘটনা অভিনব। কিন্তু, এ কালের মানুষ আমরা, আমরা কেন এখনো তানসেনের গানের জাবর কেটে চলব অন্ধ অনুকরণের মোহে? এই যে সমস্ত হিন্দুস্থানী ওস্তাদ দেখতে পাও এদের হয়তো কারও কারও প্রতিভা আছে, কিন্তু এদের যেটুকু প্রতিভা সেটা নিঃশেষিত হয়ে যায় বাঁধা পথের অনুবর্তন করতে করতেই। সুতরাং নতুন সৃষ্টির কোনো জায়গা সেখানে থাকে না। কিন্তু, বাংলা গনের কথা স্বতন্ত্র, এর অপূর্ব সম্ভাবনার কথা ভাবতেই আমার রোমাঞ্চ হয়। বাংলা গানে নিত্য নতুন স্বকীয়তার পথ তোমরা সৃষ্টি করতে থাকো, তাতেই বাংলা গান খুঁজে পাবে সার্থকতা। তুমি তো অনেক দিন য়ুরোপে ছিলে, তাদের সংগীতের ভালো ভালো জিনিস দিয়ে যদি বাংলা গানের সাজি ভরাতে পারো তবে সেটা একটা সত্যিকারের কাজ করা হবে। অন্ধ অনুকরণ দোষের, কিন্তু স্বীয়করণ নয়।'

দিলীপদা প্রশ্ন করলেন, "আপনি নতুন সৃষ্টির কথা এত বললেন, স্বকীয়তাকে নানা দিক থেকে সমর্থনও করলেন, অথচ এতদিন আপনি আপনার স্বরচিত গানের ব্যাপারে একটু রক্ষণশীল ছিলেন না কি? আমার তো মনে হয় আপনি কিছুদিন আগে পর্যন্তও গায়কের সুরবিহারের (improvisation) স্বাধীনতাকে সমর্থন করেন নি।'

কবি বললেন, "এখনো আমি সমান রক্ষণশীল আছি। তবে একটা কথা আছে। তোমাদের মতো প্রতিভাবান শিল্পীদের দিয়ে আমার ভয় নেই, কিন্তু এ পথ সবারই জন্যে নয় জেনো। যাকে-তাকে যদৃচ্ছা পক্ষবিস্তার করার স্বাধীনতা দিলে তাতে সুফলের পরিবর্তে অপফলটাই ফলবে বেশি করে। সেটা বাঞ্ছনীয় নয়। খুব মুষ্টিমেয় সংখ্যক শিল্পীগায়কের 'পরে থাকবে এর দায়িত্ব।'

কথায় কথায় নানা ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ এসে পড়ল। "চণ্ডালিকা'র কথাও উঠল। আমাদের মধ্যে একজন বললেন, "চণ্ডালিকা খুব চমৎকার হয়েছে।' তাতে কবি বললেন, "তোমরা হয়তো

জানো না এর জন্যে আমাকে কী অমানুষিক পরিশ্রম করতে হয়েছে। দিন নেই, রাত নেই, এদেরকে অসীম ধৈর্যের সঙ্গে গড়ে পিটে নিতে হয়েছে– সে যে কী কষ্ট তোমরা বুঝবে না।’

তার পর একটু থেমে বললেন, “অথচ গানের ভিতর দিয়ে আমি যে জিনিসটি ফুটিয়ে তুলতে চাই সেটা আমি কারও গলায় মূর্ত হয়ে ফুটে উঠতে দেখলুম না। আমার যদি গলা থাকত তা হলে হয়তো বা বোঝাতে পারতুম কী জিনিস আমার মনে আছে। আমার গান অনেকেই গায়, কিন্তু নিরাশ হই শুনে। একটিমাত্র মেয়েকে জানতুম যে আমার গানের মূল সুরটিকে ধরতে পেরেছিল– সে হচ্ছে ঝুনু, সাহানা। আমি গানের প্রেরণা পেয়েছি আমার ভিতর থেকে, তাই আপন লীলায় আপন ছন্দে ভিতর থেকে যে সুর ভেসে ওঠে তাই আমার গান হয়ে দাঁড়ায়। ওস্তাদের কাছে “নাড়া’ বেঁধে সংগীতশিক্ষার দহরম-মহরম করা, সে আমাকে দিয়ে কোনোকালেই হল না। ভালোই হয়েছে যে, ওস্তাদের কাছে হাতে খড়ি দিতে হয় নি। আমাদের বাড়িতে উচ্চাঙ্গ সংগীতের খুব চর্চা হত সে কথা তোমরা সবাই জানো। অথচ আশ্চর্য, এ বাড়ির ছেলে হয়েও আমি কোনোদিনও ওস্তাদিয়ানার জালে বাঁধা পড়ি নি। আড়ালে-আবডালে থেকে যেটুকু শিখেছি সেটুকুই আমার শেখা। বারান্দা পার হতে গিয়ে কিংবা জানালার ও পাশে বসে থাকার কালে যে-সব সুর ভেসে আসত কানে সেগুলোই মনের ভিতর গুঞ্জরণ করে ফিরত প্রতিনিয়ত। তার থেকেই পেয়েছি আমি গানের প্রেরণা। বর্ষার দিনে ভিতরে ভূপালী সুরের আলাপ চলেছে, আমি বাইরে থেকে শুনছি। আর, কী আশ্চর্য দেখো, পরবর্তী জীবনে আমি যত বর্ষার গান রচনা করেছি তার প্রায় সব-কটিতেই অদ্ভুতভাবে এসে গেছে ভূপালী সুর। কাজেই বুঝেছ –সংগীতশিক্ষাটা আমার সংস্কারগত, ধরাবাঁধা রুটিনমাফিক নয়।

“ছোটোবেলায়...আমার গলা খুব ভালো ছিল। সেকালের সেরা ওস্তাদ যদুভট্ট– অত বড়ো গাইয়ে বাংলায় আজ পর্যন্ত হয়েছে কিনা সন্দেহ– আমাদের বাড়ির সভাগায়ক ছিলেন। তিনি কত চেষ্টা করেছিলেন আমাকে গান শেখাবার জন্যে, কিন্তু মেরে-কেটেও আমাকে বাগ মানাতে পারেন নি। সে ধাতের ছেলেই আমি নই। কোনো রকম শেখার ব্যাপারে আমার টিকিটি খুঁজে পাবার জো ছিল না।...

...”স্কুল কলেজে শিক্ষা হতেও পারে না। এই-যে বিশ্ববিদ্যালয়ে সংগীতশিক্ষার ব্যবস্থা হচ্ছে এর সম্পর্কে আমি খুব আশান্বিত নই। কেননা, শিল্পের ক্ষেত্রে ব্যাপক ব্যবস্থার কোনো

দাম নেই। যে প্রেরণা থেকে প্রকৃত গানের জন্ম ক্লাস্‌রুমের চতুঃসীমার ভিতর কেউ তা পেতে পারে না। স্বরলিপিপরিচয় কিংবা ধরাবাঁধা কয়েকটা গান শেখাতেই ঐ ব্যবস্থার সমস্ত কৃতিত্ব যাবে ফুরিয়ে। দল পাকিয়ে শিক্ষা হয় না, শিক্ষাকে কার্যকরী করতে হলে ছোটোখাটো শ্রেণীবিভাগের 'পরে জোর দিতে হবে।...

..."বাংলাদেশের মাটিতে আছে ফলপ্রসূ কল্পনার বীজ, তাই বাঙালির রয়েছে অনন্ত সম্ভাবনা। এই জেনারেশ্যানের হাত থেকে হয়তো খুব বেশি-কিছু পাওয়া যাবে না, কিন্তু পরবর্তী কালকে দাবিয়ে রাখবে কে? এটা আমি কিছুতেই ভেবে পাই নে নিরবচ্ছিন্ন রাজনীতির চর্চাতেই কী করে দেশ উদ্ধার পেতে পারে। শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, নাচ, গান, এদের কি কিছু দাম নেই? আনন্দকে অপাঙ্‌ক্তেয় করে রেখে এমন কী চতুবর্গ ফল লাভ হবে বুঝি নে। দেশের অস্থিমজ্জায় আনন্দকে চারিয়ে তোলো, তাতে সব দিক থেকেই লাভ হবে, এমন-কি রাজনীতির দিক থেকেও।' ...

৫

..."হিন্দুস্থানী' সংগীত আমি সর্বান্তঃকরণে ভালোবাসি–আজ ব'লে নয়, বাল্যকাল থেকেই। মনে করি ভালোবাসা উচিত। প্রতি সুন্দর সৃষ্টি পুরানো হলেও রসিকের মনে আনন্দের সাড়া তুলবে এই তো হওয়া উচিত। যাঁরা সত্যিকার ভালো হিন্দুস্থানী গান শুনেও বলেন "ও কী তা-না-না-না মেও মেও, বাপু, ও ভালো লাগে না'–তাঁদেরকে আমি বলব, "তোমাদের ভালো লাগে না এজন্যে তোমাদের সঙ্গে তর্ক করব না–কেননা, রুচি নিয়ে তর্ক নিষ্ফল–কেবল বলব তোমরা এ কথা সগৌরবে বোলো না লক্ষ্মীটি!' কারণ, ভালো জিনিস ভালো না লাগাটা লজ্জারই বিষয়, গৌরবের নয়। সুতরাং, শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর হিন্দুস্থানী সংগীত যখন সত্যিই সংগীতের একটি মহৎ বিকাশ, তখন সেটা যদি তোমাদের কারুর ভালো না'ও লাগে তো সলজ্জেই বোলো–"লাগল না', বোলো–"ও রসের রসিক হবার কোনো সাধনাই করি নি বা করবার সময় পাই নি–নইলে লাগত নিশ্চয়ই' ।

"আমার ভালো লাগে। উৎকৃষ্ট হিন্দুস্থানী সংগীত আমি ভালোবাসি বলেছি বহুবারই। কেবল আমি যে, ভালো জিনিসকেও ভালোবাসতে হবে কিন্তু মোহমুক্ত হয়ে। সব রকমের মোহ সর্বনেশে। তাজমহল আমার ভালো লাগে ব'লেই যে তাজমহলের স্থাপত্যশিল্পের অনুকরণে

প্রতি বসতবাটীতে গম্বুজ ওঠাতে হবে এ কখনোই হতে পারে না। হিন্দুস্থানী সংগীত ভালো লাগে ব'লেই যে ক্রমাগত পুনরাবৃত্তি করতে হবে এ একটা কথাই নয়। অজন্তার ছবি খুবই ভালো কে না মানবে? কিন্তু তাই ব'লে উপর দাগা বুলিয়ে আমাদের চিত্রলোকে মুক্তি খুঁজতে হবে বললে সেটা একটা হাসির কথা হয়। তবে প্রশ্ন ওঠে: অজন্তা থেকে, তাজমহল থেকে, হিন্দুস্থানী সংগীত থেকে আমরা কী পাব? না, প্রেরণা–ইন্‌স্‌পিরেশন্‌। সুন্দরের একটা মস্ত কাজ এই প্রেরণা দেওয়া। কিসের? না, নবসৃষ্টির। তানসেন আকবর শা মরে ভূত হয়ে গেছেন কবে, কিন্তু আমরা আজও চলতে থাকব তাঁদের সুরের শ্রাদ্ধ ক'রে? কখনোই না। তানসেনের সুর শিখব, কিন্তু কী জন্যে? না, নিজের প্রাণে যাকে তুমি বলছ renaissance–নবজন্ম–তারই আবাহন করতে। আমিও এই কথাই বলে আসছি বরাবর যে, নবসৃষ্টির যত দোষ যত ত্রুটিই থাকুক-না কেন, মুক্তি কেবল ঐ কাঁটাপথেই–বাঁধা সড়ক গোলাপদেলর পাপড়ি দিয়ে মোড়া হলেও সে পথ আমাদের পৌঁছিয়ে দেবে শেষটায় চোরা গলিতেই। আমরা প্রত্যেকেই মুক্তিপন্থী, আর মুক্তি কেবল নবসৃষ্টির পথেই–গতানুগতিকতার নিষ্কলঙ্ক সাধনার পথে নৈব নৈব চ।

"হিন্দুস্থানী সংগীতের জরার দশার কথা বলেছিলে। হয়েছে কী, ও সংগীত হয়ে পড়েছে ক্লাসিক। ক্লাসিক মানে একটা সর্বাঙ্গসুন্দুরতার পারফেক্‌শনের ফর্মে অচল প্রতিষ্ঠা। এ-হেন পূর্ণতা পূর্ণ ব'লেই মরেছে। পূর্ণতায় সিদ্ধির সঙ্গে আসে স্থিতি। কিন্তু, শিল্পের মুক্তি চাইতে পারে না স্থিতির অচলায়তন। তাই ইতিহাসে দেখবে অঘটন ঘটে যখন বেশি খুঁতখুঁতেপনায় আমাদের ধরে এই ক্লাসিকিয়ানার সেকেলিয়ানার মোহে।...

"হিন্দুস্থানী সংগীতের বিরুদ্ধে আজ এই-যে বিদ্রোহের চিহ্ন দিকে দিকে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে তাকে তাই অকল্যাণজনক মনে করা সংগত নয়। হিন্দুস্থানী বীণাপাণি আজ শবাসনা; তাঁর এ আসনকে চাই টলানো। নইলে কমলাসনারও হবে ঐ নির্জীবন আসনেরই দশা–সে মরবে। বাংলা গানে দেখো হিন্দুস্থানী সুরই তো পনেরো আনা। কাজেই কেমন করে মানব যে বাংলা গানের সঙ্গে হিন্দুস্থানী সংগীতের দা-কুমড়ো সম্বন্ধ? বাংলা গানে হিন্দুস্থানী সুরের শাশ্বত দীপ্তিই যে নবজন্ম পেয়েছে এ কথা ভুললে তো চলবে না। আমরা যে বিদ্রোহ করেছি সে হিন্দুস্থানী সংগীতের আত্মপ্রসাদের বিরুদ্ধে, গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে, তার আনন্দদানের বিরুদ্ধে না-কেননা, আমাদের গানেও তো আমরা হিন্দুস্থানী গানের রাগরাগিণীর প্রেরণাকেই মেনে নিয়েছি। হিন্দুস্থানী সংগীতকে আমরা চেয়েছি, কিন্তু আপনার ক'রে পেলে তবেই না

পাওয়া হয়। হিন্দুস্থানী সুরবিহার প্রভৃতি শুনে আমি খুশি হই, কিন্তু বলি: বেশ, খুব ভালো, কিন্তু ওকে নিয়ে আমি করব কী? আমি চাই তাকে যে আমার সঙ্গে কথা কইবে। প্রাকৃত ও সাধু বাংলার দৃষ্টান্ত নিলে এ কথাটা পরিষ্কার হবে।...

“হিন্দুস্থানী সুরে তাই মিশেল আনতে আমাদের বাধবে কেন? আমি মানি রাগিণীর একটা নিজস্ব মহিমা আছে। এও মানি যে রাগরাগিণীর পরিচয় বাঞ্ছনীয়। কিন্তু ঐ-যে বললাম তা থেকে, প্রেরণা পেতে, তাকে নকল করতে নয়। হিন্দুস্থানী সংগীত কেমন জানো? যেন শিব। রাগরাগিণীর তপস্যা হল শৈব বিশুদ্ধির তপস্যা। কিন্তু, তাইতেই সে মরল। এল উমা, সঙ্গে এল ঐ ফুলের তীরন্দাজ ঠাকুরটি যার নাম ইংরাজিতে “প্যাশন’। আমি বলি যুগে যুগে ক্লাসিসিজ্‌ম্‌-এর শৈব তপস্যা ভাঙতে হবে এই প্যাশনে, স্থাণুকে করতে হবে বিচলিত। নিষ্ক্রিয় নির্বিচলতার মধ্যেও এক রকমের মহিমা আছে মানি, সে মহান্‌। কিন্তু, সৃষ্টির গতি থাকলে তবেই এ স্থিতির নিষ্ক্রিয়তার বৃত্ত হয় পূর্ণ। প্রকৃতি বিনা পুরুষকে চাইলে পরিণাম নির্বাণ-কৈবল্য। সে পথে, অন্তত, শিল্পের মুক্তি নেই। সাগরপারের ঢেউও আমাদের প্রাণে জাগাক এই প্যাশন-সংরাগ। তাতে ভুলচুক হবে-হোক না-নির্ভুলতম ঘুমের চেয়েও ভুলে-ভরা জাগার দাম ঢের বেশি নয় কি?

“শেষ কথা সুরবিহারের সম্বন্ধে। ইংরেজি ইম্প্রভাইজেশন কথাটির তুমি বাংলা করেছ সুরবিহার (বেশ তর্জমা হয়েছে)-এও আমি ভালোবাসি। এতে যে গুণী ছাড়া পায় তাও মানি। আমার অনেক গান আছে যাতে গুণী এ রকম ছাড়া পেতে পারেন অনেকখানি। আমার আপত্তি এখানে মূলনীতি নিয়ে নয়, তার প্রয়োগ নিয়ে।

“কতখানি ছাড়া দেব? আর, কাকে? বড়ো প্রতিভা যে বেশি স্বাধীনতা দাবি করতে পারে এ কথা কে অস্বীকার করবে? কিন্তু, এ ক্ষেত্রে ছোটো বড়োর তফাত আছেই, যে কথা সেদিন বলেছিলাম।

“আর-একটা কথা। গানের গতি অনেকখানি তরল, কাজেই তাতে গায়ককে খানিকটা স্বাধীনতা তো দিতেই হবে, না দিয়ে গতি কী? ঠেকাব কী করে? তাই, আদর্শের দিক দিয়েও আমি বলি নে যে, আমি যা ভেবে অমুক সুর দিয়েছি তোমাকে গাইবার সময়ে সেই ভাবেই ভাবিত হতে হবে। তা যে হতেই পারে না। কারণ, গলা তো তোমার এবং তোমার গলায় তুমি

তো গোচর হবেই। তাই এক্‌স্‌প্রেশনের ভেদ থাকবেই যাকে তুমি বলছ ইন্টারপ্রেটশনের স্বাধীনতা। বলছিলে বিলেতেও গায়ক-বাদকের এ স্বাধীনতা মঞ্জুর। মঞ্জুর হতে বাধ্য। সাহানার মুখে যখন আমার গান শুনতাম তখন কি আমি শুধু আপনাকেই শুনতাম? না তো। সাহানাকেও শুনতাম; বলতে হত: আমার গান সাহানা গাইছে। তোমার ঢঙের সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই-যে তোমার একটা নিজস্ব ঢঙ গড়ে উঠেছে, এটা তো খুবই বাঞ্ছনীয়। তাই তোমার স্বকীয় ঢঙে তুমি "হে ক্ষণিকের অতিথি' গাইলে যে ভাবে, আমার সুরের গঠনভঙ্গি রেখে এক্‌স্‌প্রেশনের যে স্বাধীনতা তুমি নিলে, তাতে আমি সত্যিই খুশি হয়েছি। এ গান তুমি গ্রামোফোনে দিতে চাইছ, দিয়ো–আমার আপত্তি নেই। কারণ, এতে আমার সুররূপের কাঠামোটি (structure) জখম হয় নি। তোমার এ কথা আমিও স্বীকার করি যে, সুরকারের সুর বজায় রেখেও এক্‌স্‌প্রেশনে কম-বেশি স্বাধীনতা চাইবার এক্তিয়ার গায়কের আছে। কেবল প্রতিভা অনুসারে কম ও বেশির মধ্যে তফাত আছে এ কথাটি ভুলো না। প্রতিভাবানকে যে স্বাধীনতা দেব অকুণ্ঠে, গড়পড়তা গায়ক ততখানি স্বাধীনতা চাইলে "না' করতেই হবে।'

কবির বলা কথাগুলি লিখলাম দ্বিপ্রহরে ও বিকেলে তাঁকে পড়ে শোনালাম। কবি খুশি হয়ে বললেন, কথাগুলি আমারই এ কথা স্বচ্ছন্দে বলতে পারি, লেখাও খুব ভালো হয়েছে, তুমি ছাপতে পারো।'

৬

..."ললিতসৃষ্টিতে যখন প্রথম দিকে মানুষ খানিকটা চলে আধোছায়া আধোআলোর রাজ্যে তখন অপরে যদি উৎসাহ দেয় তা হলে দেখা যায়–ছায়া কাটে, আলো বাড়ে। সে সময়ে তাই বড়ো কৃতজ্ঞ বোধ হয় যখন দেখি আমি যা উপলব্ধি করছি অপরের মনেও তার রঙ ধরছে–তাই না তারা সায় দিল প্রশংসার ঢেউ তুলে। কিন্তু, পরে–যখন আমাদের আত্মপ্রতীতি দানা বাঁধে, গোধুলির ছায়া যখন আলোর কাছে হার মানে, তখন কী দরকার অপরের স্বীকৃতির? তখন কি মনে হয় না–আমি যা পেয়েছি তা যখন নিশ্চয়ই পেয়েছি তখন অপরের না করায় তো আর সেটা না-পাওয়া হয়ে যেতে পারে না? আনন্দ হল সৃষ্টির অনুষঙ্গী, নিত্যসঙ্গী–সে যখন এসে বলে "অয়মহং ভোঃ– আমি আছি হে' তখন তাকে নামঞ্জুর করবে সাধ্য কার? কাজেই তখনো কেন আমরা হাত পাতব অপরের কাছে–তা সে আমাদের সমসাময়িকদের কাছেই হোক

বা নিত্যকালের ভাবী সভাসদ্‌দের কাছেই হোক? স্বয়ং আত্মপ্রতীতি যখন শিরোপা দিল তখন অপরের সেলামি তৃপ্তি দিতে পারে, কিন্তু অপরিহার্য সে নয়।

..."আমি যখন গান বাঁধি তখনই সব চেয়ে আনন্দ পাই। মন বলে–প্রবন্ধ লিখি, বক্তৃতা দিই, কর্তব্য করি, এ-সবই এর কাছে তুচ্ছ। আমি একবার লিখেছিলাম–

যবে কাজ করি,
প্রভু দেয় মোরে মান।
যবে গান করি,
ভালোবাসে ভগবান।

এ কথা বলি কেন?–এইজন্যে যে, গানে যে আলো মনের মধ্যে বিছিয়ে যায় তার মধ্যে আছে এই দিব্যবোধ যে, যা পাবার নয় তাকেই পেলাম আপন ক'রে, নতুন ক'রে। এই বোধ যে, জীবনের হাজারো অবান্তর সংঘর্ষ হানাহানি তর্কাতর্কি এ-সব এর তুলনায় বাহ্য- এই'ই হল সারবস্তু–কেননা, এ হল আনন্দলোকের বস্তু, যে লোক জৈবলীলার আদিম উৎস। প্রকাশলীলায় গান কিনা সব চেয়ে সূক্ষ্ম etherealতাই তো সে অপরের স্বীকৃতির স্থূলতার অপেক্ষা রাখে না। শুধু তাই নয়, নিজের হৃদয়ের বাণীকে সে রাঙিয়ে তোলে সুরে। যেমন, ধরো, যখন ভালোবাসার গান গাই তখন পাই শুধু গানের আনন্দকেই না; ভালোবাসার উপলব্ধিকেও মেলে এমন এক নতুন নৈশ্চিত্যের মধ্যে দিয়ে যে, মন বলে পেয়েছি তাকে যে অধরা, যে আলোকবাসী, যে "কাছের থেকে দেয় না ধরা–দূরের থেকে ডাকে' ।

"কিন্তু, তা ব'লে এ কথা মনে করে বোসো না যেন যে, নিত্যকালের সাড়াকে আমি অস্বীকার করছি। বরং নিত্যকালকে মানি ব'লেই বর্তমান কালকে অতিস্বীকারের মর্যাদা দিতে বাধে। না বেধেই পারে না। কারণ, প্রতি যুগের মধ্যেই আছে বটে কয়েকটি নিত্যকালের মন, যাদের নাম রসিক মন–কিন্তু, বাকি সব? তাদের মন তো নিত্যমন নয়, সত্য রসিক তো তারা নয়। অতীত কালের সাড়া দেবার নানান ধারা পর্যালোচনা ক'রে ও ভাবী কালের সাড়া কল্পনা করে তবে এ কথা বুঝতে পারি, চিনতে পারি তাদেরকে যাদের জন্য গান বাঁধি, কবিতা লিখি।...

"য়ুরোপে প্রথম যৌবনে যখন আমি ওদের গান শুনতে যাই তখন আমার ভালো লাগে নি। কিন্তু, আমি দেখতাম সার বেঁধে পর পর ওরা দাঁড়িয়ে থাকে ঘন্টার পর ঘন্টা টিকিটের

জন্যে। কী যে আগ্রহ, কী যে আনন্দ ওদের ভালো কন্‌সার্ট-হলে ভালো গান শুনে–দেখেছ তো তুমিও স্বচক্ষে। প্রথম-প্রথম আমি বুঝতাম না ওদের গান। কিন্তু, তা ব”লে এ কথা কখনো বলি নি যে, ওদের কী যে সব বাজে গান! বলতাম আমিই বুঝতে পারছি না এর মর্ম, ওদের গানের ইডিয়ম জানি নে ব’লে, শিখি নি ব’লে। অর্থাৎ, ওদের গানে প্রথম-প্রথম আনন্দ না পেলেও এমন অশ্রদ্ধার কথা কোনোদিন বলি নি যে, আনন্দ পাওয়াটা ওদের অন্যায়।

“এইখানেই আসে শ্রদ্ধার কথা; তুমি যাকে বলছ সাড়ার বৃত্ত তা পূরে ওঠে এই শ্রদ্ধা থাকলে তবেই। কিন্তু, এ- সব সময়ে সাড়া না পাওয়াটা স্রষ্টার কাছে যতখানি দুর্ভাগ্য তার দশগুণ দুর্ভাগ্য তাদের–যারা সাড়া দিতে পারল না। আক্ষেপ হয় সত্যিই তাদের কথা ভেবে। কারণ, স্রষ্টা যখন সত্য সৃষ্টি করলেন তখন গ্রহীতারা সবাই মুখ ফেরালেও তাঁর আনন্দের তো মার নেই, তিনি তো পেলেন সৃষ্টির আলো আকাশ বাতাস আনন্দ। কিন্তু, যে দুর্ভাগা এ আলোয় এ হাওয়ায় এ আনন্দে সাড়া দিতে পারল না, কিছুই পেল না, তার চেয়ে শোচনীয় অবস্থা আর কার বলো।…

পুরাতন প্রসঙ্গ

একদিকে…individual…আর একদিকে universal…কিন্তু ওয়াগনার ও বেটোভেনের মতো বিপুল মানবসমাজের বিচিত্র সুখদুঃখের ঘাতপ্রতিঘাত একটা বিরাট ছন্দে এর মধ্যে ধ্বনিত হয়ে ওঠে না। য়ুরোপের সংগীত এক্‌লার আনন্দের কিংবা বেদনার জিনিস নয়, বিজনের সামগ্রী একেবারেই হতে পারে না, সে individual নয়,সে human…/ তার বৈচিত্র্য ও বিপুলতা একেবারে আমাদের অভিভূত করে ফেলে।… কেমন করে দুইয়ের সামঞ্জস্য বিধান করা যেতে পারে [য়ুরোপীয়ে ও ভারতীয়ে,] এ এক কঠিন সমস্যা।

২৯ মার্চ, ১৯২৫

ছিন্নপত্রাবলী

ইন্দিরা দেবীকে লিখিত

ভৈরবী সুরের মোচড়াগুলো কানে এলে জগতের প্রতি এক রকম বিচিত্র ভাবের উদয় হয়… মনে হয় একটা নিয়মের হস্ত অবিশ্রাম আর্গিন যন্ত্রের হাতা ঘোরাচ্ছে এবং সেই ঘর্ষণবেদনায় সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মর্মস্থল হতে একটা গম্ভীর কাতর করুণ রাগিণী উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে–সকাল বেলাকার সূর্যের সমস্ত আলো ম্লান হয়ে এসেছে, গাছপালারা নিস্তব্ধ হয়ে কী যেন শুনছে এবং আকাশ একটা বিশ্বব্যাপী অশ্রুর বাষ্পে যেন আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে–অর্থাৎ, দূর আকাশের দিকে চাইলে মনে হয় যেন একটা অনিমেষ নীল চোখ কেবল ছল্‌ছল্‌ করে চেয়ে আছে।

ভারতবর্ষের যেমন বাধাহীন পরিষ্কার আকাশ, বহুদূরবিস্তৃত সমতলভূমি আছে, এমন য়ুরোপের কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। এইজন্যে আমাদের জাতি যেন বৃহৎ পৃথিবীর সেই অসীম ঔদাস্য আবিষ্কার করতে পেরেছে। এইজন্যে আমাদের পূরবীতে কিংবা টৌড়িতে সমস্ত বিশাল জগতের অন্তরের হাহাধ্বনি যেন ব্যক্ত করছে, কারও ঘরের কথা নয়। পৃথিবীর একটা অংশ আছে যেটা কর্মপটু, স্নেহশীল, সীমাবদ্ধ, তার ভাবটা আমাদের মনে তেমন প্রভাব বিস্তার করবার অবসর পায় নি। পৃথিবীর যে ভাবটা নির্জন, বিরল, অসীম, সেই আমাদের উদাসীন করে দিয়েছে। তাই সেতারে যখন ভৈরবীর মিড় টানে, আমাদের ভারতবর্ষীয় হৃদয়ে একটা টান পড়ে।

পরশুদিন অমনি বোটের জানলার কাছে চুপ করে বসে আছি, একটা জেলেডিঙিতে একজন মাঝি গান গাইতে চলে গেল–খুব যে সুস্বর তা নয়–হঠাৎ মনে পড়ে গেল বহুকাল হল ছেলেবেলায় বাবামশায়ের সঙ্গে বোটে করে পদ্মায় আসছিলুম।–একদিন রাত্তির প্রায় দুটোর সময় ঘুম ভেঙে যেতেই বোটের জানলাটা তুলে ধরে মুখ বাড়িয়ে দেখলুম নিস্তরঙ্গ নদীর উপরে ফুট্‌ফুটে জ্যোৎস্না হয়েছে, একটি ছোট্ট ডিঙিতে একজন ছোকরা একা একলা দাঁড় বেয়ে চলেছে, এমনি মিষ্টি গলায় গান ধরেছে–গান তার পূর্বে তেমন মিষ্টি কখনো শুনি নি। হঠাৎ মনে

হল আবার যদি জীবনটা ঠিক সেইদিন থেকে ফিরে পাই! আর একবার পরীক্ষা করে দেখা যায়–‘এবার তাকে আর তৃষিত শুষ্ক অপরিতৃপ্ত করে ফেলে রেখে দিই নে–কবির গান গলায় নিয়ে একটি ছিপ্‌ছিপে ডিঙিতে জোয়ারের বেলায় পৃথিবীতে ভেসে পড়ি, গান গাই এবং বশ করি এবং দেখে আসি পৃথিবীতে কোথায় কী আছে; আপনাকেও একবার জানান দিই, অন্যকেও একবার জানি; জীবনে যৌবনে উচ্ছ্বসিত হয়ে বাতাসের মতো একবার হু হু করে বেড়িয়ে আসি, তার পরে ঘরে ফিরে এসে পরিপূর্ণ প্রফুল্ল বার্ধক্য কবির মতো কাটাই।

আজ সকালে একটা সানাইয়েতে ভৈরবী বাজাচ্ছিল, এমনি অতিরিক্ত মিষ্টি লাগছিল যে সে আর কী বলব–আমার চোখের সামনেকার শূন্য আকাশ এবং বাতাস পর্যন্ত একটা অন্তর্‌নিরুদ্ধ ক্রন্দনের আবেগে যেন স্ফীত হয়ে উঠেছিল–বড়ো কাতর কিন্তু বড়ো সুন্দর–সেই সুরটাই গলায় কেন যে তেমন করে আসে না বুঝতে পারি নে। মানুষের গলার চেয়ে কাঁসার নলের ভিতরে কেন এত বেশি ভাব প্রকাশ করে! এখন আবার তারা মূলতান বাজাচ্ছে–মনটা বড়োই উদাস করে দিয়েছে–পৃথিবীর এই সমস্ত সবুজ দৃশ্যের উপরে একটি অশ্রুবাষ্পের আবরণ টেনে দিয়েছে–এক-পর্দা মূলতান রাগিণীর ভিতর দিয়ে সমস্ত জগৎ দেখা যাচ্ছে। যদি সব সময়েই এই রকম এক-একটা রাগিণীর ভিতর দিয়ে জগৎ দেখা যেত, তা হলে বেশ হত। আমার আজকাল ভারি গান শিখতে ইচ্ছে করে–বেশ অনেকগুলো ভূপালী... এবং করুণ বর্ষার সুর– অনেক বেশ ভালো ভালো হিন্দুস্থানী গান– গান প্রায় কিচ্ছুই জানি নে বললেই হয়।

“বড়ো বেদনার মতো’ গানের সুরটা ঠিক হয়তো মজলিসি বৈঠকি নয়। ... এ-সব গান যেন একটু নিরালায় গাবার মতো। সুরটা যে মন্দ হয়েছে এমন আমার বিশ্বাস নয়, এমন-কি ভালো হয়েছে বললে খুব বেশি অত্যুক্তি হয় না। ও গানটা আমি নাবার ঘরে অনেক দিন একটু একটু করে সুরের সঙ্গে তৈরি করেছিলুম–নাবার ঘরে গান তৈরি করবার ভারি কতকগুলি সুবিধা আছে। প্রথমত নিরালা, দ্বিতীয়ত অন্য কোনো কর্তব্যের কোনো দাবি থাকে না– মাথায় এক-টিন জল ঢেলে পাঁচ মিনিট গুন্‌ গুন্‌ করলে কর্তব্যজ্ঞানে বিশেষ আঘাত লাগে না– সব চেয়ে সুবিধা হচ্ছে কোনো দর্শকসম্ভাবনা-মাত্র না থাকাতে সমস্ত মন খুলে মুখভঙ্গি করা যায়। মুখভঙ্গি না করলে গান তৈরি করবার পুরো অবস্থা কিছুতেই আসে না। ওটা কিনা ঠিক যুক্তিতর্কের কাজ নয়, নিছক ক্ষিপ্তভাব। এ গানটা আমি এখনও সর্বদা গেয়ে থাকি– আজ প্রাতঃকালেও অনেকক্ষণ

গুন্ গুন্ করেছি, গাইতে গাইতে গভীর একটা ভাবোন্মাদও জন্মায়। অতএব এটা যে আমার একটা প্রিয় গান সে বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই।

সেদিন অ[ভি] যখন গান করছিল আমি ভাবছিলুম মানুষের সুখের উপকরণগুলি যে খুব দুর্লভ তা নয়, পৃথিবীতে মিষ্টি গলার গান নিতান্ত অসম্ভব আইডিয়ালের মধ্যে নয়, অথচ ওতে যে আনন্দ পাওয়া যায় তা অত্যন্ত গভীর। কিন্তু জিনিসটি যতই সুলভ হোক, ওর জন্যে যথোপযুক্ত অবকাশ করে নেওয়া ভারি শক্ত। যে ইচ্ছাপূর্বক গান গাবে এবং যে ইচ্ছাপূর্বক গান শুনবে পৃথিবীতে কেবল এই দুটি মাত্র লোক নেই, চর্তুদিকে অধিকাংশ লোক আছে যারা গান গাবেও না গান শুনবেও না। তাই সব-সুদ্ধ মিশিয়ে ও আর হয়েই ওঠে না।

আমার মনে হয় দিনের জগৎটা য়ুরোপীয় সংগীত, সুরে-বেসুরে খণ্ডে-অংশে মিলে একটা গতিশীল প্রকাণ্ড হার্মনির জটলা– আর, রাত্রের জগৎটা আমাদের ভারতবর্ষের সংগীত, একটি বিশুদ্ধ করুণ গম্ভীর অমিশ্র রাগিণী। দুটোই আমাদের বিচলিত করে, অথচ দুটোই পরস্পরবিরোধী। আমাদের নির্জন এককের গান, য়ুরোপের সজন লোকালয়ের গান। আমাদের গানে শ্রোতাকে মনুষ্যের প্রতিদিনের সুখদুঃখের সীমা থেকে বের করে নিয়ে নিখিলের মূলে যে-একটি সঙ্গীহীন বৈরাগ্যের দেশ আছে সেইখানে নিয়ে যায়, আর য়ুরোপের সংগীত মনুষ্যের সুখ-দুঃখের অনন্ত উত্থানপতনের মধ্যে বিচিত্রভাবে নৃত্য করিয়ে নিয়ে চলে।

রামকেলি প্রভৃতি সকাল বেলাকার যে-সমস্ত সুর কলকাতায় নিতান্ত অভ্যস্ত এবং প্রাণহীন বোধ হয়, এখানে তার একটু আভাসমাত্র দিলেই অমনি তার সমস্তটা সজীব হয়ে ওঠে। তার মধ্যে এমন একটা অপূর্ব সত্য এবং নবীন সৌন্দর্য দেখা দেয়, এমন একটা বিশ্বব্যাপী গভীর করুণা বিগলিত হয়ে চারিদিককে বাষ্পাকুল করে তোলে যে, এই রাগিণীকে সমস্ত আকাশ এবং সমস্ত পৃথিবীর গান বলে মনে হতে থাকে। এ একটা ইন্দ্রজাল, একটা মায়ামন্ত্রের মতো। আমার সুরের সঙ্গে কত টুকরো টুকরো কথা যে আমি জুড়ি তার আর সংখ্যা নেই– এমন এক লাইনের গান সমস্ত দিন কত জমছে এবং কত বিসর্জন দিচ্ছি। রীতিমত বসে সেগুলোকে পুরো গানে বাঁধতে ইচ্ছা করছে না।... আজ সমস্ত সকাল নিতান্ত সাদাসিধা ভৈরবী রাগিণীতে যে গোটা দুই-তিন ছত্র ক্রমাগত আবৃত্তি করছিলুম সেটুকু মনে আছে এবং নমুনা-স্বরূপে নিম্নে উদ্‌ধৃত করা যেতে পারে–

ওগো তুমি নব নব রূপে এসো প্রাণে। (আমার নিত্যনব!)
এসো গন্ধ বরন গানে।|
আমি যে দিকে নিরখি তুমি এসো হে
আমার মুগ্ধ মুদিত নয়ানে!

কর্মক্লিষ্ট সন্দেহপীড়িত বিয়োগশোককাতর সংসারের ভিতরকার যে চিরস্থায়ী সুগভীর দুঃখটি, ভৈরবী রাগিণীতে সেইটিকে একেবারে বিগলিত করে বের করে নিয়ে আসে। মানুষে মানুষে সম্পর্কের মধ্যে যে-একটি নিত্যশোক নিত্যভয় নিত্যমিনতির ভাব আছে, আমাদের হৃদয় উদ্‌ঘাটন করে ভৈরবী সেই কান্নাকাটি মুক্ত করে দেয়– আমাদের বেদনার সঙ্গে জগদ্‌ব্যাপী বেদনার সম্পর্ক স্থাপন করে দেয়। সত্যিই তো আমাদের কিছুই স্থায়ী নয়, কিন্তু প্রকৃতি কী এক অদ্ভুত মন্ত্রবলে সেই কথাটিই আমাদের সর্বদা ভুলিয়ে রেখেছে– সেইজন্যেই আমরা উৎসাহের সহিত সংসারের কাজ করতে পারি। ভৈরবীতে সেই চিরসত্য সেই মৃত্যুবেদনা প্রকাশ হয়ে পড়ে; আমাদের এই কথা বলে দেয় যে, আমরা যা-কিছু জানি তার কিছুই থাকবে না এবং যা চিরকাল থাকবে তার আমরা কিছুই জানি নে।

অমাদের মূলতান রাগিণীটা এই চারটে-পাঁচটা বেলাকার রাগিণী, তার ঠিক ভাবখানা হচ্ছে– “আজকের দিনটা কিচ্ছুই করা হয় নি’।... আজ আমি এই অপরাহ্ণের ঝিক্‌মিকি আলোতে জলে স্থলে শূন্যে সব জায়গাতেই সেই মূলতান রাগিণীটাকে তার করুণ চড়া অন্তরা-সুদ্ধ প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছি– না সুখ, না দুঃখ, কেবল আলস্যের অবসাদ এবং তার ভিতরকার একটা মর্মগত বেদনা।

এক-একটা গান যেমন আছে যার আস্থায়ীটা বেশ, কিন্তু অন্তরাটা ফাঁকি– আস্থায়ীতেই সুরের সমস্ত বক্তব্যটা সম্পূর্ণরূপে শেষ হওয়াতে কেবল নিয়মের বশ হয়ে একটা অনাবশ্যক অন্তরা জুড়ে দিতে হয়। যেমন আমার সেই “বাজিল কাহার বীণা মধুর স্বরে’ গানটা– তাতে সুরের কথাটা গোড়াতেই শেষ হয়ে গেছে, অথচ কবির মনের কথাটা শেষ না হওয়াতে গান যেখানে থামতে চাচ্ছে কথাকে তার চেয়ে বেশি দূর টেনে নিয়ে যাওয়া গেছে।

আমাদের কাছে আমাদের প্রতিদিনের সংসারটা ঠিক সামঞ্জস্যময় নয়– তার কোনো তুচ্ছ অংশ হয়তো অপরিমিত বড়ো, ক্ষুধাতৃষ্ণা ঝগড়াঝাঁটি আরাম-ব্যারাম খুঁটিনাটি খিটিমিটি

এইগুলিই প্রত্যেক বর্তমান মুহূর্তকে কণ্টকিত করে তুলছে, কিন্তু সংগীত তার নিজের ভিতরকার সুন্দর সামঞ্জস্যের দ্বারা মুহূর্তের মধ্যে যেন কী-এক মোহমন্ত্রে সমস্ত সংসারটিকে এমন একটি পার্‌স্‌পেক্‌টিভের মধ্যে দাঁড় করায় যেখানে ওর ক্ষুদ্র ক্ষণস্থায়ী অসামঞ্জস্যগুলো আর চোখে পড়ে না– একটা সমগ্র একটা বৃহৎ একটা নিত্য সামঞ্জস্য-দ্বারা সমস্ত পৃথিবী ছবির মতো হয়ে আসে এবং মানুষের জন্ম-মৃত্যু হাসি-কান্না ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানের পর্যায় একটি কবিতার সকরুণ ছন্দের মতো কানে বাজে। সেইসঙ্গে আমাদেরও নিজ নিজ ব্যক্তিগত প্রবলতা তীব্রতার হ্রাস হয়ে আমরা অনেকটা লঘু হয়ে যাই এবং একটি সংগীতময়ী বিস্তীর্ণতার মধ্যে অতি সহজে আত্মবিসর্জন করে দিই। ক্ষুদ্র এবং কৃত্রিম সমাজ-বন্ধনগুলি সমাজের পক্ষে বিশেষ উপযোগী, অথচ সংগীত এবং উচ্চ অঙ্গের আর্ট মাত্রেই সেইগুলির অকিঞ্চিৎকরতা মুহূর্তের মধ্যে উপলব্ধি করিয়ে দেয়– সেইজন্যে আর্ট মাত্রেরই ভিতর খানিকটা সমাজনাশকতা আছে– সেইজন্যে ভালো গান কিংবা কবিতা শুনলে আমাদের মধ্যে একটা চিত্তচাঞ্চল্য জন্মে, সমাজের লৌকিকতার বন্ধন ছেদন করে নিত্য-সৌন্দর্যের স্বাধীনতার জন্যে মনের ভিতরে একটা নিষ্ফল সংগ্রামের সৃষ্টি হতে থাকে– সৌন্দর্যমাত্রেই আমাদের মনে অনিত্যের সঙ্গে নিত্যের একটা বিরোধ বাধিয়ে দিয়ে অকারণ বেদনার সৃষ্টি করে।

কাল অনেক রাত পর্যন্ত নহবতে কীর্তনের সুর বাজিয়েছিল; সে বড়ো চমৎকার লাগছিল, আর ঠিক এই পাড়াগাঁয়ের উপযুক্ত হয়েছিল– যেমন সাদাসিধে তেমনি সকরুণ। ...সেকালের রাজাদের বৈতালিক ছিল– তারা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে গান গেয়ে প্রহর জানিয়ে দিত, এই নবাবিটা আমার লোভনীয় মনে হয়।

সংগীতের মতো এমন আশ্চর্য ইন্দ্রজালবিদ্যা জগতে আর কিছুই নেই– এ এক নূতন সৃষ্টিকর্তা। আমি তো ভেবে পাই নে– সংগীত একটা নতুন মায়াজগৎ সৃষ্টি করে না এই পুরাতন জগতের অন্তরতম অপরূপ নিত্যরাজ্য উদ্‌ঘাটিত করে দেয়। গান প্রভৃতি কতকগুলি জিনিস আছে যা মানুষকে এই কথা বলে যে, “তোমরা জগতের সকল জিনিসকে যতই পরিষ্কার বুদ্ধিগম্য করতে চেষ্টা করো-না কেন এর আসল জিনিসটাই অনির্বচনীয়’ এবং তারই সঙ্গে আমাদের মর্মের মর্মান্তিক যোগ– তারই জন্যে আমাদের এত দুঃখ, এত সুখ, এত ব্যাকুলতা।

প্রকৃতির সঙ্গে গানের যত নিকট সম্পর্ক এমন আর কিছু না– আমি নিশ্চয় জানি এখনি যদি আমি জানলার বাইরে দৃষ্টি রেখে রামকেলি ভাঁজতে আরম্ভ করি তা হলে এই রৌদ্ররঞ্জিত সুদূরবিস্তৃত শ্যামলনীল প্রকৃতি মন্ত্রমুগ্ধ হরিণীর মতো আমার মর্মের কাছে এসে আমাকে অবলেহন করতে থাকবে। যতবার পদ্মার উপর বর্ষা হয় ততবারই মনে করি মেঘমল্লারে একটা নতুন বর্ষার গান রচনা করি... কথা তো ঐ একই– বৃষ্টি পড়ছে, মেঘ করছে, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। কিন্তু তার ভিতরকার নিত্যনূতন আবেগ, অনাদি অনন্ত বিরহবেদনা, সেটা কেবল গানের সুরে খানিকটা প্রকাশ পায়।

কাল সন্ধ্যাবেলায় যখন এই সান্ধ্যপ্রকৃতির মধ্যে সমস্ত অন্তঃকরণ পরিপ্লুত হয়ে জলিবোটে করে সোনালি অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে আস্তে আস্তে ফিরে আসছি এমন সময়ে হঠাৎ দূরের এক অদৃশ্য নৌকো থেকে বেহালা যন্ত্রে প্রথমে পূরবী ও পরে ইমনকল্যাণে আলাপ শোনা গেল– সমস্ত স্থির নদী এবং স্তব্ধ আকাশ মানুষের হৃদয়ে একেবারে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। ইতিপূর্বে আমার মনে হচ্ছিল মানুষের জগতে এই সন্ধ্যাপ্রকৃতির তুলনা বুঝি কোথাও নেই– যেই পূরবীর তান বেজে উঠল অমনি অনুভব করলুম এও এক আশ্চর্য গভীর এবং অসীম সুন্দর ব্যাপার, এও এক পরম সৃষ্টি– সন্ধ্যার সমস্ত ইন্দ্রজালের সঙ্গে এই রাগিণী এমনি সহজে বিস্তীর্ণ হয়ে গেল, কোথাও কিছুই ভঙ্গ হল না– আমার সমস্ত বক্ষস্থল ভরে উঠল।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত পত্র

ভাই জ্যোতিদাদা, ...গান অনেক তৈরী হয়েচে। এখনো থামচে না– প্রায় রোজই একটা না একটা চলছে। আমার মুস্কিল এই যে সুর দিয়ে আমি সুর ভুলে যাই। দিনু কাছে থাকলে তাকে শিখিয়ে দিয়ে বেশ নিশ্চিন্ত মনে ভুলতে পারি। নিজে যদি স্বরলিপি করতে পারতুম কথাই ছিল না। দিনু মাঝে মাঝে করে, কিন্তু আমার বিশ্বাস সেগুলো বিশুদ্ধ হয় না। সুরেন বাড়ুজ্যের সঙ্গে আমার দেখাই হয় না– কাজেই আমার খাতা এবং দিনুর পেটেই সমস্ত জমা হচ্চে। এবার বিবি সেটা কতক লিখে নিয়েছে। কলকাতায়... এ-সব গান গাইতে গিয়ে দেখি কেমন ম্লান হয়ে যায়– তাই ভাবি, এগুলো হয়তো বিশেষ কারো কাজে লাগবে না।

ইন্দিরাদেবীকে লিখিত

গানের কাগজে রাগ রাগিণীর নাম-নির্দেশ না থাকাই ভালো। নামের মধ্যে তর্কের হেতু থাকে, রূপের মধ্যে না। কোন্ রাগিণী গাওয়া হচ্ছে বলবার কোনো দরকার নেই। কী গাওয়া হচ্ছে সেইটেই মুখ্য কথা কেননা তার সত্যতা তার নিজের মধ্যেই চরম। নামের সত্যতা দশের মুখে, সেই দশের মধ্যে মতের মিল না থাকতে পারে। কলিযুগে শুনেছি নামেই মুক্তি, কিন্তু গান চিরকালই সত্যযুগে।

২

আমার আধুনিক গানে রাগ-তালের উল্লেখ না থাকাতে আক্ষেপ করেছিস। সাবধানের বিনাশ নেই। ওস্তাদরা জানেন আমরা গানে রূপের দোষ আছে, তার পরে যদি নামেরও ভুল হয় তা হলে দাঁড়াব কোথায়? ধূর্জটিকে দিয়ে নামকরণ করিয়ে নিস।

চিঠিপত্র

প্রিয়নাথ সেনকে লিখিত

গানের কবিত্ব সম্বন্ধে যা লিখেছ সবই মানি। কেবল একটা কথা ঠিক নয়। মাথায় কবিতা সম্বন্ধে কোনো থিওরিই নেই। গান লিখি, তাতে সুর বসিয়ে গান গাই– ঐটুকুই আমার আশু দরকার– আমার আর কবিত্বের দিন নেই। পূর্বেই বলেছি ফুল চিরদিন ফোটে না– যদি ফুটত তো ফুটতই, তাগিদের কোনো দরকার হত না। এখন যা গান লিখি তা ভালো কি মন্দ সে কথা ভাববার সময়ই নেই। যদি বল তবে ছাপাই কেন, তার কারণ হচ্ছে ওগুলি আমার একান্তই অন্তরের কথা– অতএব কারও-না-কারও অন্তরের কোনো প্রয়োজন ওতে মিটতে পারে– ও গান যার গাবার দরকার সে একদিন গেয়ে ফেলে দিলেও ক্ষতি নেই, কেননা আমার যা দরকার তা হয়েছে। যিনি গোপনে অপূর্ণ প্রয়াসের পূর্ণতা সাধন করে দেন তাঁরই পাদপীঠের তলায় এগুলি যদি বিছিয়ে দিতে পারি, এ জন্মের মতো তা হলেই আমার বকশিশ মিলে গেল; এর বেশি এখন আমার আর শক্তি নেই। এখন মূল্য আদায় করব এমন আয়োজন করব কী দিয়ে, এখন প্রসাদ পাব সেই প্রত্যাশায় বসে আছি। তোমরা সেই আশীর্বাদই আমাকে কোরো– হাটের ব্যাপারী এখন দ্বারের ভিখারী হয়ে যেন দিন কাটাতে পারে।

পথে ও পথের প্রান্তে

নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লিখিত পত্র

গদ্যরচনায় আত্মশক্তির, সুতরাং আত্মপ্রকাশের, ক্ষেত্র খুবই প্রশস্ত। হয়তো ভাবীকালে সংগীতটাও বন্ধনহীন গদ্যের গূঢ়তর বন্ধনকে আশ্রয় করবে। কখনো কখনো গদ্যরচনায় সুরসংযোগ করার ইচ্ছা হয়। লিপিকা কি গানে গাওয়া যায় না ভাবছ?

য়ুরোপের সংগীত প্রকাণ্ড এবং প্রবল এবং বিচিত্র, মানুষের বিজয়রথের উপর থেকে বেজে উঠছে। ধ্বনিটা দিগ্‌দিগন্তের বক্ষস্থল কাঁপিয়ে তুলছে। বলে উঠতেই হয়- বাহবা! কিন্তু, আমাদের রাখালী বাঁশিতে যে রাগিণী বাজছে সে আমার একলার মনকে ডাক দেয় একলার দিকে সেই পথ দিয়ে যে পথে পড়েছে বাঁশবনের ছায়া, চলেছে জলভরা কলসী নিয়ে গ্রামের মেয়ে, ঘুঘু ডাকছে আমগাছের ডালে, আর দূর থেকে শোনা যাচ্ছে মাঝিদের সারিগান- মন উতলা করে দেয়, চোখটা ঝাপসা করে দেয় একটুখানি অকারণ চোখের জলে। অত্যন্ত সাদাসিধে, সেইজন্যে অত্যন্ত সহজে মনের আঙিনায় এসে আঁচল পেতে বসে।

নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লিখিত পত্র

...সম্প্রতি বউমা স্থির করেছিল মায়ার খেলা নৃত্যাভিনয় করতে হবে। তাই তার পুনঃসংস্কারে লেগেছি, যেখানে তার অভাব ছিল পূরণ করচি কাঁচা ছিল শোধন করচি- গানের পরে গান লেখা চলচে এক একদিনে চারটে পাঁচটা। যৌবনের তরঙ্গে মন দোদুল্যমান- জীর্ণ শরীরটাকে কোথায় কোথায় দূরে ভাসিয়ে দিয়েছে। গানের সুরে যে রকম সৃষ্টির বদল করে দেয় এমন আর কিছুতে নয়। ঘোর শীতের সময় আমার তরুণ জন্মু রাগিণীলোকে অতীতের সমুদ্রপার থেকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে বসন্তের দুর্দান্ত হাওয়া- মনের মধ্যে কূজন চলচে, গুঞ্জন চলচে- যে-সব লোক বাইরে থেকে কাজের বা অকাজের হাওয়া নিয়ে আসে তাদের মনে হয় বিদেশী লোক- কেননা তাদের মধ্যে সুরের স্পর্শ একটুও নেই। স্বর-সাধনায় উত্তরসাধিকা - কিন্তু মন্দভাগ্য আমি- কে কোথায়।

দিলীপকুমার রায়কে লিখিত

গীতাঞ্জলির কয়েকটি গানের ছন্দ সম্বন্ধে কৈফিয়ত চেয়েছ। গোড়াতেই বলে রাখা দরকার– গীতাঞ্জলিতে এমন অনেক কবিতা আছে যার ছন্দোরক্ষার বরাত দেওয়া হয়েছে গানের সুরের ‘পরে। অতএব, যে পাঠকের ছন্দের কান আছে তিনি গানের খাতিরে এর মাত্রা কম-বেশি নিজেই দুরস্ত করে নিয়ে পড়তে পারেন, যাঁর নেই তাঁকে ধৈর্য অবলম্বন করতে হবে।

১। “নব নব রূপে এসো প্রাণে’– এই গানের অন্তিম পদগুলির কেবল অন্তিম দুটি অক্ষরের দীর্ঘ হ্রস্ব স্বরের সম্মান স্বীকৃত হয়েছে। যথা “প্রাণে’ “গানে’ ইত্যাদি। একটিমাত্র পদে তার ব্যতিক্রম আছে। “এসো দুঃখে সুখে এসো মর্মে’– এখানে “সুখে’র একার’কে অবাঙালি রীতিতে দীর্ঘ করা হয়েছে। “সৌখ্যে’ কথাটা দিলে বলবার কিছু থাকত না, তবু সেটাতে রাজি হই নি। মানুষ চাপা দেওয়ার চেয়ে মোটর ভাঙা ভালো।

২। “অমল ধবল পা–লে লেগেছে মন্দ-মধুর হাওয়া’– এ গানে গানই মুখ্য, কাব্য গৌণ। অতএব তালকে সেলাম ঠুকে ছন্দকে পিছিয়ে থাকতে হল। যদি বলো পাঠকেরা তো শ্রোতা নয়, তারা মাফ করবে কেন। হয়তো করবে না– কবি জোড়হাত করে বলবে, “তাল-দ্বারা ছন্দ রাখিলাম, ত্রুটি মার্জনা করিবেন।’

৩। ৩৪ নম্বরটাও গান। তবুও এর সম্বন্ধে বিশেষ বক্তব্য হচ্ছে এই যে, যে ছন্দগুলি বাংলার প্রাকৃত ছন্দ, অক্ষর গণনা করে তাদের মাত্রা নয়।…

৪। “নিভৃত প্রাণের দেবতা’– এই গানের ছন্দ তুমি কী নিয়মে পড় আমি ঠিক বুঝতে পারছি নে। “দেবতা শব্দের পরে একটা দীর্ঘ যতি আছে, সেটা কি রাখ না? যদি সেই যতিকে মান্য করে থাক তা হলে দেখবে “দেবতা’ এবং “খোলো দ্বার’ মাত্রায় অসমান হয় নি। এ-সব ধ্বনিগত তর্ক মোকাবিলায় মীমাংসা করাই সহজ। লিখিত বাক্যের দ্বারা এর শেষ সিদ্ধান্তে পৌঁছনো সম্ভব হবে কিনা জানি নে। ছাপাখানা-শাসিত সাহিত্যে ছন্দোবিলাসী কবির এই এক মুশকিল– নিজের কণ্ঠ স্তব্ধ, পরের কণ্ঠের করুণার উপর নির্ভর। সেইজন্যেই আমাকে সম্প্রতি এমন কথা শুনতে হচ্ছে যে, আমি ছন্দ ভেঙে থাকি… আকাশের দিকে চেয়ে বলি– “চতুরানন্, কোন্ কানওয়ালাদের’ পরে এক বিচারের ভার।’

৫। “আজি গন্ধবিধুর সমীরণে’ –কবিতাটি সহজ নিয়মেই পড়া উচিত। অবশ্য, এর পঠিত ছন্দে ও গীত ছন্দে প্রভেদ আছে।

৬। “জনগণমনঅধিনায়ক’ গানটায় যে মাত্রাধিক্যের কথা বলেছ সেটা অন্যায় বল নি। ঐ বাহুল্যের জন্যে “পঞ্জাব’ শব্দের প্রথম সিলেব্‌লটাকে দ্বিতীয় পদের গেটের বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখি–

পন্‌। জাব সিন্ধু গুজরাট মরাঠা ইত্যাদি।

“পঞ্জাব’কে “পঞ্জব’ করে নামটার আকার খর্ব করতে সাহস হয় নি, ওটা দীর্ঘকায়াদের দেশ। ছন্দের অতিরিক্ত অংশের জন্যে একটু তফাতে আসন পেতে দেওয়া রীতি বা গীতি বিরুদ্ধ নয়।

২

১। “আবার এরা ঘিরেছে মোর মন’– এই পঙ্‌ক্তির ছন্দোমাত্রার সঙ্গে “দাহ আবার বেড়ে ওঠে ক্রমে’র মাত্রার অসাম্য ঘটেছে এই তোমার মত। “ক্রমে’ শব্দটার “ক্র’র উপর যদি যথোচিত ঝোঁক দাও তা হলে হিসাবের গোল থাকে না। বেড়ে ওঠেক্‌রমে’– বস্তুত সংস্কৃত ছন্দের নিয়মে “ক্র’ পরে থাকাতে “ওঠে’র “এ’ স্বরবের্ণ মাত্রা বেড়ে ওঠা উচিত। তুমি বলতে পারো আমরা সাধারণত শব্দের প্রথমবর্ণস্থিত “র’ফলাকে দুই মাত্রা দিতে কৃপণতা করি। “আক্রমণ’ শব্দের “ক্র’কে তার প্রাপ্য মাত্রা দিই, কিন্তু “ওঠে ক্রমে’র “ক্র’ হ্রস্বমাত্রায় খর্ব করে থাকি। আমি সুযোগ বুঝে বিকল্পে দুই রকম নিয়মই চালাই।

২। ভক্‌ত। সেথায়। খোলো দ্বা । ০০র্‌। – এইরকম ভাগে কোনো দোষ নেই। কিন্তু তুমি যে ভাগ করেছিলে। র ০০। এটা চলে না। যেহেতু “র’ হসন্ত বর্ণ, ওর পরে স্বরবর্ণ নেই, অতএব টানব কাকে।

৩। “জনগণ’ গান যখন লিখেছিলেম তখন “মারাঠা’ বানান করি নি। মারাঠিরাও প্রথম বর্ণে আকার দেয় না। আমার ছিল “মরাঠা’। তার পরে যাঁরা শোধন করেছেন তাঁরাই নিরাকারকে সাকার করে তুলেছেন, আমার চোখে পড়ে নি।

৩

যেখানে আর্টের উৎকর্ষ সেখানে গুণী ও গুণজ্ঞদের ভাবের উচ্চশিখর। সেখানে সকলেই অনায়াসে পৌঁছবে এমন আশা করা যায় না– সেইখানেই নানা রঙের রসের মেঘ জমে ওঠে– সেই দুর্গম উচ্চতায় মেঘ জমে বলেই তার বর্ষণের দ্বারা নীচের মাটি উর্বরা হয়ে ওঠে। অসাধারণের সঙ্গে সাধারণের যোগ এমনি করেই হয়, উপরকে নীচে বেঁধে রেখে দিলে হয় না। যারা রসের সৃষ্টিকর্তা তাদের উপর যদি হাটের ফর্মাশ চালানো যায়, তা হলেই সর্বনাশ ঘটে। ফর্মাশ তাদের অন্তর্যামীর কাছ থেকে। সেই ফর্মাশ-অনুসারে যদি তারা চিরকালের জিনিস তৈরি করতে পারে, তা হলেই আপনিই তার উপরে সর্বলোকের অধিকার হবে। কিন্তু, সকলের অধিকার হলেই যে হাতে হাতে সকলে অধিকার লাভ করতে পারে, ভালো জিনিস এত সস্তা নয়। বসন্তে যে ফুল ফোটে সে ফুল তো সকলেরই জন্যে, কিন্তু সকলেই তার মর্যাদা সমান বোঝে এ কথা কেমন করে বলব? বসন্তে আমের মুকুলে অনেকেরই মন সায় দিলে না ব'লেই কি তাকে দোষ দেব? বলব "তুমি কুমড়ো হলে না কেন'? বলব কি– গরিবের দেশে বকুল ফুল ফোটানো বিড়ম্বনা– সব ফুলেরই বেগুনের ক্ষেত হয়ে ওঠা নৈতিক কর্তব্য? বকুল ফুলের দিকে যে অরসিক চেয়ে দেখে না, তার জন্যে যুগ-যুগান্তর ধরেই বকুল ফুল যেন অপেক্ষা করে থাকে; মনের খেদে এবং লোকহিতৈষীদের তাড়নায় সে যেন কচুবন হয়ে ওঠাবার চেষ্টা না করে। গ্রীসে সর্বসাধারণের জন্যেই সফোক্লীস এস্কিলাসের নাটক রচিত ও অভিনীত হয়েছিল, কেবল বিশিষ্ট কতিপয়ের জন্যে নয়। সেখানকার সাধারণের ভাগ্য ভালো যে, তারা কোনো গ্রীসীয় দাশুরায়ের শরণাপন্ন হয় নি। সাধারণকে শ্রদ্ধাপূর্বক ভালো জিনিস দিতে থাকলে ক্রমশই তার মন ভালো জিনিস গ্রহণ করবার উপযুক্ত হয়ে ওঠে। কবিকে আমরা যেন এই কথাই বলি– "তোমার যা সর্বশ্রেষ্ঠ তাই যেন তুমি নির্বিচারে রচনা করতে পারো।' কবি যদি সফল হয় তবে সাধারণকে বলব– "যে জিনিস শ্রেষ্ঠ তুমি যেন সেটি গ্রহণ করতে পারো।' যারা রূপকার, যারা রসস্রষ্টা, তারা আর্টের সৃষ্টি সম্বন্ধে সত্য ও অসত্য, ভালো ও মন্দ, এই দুটি মাত্র শ্রেণীভেদই জানে; বিশিষ্ট কতিপয়ের পথ্য ও ইতর-সাধারণের পথ্য বলে কোনো ভেদ তাদের সামনে নেই। শেক্‌সপীয়র সর্বসাধারণের কবি বলে একটা জনশ্রুতি প্রচলিত আছে, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি হ্যাম্‌লেট কি সর্বসাধারণের নাটক? কালিদাস কোন্ শ্রেণীর কবি জানি নে, কিন্তু তাঁকে আপামর সাধারণ সকলেই কবি বলে প্রশংসা করে থাকে। জিজ্ঞাসা করি– যদি মেঘদূত গ্রামের দশজনকে

ডেকে শোনানো যায়, তা হলে কি সেই অত্যাচার ফৌজদারি দণ্ডবিধির আমলে আসতে পারে না? সর্বসাধারণের মোক্তার যদি কালিদাসের আমলে বিক্রমাদিত্যের সিংহাসন বেদখল করে কালিদাসকে ফর্মাশে বাধ্য করতেন, তা হলে মেঘদূতের জায়গায় যে পদ্যপাঠ তৈরি হত, মহাকাল কি সেটা সহ্য করতেন? আমাকে যদি জিজ্ঞাসা করো এ সমস্যার মীমাংসা কী, আমি বলব– মেঘদূত গ্রামের দশজনের জন্যেই, কিন্তু যাতে সেই দশজনের মেঘদূত নিজের অধিকার উপলব্ধি করতে পারে, তারই দায়িত্ব দশোত্তরবর্গের লোকের। যে দশজন মেঘদূত বোঝে না, তাদের খাতিরে মেঘদূতের বদলে পদ্ম-ভ্রমরের পাঁচালিতে সস্তা অনুপ্রাসের চক্‌মকি ঠোকা কবির দায়িত্ব নয়। কৃত্রিমতা সকল কবি সকল আর্টিস্টের পক্ষেই দূষণীয়, কিন্তু যা সকলেই অনায়াসে বোঝে সেটাই অকৃত্রিম আর যা বুঝতে চিত্তবৃত্তির উৎকর্ষসাধনের দরকার সেটাই কৃত্রিম এ ধরনের কথা অশ্রদ্ধেয়।

৪

কীর্তনগীত আমি অনেক কাল থেকেই ভালোবাসি। ওর মধ্যে ভাবপ্রকাশের যে নিবিড় ও গভীর নাট্যশক্তি আছে সে আর-কোনো সংগীতে এমন সহজভাবে আছে বলে আমি জানি নে। সাহিত্যের ভূমিতে ওর উৎপত্তি, তার মধ্যেই ওর শিকড়, কিন্তু ও শাখায় প্রশাখায় ফলে ফুলে পল্লবে সংগীতের আকাশে স্বকীয় মহিমা অধিকার করেছে। কীর্তনসংগীতে বাঙালির এই অনন্যতন্ত্র প্রতিভায় আমি গৌরব অনুভব করি।... কখনো কখনো কীর্তনে ভৈরোঁ প্রভৃতি ভোরাই সুরেরও আভাস লাগে, কিন্তু তার মেজাজ গেছে বদলে– রাগরাগিণীর রূপের প্রতি তার মন নেই, ভাবের রসের প্রতিই তার ঝোঁক। আমি কল্পনা করতে পারি নে হিন্দুস্থানী গাইয়ে কীর্তন গাইছে, এখানে বাঙালির কণ্ঠ ও ভাবার্দ্রতার দরকার করে। কিন্তু, তৎসত্ত্বেও কি বলা যায় না যে এতে সুরসমবায়ের পদ্ধতি হিন্দুস্থানী পদ্ধতির সীমা লঙ্ঘন করে না? অর্থাৎ, য়ুরোপীয় সংগীতের সুরপর্যায় যে রকম একান্ত বিদেশী কীর্তন তো তা নয়। ওর রাগরাগিণীগুলিকে বিশেষ নাম দিয়ে হিন্দুস্থানী সংগীতের সংখ্যা বৃদ্ধি করলে উপদ্রব করা হয় না। কিন্তু, ওর প্রাণ, ওর গতি, ওর ভঙ্গি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

৫

"ছন্দা'য় তোমার "কথা বনাম সুর' প্রবন্ধে তোমার তর্কটা খুব জোরালো হয়েছে। কিন্তু, তর্কে বিজ্ঞান বা গণিত ছাড়া আর কোনো-কিছুর মীমাংসা হতে চায় না। যদি কেউ হুংকার দিয়ে বলেন বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় আম্র বলা যেতে পারে একমাত্র ফজলিকে– যদি তার আয়তন, তার ওজন, তার আঁটির বিশালতা প্রমাণ-স্বরূপে সে ব্যবহার করে– যদি বলে গুরুত্বহীন অন্য সমস্ত আমকে সংস্কৃত নামে অভিহিত করা চলবে না, বড়ো জোর গ্রাম্য ভাষায় "আঁব' নামেই তাদের পরিচয় দেওয়া যেতে পারে– তা হলে জামাইষষ্ঠীর দিনে ফজলি আম দিয়ে তার সম্মান রক্ষা করা শ্বশুরের পক্ষে নিরাপদ হবে, কিন্তু ইতরে জনাঃ বিচিত্র আমের বিচিত্র রস সম্ভোগ ক'রে সমজদার নাম খোয়াতে কুণ্ঠিত হবে না। ওস্তাদেরা ফজলি-সংগীতের কলমের চারা বানাতে থাকুন যুগ যুগান্তর ধরে, তৎসত্ত্বেও মানুষের হৃদয়পদ্মে সৃষ্টিকর্তা ঘুমিয়ে পড়বেন না।

সুরের সঙ্গে কথার মিলন কেউ রোধ করতে পারবে না। ওরা পরস্পরকে চায়, সেই চাওয়ার মধ্যে যে প্রবল শক্তি আছে সেই শক্তিতেই সৃষ্টির শক্তিতেই সৃষ্টির প্রবর্তনা। শ্রেণীর বেড়ার মধ্যে পায়ের বেড়ির ঝংকার দিয়ে বেড়ানোকেই যে ওস্তাদ সাধনা বলে গণ্য করে, তার সঙ্গে তর্ক কোরো না; শ্রেণীর সে উপাসক, শাস্ত্রের সে বুলি-বাহক, পৃথিবীর নানা বিপদের মধ্যে সেও এক বিশেষজাতীয়– কলাবিভাগে সে ফাসিস্‌ট্‌।

৬

মত বদলিয়েছি। জীবনস্মৃতি অনেক কাল পূর্বের লেখা। তার পরে বয়সও এগিয়ে চলেছে, অভিজ্ঞতাও। বৃহৎ জগতের চিন্তাধারা ও কর্মচক্র যেখানে চলছে, সেখানকার পরিচয়ও প্রশস্ততর হয়েছে। দেখেছি চিত্ত যেখানে প্রাণবান্‌ সেখানে সে জ্ঞানলোকে ভাবলোকে ও কর্মলোকে নিত্যনূতন প্রবর্তনার ভিতর দিয়ে প্রমাণ করছে যে, মানুষ সৃষ্টিকর্তা, কীটপতঙ্গের মতো একই শিল্পপ্যাটার্নের পুনরাবৃত্তি করছে না। আমার মনে আজ আর সন্দেহমাত্র নেই যে, কলুর বলদের মতো চোখে ঠুলি দিয়ে বাঁধা গণ্ডির মধ্যে নিরন্তর ঘুরতে থাকা সংগতের সাহিত্যের কিংবা কোনো ললিতকলার চরম সদগতি নয়। হিন্দুস্থানী কালোয়াতের কণ্ঠব্যায়ামের তারিফ করতে রাজি আছি, এমন-কি তার রসভোগ থেকেও বঞ্চিত হতে চাই নে। কিন্তু, সেই রস চিত্তকে যদি মাদকতায় অভিভূত করে রাখে, অগ্রগামী কালের নব নব সৃষ্টিবৈচিত্র্যের পিছনে আমাদের বিহ্বলভাবে কাত করে রেখে দেয়, খাঁচার পাখির মতো যে বুলি শিখেছি তাই কেবলই আউড়িয়ে

যাই এবং অবিকল আউড়িয়ে যাবার জন্যে বাহবা দাবি করি, তা হলে এই নকলনবিশি-বিধানকে সেলাম করে থাকব তার থেকে দূরে– নূতন সাধনার পথে খুঁড়িয়ে চলব সেও ভালো, কিন্তু হাজার বছর আগেকার রাস্তায় শিকল-বাঁধা শাগ্‌রেদি করতে পারব না। ভুল ভ্রান্তি অসম্পূর্ণতা সমস্তর ভিতর দিয়ে নবযুগবিধাতার ডাক শুনে চলতে থাকব নবসৃষ্টির কামনা নিয়ে। বাঁধা মতের প্রবীণদের কাছে গাল খাব– জীবনে তা অনেকবার খেয়েছি– কিন্তু আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্রে আমি কিছুতেই মানব না যে, আমি ভূতকালের ভূতে-পাওয়া মানুষ। আজ য়ুরোপীয় গুণীমণ্ডলীর মধ্যে এমন কেউ নেই যে বলে না যে, অজন্তার ছবি শ্রেষ্ঠ ছবি, কিন্তু তাঁদের মধ্যে এমন বেওকুফ কেই নেই যে ঐ অজন্তার ছবির উপর কেবল দাগা বুলিয়ে যাওয়াকেই শিল্পসাধনার চরম বলে মানে। তানসেনকে সেলাম করে বলব, “ওস্তাদজি, তোমার যে পথ আমারও সেই পথ।’ অর্থাৎ, নবসৃষ্টির পথ। বাংলাদেশ একদিন সংগীতে গণ্ডিভাঙা নবজীবনের পথে চলেছিল। তার পদাবলী তার গীতকলাকে জাগিয়ে তুলেছিল দাসী করে নয়, সঙ্গিনী করে, তার গৌরব রক্ষা করে। সেই বাংলাদেশে আজ নতুন যুগের যখন ডাক পড়ল তখন সে হিন্দুস্থানী অন্তঃপুরে প্রাচীরের আড়ালে কুলরক্ষা করতে পারবে না– তখন সে জটিলার শাসন উপেক্ষা করে যুগলমিলনের পথে চরম সার্থকতা লাভ করবে। এ নিয়ে নিন্দে জাগবে, কিন্তু লজ্জা করলে চলবে না।

মত বদলিয়েছি। কতবার বদলিয়েছি তার ঠিক নেই। সৃষ্টিকর্তা যদি বার বার মত না বদলাতেন তা হলে আজকের দিনের সংগীতসভা ডাইনসরের ধ্রুপদী গর্জনে মুখরিত হত এবং সেখানে চতুর্দন্ত ম্যমথের চতুষ্পদী নৃত্য এমন ভীষণ হত যে যারা আজ নৃত্যকলায় পালোয়ানির পক্ষপাতী তারাও দিত দৌড়। শেষ দিন পর্যন্ত যদি আমার মত বদলাবার শক্তি অনুষ্ঠিত থাকে তা হলে বুঝব এখনো বাঁচবার আশা আছে। নইলে গঙ্গাযাত্রার আয়োজন কর্তব্য। আমাদের দেশে সেই শান-বাঁধানো ঘাটেই লোকসংখ্যা সব চেয়ে বেশি।

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লিখিত

সংগীতের সঙ্গে কাব্যের একটা জায়গায় মিল নেই। সংগীতের সমস্তটাই অনির্বচনীয়। কাব্যে বচনীয়তা আছে সে কথা বলা বাহুল্য; অনির্বচনীয়তা সেইটেকেই বেষ্টন করে হিল্লোলিত হতে থাকে, পৃথিবীর চার দিকে বায়ুমণ্ডলের মতো। এপর্যন্ত বচনের সঙ্গে অনির্বচনের, বিষয়ের

সঙ্গে রসের গাঁঠ বেঁধে দিয়েছে ছন্দ। পরস্পরকে বলিয়ে নিয়েছে– "যদেতদ্ হৃদয়ং মম তদস্ত হৃদয়ং তব'। বাক্ এবং অবাক বাঁধা পড়েছে ছন্দের মাল্য-বন্ধনে।

২

গানে কথা ও সুরের স্থান নিয়ে কিছুদিন থেকে তর্ক চলেছে। আমি ওস্তাদ নই, আমার সহজ বুদ্ধিতে এই মনে হয় এ বিষয়টা সম্পূর্ণ তর্কের বিষয় নয়; এ সৃষ্টির অধিকারগত, অর্থাৎ লীলার। জপতপ করে মন্ত্রতন্ত্র আউড়িয়ে হয়তো কৃচ্ছ্রসাধক যথানিয়মে ভবসমুদ্র পার হতে পারে, কিন্তু যে সরল ভক্তির মানুষ বলে "ভজন পূজন জানি নে, মা, জানি তামাকেই' সেই হয়তো জিতে যায়। সে আইনকে ডিঙিয়ে গিয়ে মানে লীলাকে, ইচ্ছাকে– সেই বলে "ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন'। সে বলে সকলের উপরে আছেন যিনি, তিনি নিজে হতে যাকে বেছে নেনে তার আর ভাবনা নেই। যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে এখানে সেই সকলের উপরওয়ালা হচ্ছে সৃষ্টির আনন্দ। এই আনন্দ যখন রূপ নেয় তখন সেই রূপেই তার সত্যতার প্রমাণ হয়, আইনকর্তার দণ্ডবিধিতে নয়। উড়ুক্ষু পাখির পালকওয়ালা ডানা থাকে জানি, কিন্তু সৃষ্টির বড়ো খেয়ালীর মর্জি অনুসারে বাদুড়ের পালক নেই– শ্রেণীবিভাগওয়ালা তাকে যে শ্রেণীভুক্ত করে যে নামই দিন সে উড়বেই। প্রাণীবিজ্ঞানের কোঠায় তিমিকে মাছ নাই বলা গেল, আসল কথা হচ্ছে সে জলে ডুবসাঁতার দিয়ে বেড়াবেই। অন্যান্য লক্ষণ অনুসারে তার ডাঙায় থাকাই উচিত ছিল, কিন্তু সে থাকে নি, সে জলেই রয়ে গেল। সৃষ্টিতে এমন অনেক অভাব্য ভাবিত হয়ে থাকে, হয় না জড়ের কারখানায়। কথা ও সুরে মিলে যদি সুসম্পূর্ণ সৃষ্টি হয়ে থাকে তবে যেটা হয়েছে বলেই তার আদর, সেই হওয়ার গৌরবেই সৃষ্টির গৌরব। এই মিলিত সৃষ্টিতে যে রস পাই তর্কের দ্বারা তাকে যে যা বলে বলুক সেটা বাহ্য, কিন্তু সৃষ্টির খাতির উড়িয়ে দিয়ে তর্কের খাতিরে যারা বলে বসে "রসই পেলুম না', এমনতরো অভ্যাসগ্রস্ত আড়ষ্টবোধসম্পন্ন মানুষের অভাব নেই কী সাহিত্যে, কী সংগীতে, কী শিল্পকলায়। অভ্যাসের মোহ থেকে, আইনের পীড়ন থেকে, তারা মুক্তিলাভ করুক এই কামনা করি– কিন্তু সেই মুক্তি হবে "ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন' ।

তেলে জলে যেমন মেলে না, কথা ও সুর তেমনতরো অমিশুক নয়– মানুষের ইতিহাসের প্রথম থেকেই তার পরিচয় চলেছে। তাদের স্বাতন্ত্র্য কেউ অস্বীকার করে না, কিন্তু পরস্পরের

প্রতি তাদের সুগভীর স্বাভাবিক আসক্তি লুকোনো নেই। এই আসক্তি একটি শক্তিবিশেষ, বিশ্ববিধাতার দৃষ্টান্তে গুণীরাও এই প্রবল শক্তিকে সৃষ্টির কাজে লাগিয়ে দেন– এই সৃষ্টির ভিতর দিয়ে সেই শক্তি মনকে বিচলিত করে তোলে। এর থেকেই উদ্ভূত হয় বিশ্বের সব চেয়ে প্রবল রস, যাকে বলে আদিরস। এই যুগলমিলন-জাতীয় সৃষ্টি উচ্চশ্রেণীর কি না হিন্দুস্থানী কায়দার সঙ্গে মিলিয়ে তার বিচার চলবে না, তার বিচার তার নিজেরই অন্তর্গূঢ় বিশেষ আদর্শের উপর। মাদুরার মন্দিরে স্থাপত্যের ও ভাস্কর্যের প্রভূততানমানসম্পন্ন যে ঐশ্বর্যের পরিচয় পাই তারই নিরন্তর পুনরাবৃত্তিতেই স্থাপত্যসাধনার চরম উৎকর্ষে নিয়ে যাবে তা বলতে পারি নে, তার চেয়ে অনেক সহজ সরল শুচি আদর্শ আছে যার বাহুল্যবর্জিত শুভ্র সংযত রূপ হৃদয়ের মধ্যে সহজে প্রবেশ করে একখানি গীতিকাব্যেরই মতো। যেমন চিস্তির শ্বেতমর্মরের সমাধিমন্দির। মাদুরার মতো তার মদ্যে বারংবার তানের উৎক্ষেপ বিক্ষেপ নেই বলেই তাকে নীচের শ্রেণীতে ফেলতে পারব না। আনন্দ সম্ভোগ করবার সহজ মন নিয়ে কৃত্রিম কৌলীন্যের মেলবন্ধন না মেনে সৃষ্টির রসবৈচিত্র্য স্বীকার করে নিতে দোষ কী?

রসসৃষ্টির রাজ্যে যাদের মনের বিহার তাদের মুশকিল এই যে, “রসস্য নিবেদন’টা রুচির উপর নির্ভর করে, সেই রুচি তৈরি হয়ে ওঠে ব্যক্তিগত বা শ্রেণীগত অভ্যাসের উপর। এই কারণে শ্রেণীবিচার সহজ, রসবিচার সহজ নয়।

নিয়তি নিয়মকে রক্ষা করবার খবরদারিতে বাঁধা পথে বারংবার স্টীম রোলার চালায়, ইতিমধ্যে সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টির ঝরনাকে বইয়ে দিতে থাকেন তারই স্বকীয় গতিবেগের বিচিত্র শাখায়িত পথে– এই পথে কথার ধারা একলা যাত্রা করে, সুরের নিজের শাখা ধরে চলে, আবার সুর ও কথার স্রোত মিলেও যায়। এই মিলে এবং অমিলে দুয়েতেই রসের প্রবাহ– এর মধ্য যাঁরা কম্যুনাল বিচ্ছেদ প্রচার করেন সেই শ্রেণীমাহাত্ম্যের ধ্বজাধারীদেরকে সৃষ্টিবাধাজনক শান্তিভঙ্গের উৎপাত থেকে নিরস্ত হতে অনুরোধ করি।...

এত বড়ো চিঠি লিখে ভাঙা শরীরের বিরুদ্ধে যথেষ্ট অপরাধ করেছি। কিন্তু রোগদৌর্বল্যের আঘাতের চেয়েও বড়ো আঘাত আছে, তাই থাকতে পারলুম না। কথাও সুরকে বেগ দেয়, সুরও কথাকে বেগ দেয়, উভয়ের মধ্যে আদান-প্রদানের সম্বন্ধ আছে; রসসৃষ্টিতে এদের পরিণয়কে হেয় করতে হবে যেহেতু সাংগীতিক মনুসংহিতায় একে অসবর্ণ বিবাহ বলে, আমার মতো

মুক্তিকামী এটা সইতে পারে না। সংগীতে চিরকুমারদের আমি সম্মান করি যেখানে সম্মানের তারা যোগ্য, কিন্তু কুমার-কুমারীদের সুন্দর রকম মিলন হলে আনন্দ করতে আমার বাধে না। বিবাহে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা নষ্ট হয়ে শক্তি হ্রাস করে এ কথা সত্য হতেও পারে, না হতেও পারে, এমন হতেও পারে এক রকম শক্তিকে সংযত করে আর-এক রকম শক্তিকে পূর্ণতা দেয়।

সাহানাদেবীকে লিখিত

সেদিন মণ্টুর গান অনেকগুলি ও অনেকক্ষণ ধরে শুনেছি।... “হে ক্ষণিকের অতিথি” মণ্টু সেদিন গেয়েছিল– সুরের মধ্যে কোনও পরিবর্তন ঘটায় নি। তার মধ্যে ও যে ধাক্কা লাগিয়েছিল সেটাতে গানের ভাবের চাইতে ভঙ্গি প্রবল হয়ে উঠেছিল। দেখলুম শ্রোতাদের ভালো লাগল। গানের প্রকাশ সম্বন্ধে গায়কের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অগত্যা মানতেই হবে– অর্থাৎ গানের দ্বারা গায়ক নিজের অনুমোদিত বিশেষ ভাবের ব্যাখ্যা করে– যে ব্যাখ্যা রচয়িতার অন্তরের সঙ্গে না মিলতেও পারে– গায়ক তো গ্রামোফোন নয়। তুমি যখন আমার গান করো শুনলে মনে হয় আমার গান রচনা সার্থক হয়েছে– যে গানে যতখানি আমি আছি ততখানি ঝুনুও আছে– এই মিলনের দ্বারা যে পূর্ণতা ঘটে সেটার জন্যে রচয়িতার সাগ্রহ প্রতীক্ষা আছে। আমি যদি সেকালের সম্রাট হতুম তাহলে তোমাকে বন্দিনী করে আনতুম লড়াই করে কেননা তোমার কণ্ঠের জন্যে আমার গানের একান্ত প্রয়োজন আছে।...ইতি ৪। ৪। ৩৮

২

বিশ্বসৃষ্টিতে রসবৈচিত্র্যের সীমা নেই, কবির মন তার সকল দিকেই স্পর্শসচেতন– কেবলমাত্র একটা প্রেরণাতেই, তা সে যত বড়োই হোক, যেন তার রাগরাগিণী নিঃশেষিত না হয়। ...

ইতিমধ্যে মণ্টু বিখ্যাত গায়িকা কেসরবাইকে এনেছিল আমাকে গান শোনাবার জন্যে। আশ্চর্য তার সাধনা, কণ্ঠে মাধুর্য আছে, যেমন তেমন করে সুর খেলাতে এবং সুরে খেলাতে এবং সুরে মোচড় দিতে তার অসমান্য নৈপুণ্য। এ’কে ভালো বলতে বাধ্য, কিন্তু ভালো লাগতে নয়। সংগীত যখন রূপঘনিষ্ঠ প্রাণবান দেহ নেয় তখন তার যত খুশি টেনে বাড়ানো, ছেঁটে

কমানো, তাকে আছড়ানো, মোচড়ানো, কলাতত্ত্ববিরোধী। পুরুভুজজাতীয় আদিম জীব অবয়বহীন, ইংরেজিতে যাকে বলে amorphous, তাকে দুখানা করলেও যা সাতখানা করলেও তা। পূর্ণ অভিব্যক্ত জীবে এই অত্যাচার খাটে না। তার স্বভাবসীমাকে কিছুদূর অতিক্রম করা চলে, কিন্তু বেশি দূর নয়। এইজন্যে কেসরবাইয়ের গানকে কান তারিফ করলেও মন স্বীকার করছিল না। যারা ওস্তাদি-নেশা-গ্রস্ত তাদের এই কলাতত্ত্বের সহজ কথা বুঝিয়ে দেওয়া শক্ত। কেননা, নেশার সীমা নেই, ভোজের আছে। “ঢাল্ ঢাল্ সুরা আরো ঢাল্’ এটাকে মাৎলামি বলে হাসতে পারি, কিন্তু দই ক্ষীর সন্দেশের বেলা যথাস্থানে থামার দ্বারাই তাকে সম্মান দেওয়া হয়– না থামালেই সেটা বীভৎস হয়ে ওঠে। কেসরবাই যে জাতীয় গান গায়, শারীরিক ক্লান্তি ছাড়া তার থামবার এমন কোনোই সুবিহিত প্রেরণা নেই যা তার অন্তর্নিহিত। তাতে কেসরবাইকে অপরাধী করি নে, এইজাতীয় সংগীতকেই করি। কেসরবাইয়ের গাওয়াতে কেবল যে সাধনার পরিচয় আছে তা নয়, বিধিদত্ত ক্ষমতারও পরিচয় আছে– যা ওস্তাদের নেই। কিন্তু ততঃ কিম্! এই শক্তি ভুল বাহন নিয়ে ব্যর্থ হয়েছে, নন্দনবনে যে অপ্সরার যোগ্যস্থান ছিল সুন্দরবনে তার মান বাঁচানো সহজ হয় না।

জানকীনাথ বসুকে লিখিত

আমার গান তাঁর ইচ্ছামত ভঙ্গি দিয়ে গেয়ে থাকেন, তাতে তাদের স্বরূপ নষ্ট হয় সন্দেহ নেই। গায়কের কণ্ঠের উপর রচয়িতার জোর খাটে না, সুতরাং ধৈর্য ধরে থাকা ছাড়া অন্য পথ নেই। আজকালকার অনেক রেডিয়োগায়কও অহংকার করে বলে থাকেন তাঁরা আমার গানের উন্নতি করে থাকেন। মনে মনে বলি পরের গানের উন্নতি সাধনে প্রতিভার অপব্যয় না করে নিজের গানের রচনায় মন দিলে তাঁরা ধন্য হতে পারেন। সংসারে যদি উপদ্রব করতেই হয় তবে হিটলার প্রভৃতির ন্যায় নিজের নামের জোরে করাই ভালো।

অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তীকে লিখিত পত্র

সুরের-বোঝাই-ভরা তিনটে নাটিকার মাঝিগিরি শেষ করা গেল। নটনটীরা যন্ত্রতন্ত্র নিয়ে চলে গেল কলকাতায়। দীর্ঘকাল আমার মন ছিল গুঞ্জনমুখরিত। আনন্দে ছিলউম। সে আনন্দ বিশুদ্ধ, কেননা সে নির্বস্তুক (abstract)। বাক্যের সৃষ্টির উপরে আমার সংশয় জন্মে গেছে। এত রকম চলতি খেয়ালের উপর তার দর যাচাই হয়, খুঁজে পাই নে তার মূল্যের আদর্শ।...

এই টলমলে অবস্থায় এখনকার মতো দুটো পাকা ঠিকানা পেয়েছি আমার বানপ্রস্থের– গান আর ছবি। এ পাড়ায় এদের উপরে বাজারের বস্তাবন্দীর ছাপ পড়ে নি। যদিও আমার গান নিয়ে বচসার অন্ত নেই, তবু সেটা আমার মনকে নাড়া লাগায় না। তার একটা কারণ, সুরের সমগ্রতা নিয়ে কাটাছেঁড়া করা চলে না। মনের মধ্যে ওর যে প্রেরণা সে ব্যাখ্যার অতীত। রাগরাগিণীর বিশুদ্ধতা নিয়ে যে-সব যাচনদারেরা গানের আঙ্গিক বিচার করেন, কোনোদিন সেই-সব গানের মহাজনদের ওস্তাদিকে আমি আমল দিই নি; এ সম্বন্ধে জাতখোয়ানো কলঙ্ককে আমি অঙ্গের ভূষণ বলে মেনে নিয়েছি। কলার সকল বিভাগে আমি ব্রাত্য, বিশেষভাবে গানের বিভাগে। গানে আমার পাণ্ডিত্য নেই এ কথা আমার নিতান্ত জানা– তার চেয়ে বেশি জানা গানের ভিতর দিয়ে অব্যবহিত আনন্দের সহজ বোধ। এই সহজ আনন্দের নিশ্চিত উপলব্ধির উপরে বাঁধা আইনের করক্ষেপ আমাকে একটুও নাড়াতে পারে নি। এখানে আমি উদ্ধত, আমি স্পর্ধিত আমার আন্তরিক অধিকারের জোরে। বচনের অতীত বলেই গানের অনির্বচনীয়তা আপন মহিমায় আপনি বিরাজ করতে পারে, যদি তার মধ্যে থাকে আইনের চেয়ে বড়ো আইন। গান যখন সম্পূর্ণ জাগে মনের মধ্যে তখন চিত্ত অমরাবতীতে গিয়ে পৌঁছয়। এই-যে জাগরণের কথা বলছি তার মানে এ নয় যে, সে একটা মস্ত কোনো অপূর্ব সৃষ্টি সহযোগে। হয়তো দেখা যাবে সে একটা সামান্য-কিছু। কিন্তু, আমার কাছে তার সত্য তার তৎসাময়িক অকৃত্রিম বেদনার বেগে। কিছুদিন পরে তার তেজ কমে যেতে পারে, কিন্তু যে মানুষ সম্ভোগ করেছে তার তাতে কিছু আসে যায় না, যদি না সে অন্যের কাছে বক্‌শিশের বাঁধা বরাদ্দ দাবি করে। নতুন রচনার আনন্দে আমি পদে পদে ভুলি, গাছ যেমন ভোলে তার ফুল ফোটানো। সেইজন্যে অন্যেরা যখন ভোলে, সে আমি টেরও পাই নে। যে ছন্দ-উৎস বেয়ে অনাদিকাল ধরে ঝরছে রূপের ঝর্না তারই যে-কোনো একটা ধারা এসে যখন চেতনায় আবর্তিত হয়ে ওঠে, এমন-কি ক্ষণকালের জন্যেও, তখন তার জাদুতে কিছু-না রূপ ধরে কিছু-একটার, সেই জাদুর স্পর্শ লাগে কল্পনায়– যেন ইন্দ্রলোকের থেকে বাহবা এসে পৌঁছয় আমার মর্ত্যসীমানায়– সেই দেবতাদের উৎসাহ পাই যে দেবতারা স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা। হয়তো সেই মুহূর্তে তাঁরা কড়ি-মূল্য দেন, কিন্তু সে স্বর্গীয় কড়ি।

...গানেতে মনের মধ্যে এনে দেয় একটা দূরত্বের পরিপ্রেক্ষণী। বিষয়টা যত কাছেরই হোক সুরে হয় তার রথযাত্রা; তাকে দেখতে পাই ছন্দের লোকান্তরে, সীমান্তরে; প্রাত্যহিকের করস্পর্শে তার ক্ষয় ঘটে না, দাগ ধরে না।

আমার শ্যামা নাটকের জন্যে একটা গান তৈরী করেছি ভৈরবী রাগিণীতে–

জীবনের পরম লগন কোরো না হেলা
হে গরবিনী

এই গরবিনীকে সংসারে দেখেছি বারংবার, কিন্তু গানের সুর শুনলে বুঝবে এই “বারংবারে’র অনেক বাইরে সে চলে গেছে। যেন কোন্ চিরকালের গরবিনীর পায়ের কাছে বসে মুগ্ধ মন অন্তরে অন্তরে সাধনা করতে থাকে। সুরময় ছন্দোময় দূরত্বই তার সকলের চেয়ে বড়ো অলংকার। এই দূরবিলাসী গাইয়েটাকে অবাস্তবের নেশাখোর বলে যদি অবজ্ঞা করো, এই গরবিনীকে যদি দোক্তা খেয়ে পানের পিক ফেলতে দেখলে তবেই তাকে সাঁচ্চা বলে মেনে নিতে পারো, তবে তা নিয়ে তর্ক করব না– সৃষ্টিক্ষেত্রে তারও একটা জায়গা আছে, কিন্তু সেই জায়গা-দখলের দলিল দেখিয়ে আমার সুরলোকের গরবিনীকে উচ্ছেদ করতে এলে আমি পেয়াদাকে বলব, “ওকে তাড়িয়ে তো কোনো লাভ নেই, কেননা, আঁচলে পানের পিকের ছোপ -লাগা মেয়েটা জায়গা পেতে পারে এমন কোনো ঘোর আধুনিক ভৈরবী রাগিণী হাল আমলের কোনো তানসেনের হাতে আজও তৈরি হয় না।’ কথার হাটে হতে পারে, কিন্তু সুরের সভায় নয়। এই সুরে যে চিরদূরত্ব সৃষ্টি করে সে অমর্ত্য লোকের দূরত্ব, তাকে অবাস্তব বলে অবজ্ঞা করলে বাস্তবীকে আমরা তাঁদের অধিকার স্বচ্ছন্দে ছেড়ে দিয়ে যাব, এবং গির্জেতে গিয়ে প্রার্থনা করব ত্রাণকর্তা এদের যেন মুক্তি দেন।

গানে আমি রচনা করেছি শ্যামা, রচনা করেছি চণ্ডালিকা। তার বিষয়টা বিশুদ্ধ স্বপ্নবস্তু নয়। তীব্র তার সুখদুঃখ, ভালোমন্দ; তার বাস্তবতা অকৃত্রিম এবং নিবিড়। কিন্তু, এগুলোকে পুলিস কেসের রিপোর্টরূপে বানানো হয় নি– গানে তার বাধা দিয়েছে– তার চার দিকে যে দূরত্ব বিস্তার করেছে তাকে পার হয়ে পৌঁছতে পারে নি যা-কিছু অবান্তর, যা অসংলগ্ন যা অনাহূত আকস্মিক। অথচ জগতে সব-কিছুর সঙ্গেই আছে অসংলগ্ন অর্থহীন আবর্জনা। তাদেরই সাক্ষ্য নিয়ে তবেই প্রমাণ করতে হবে সাহিত্যের সত্যতা, এমন বেআইনি বিধি মানতে মনে বাধছে। অন্তত গানে

এ কথা ভাবতেই পারি নে। আজকালকার য়ুরোপে হয়তো সুরের ঘাড়ে বেসুর চড়ে বসে ভূতের নৃত্য বাধিয়েছে। আমাদের আসরে এখনো এই ভূতে-পাওয়া অবস্থা পৌঁছয় নি– কেননা আমাদের পাঠশালায় য়ুরোপীয় গানের চর্চা নেই। নইলে এতদিনে বাংলায় নকল বেতালের দল কানে তালা ধরিয়ে দিতে কসুর করত না।

যাই হোক, যখন বাস্তব সাহিত্যের পাহারাওয়ালা আমাকে তাড়া করে তখন আমার পালাবার জায়গা আছে আমার গান। একেই হয়তো এখনকার সাইকলজি বলে এস্‌কেপিজ্‌ম্‌

“জনগণমনঅধিনায়ক’

পুলিনবিহারী সেনকে লিখিত

জনগণমনঅধিনায়ক গানটি কোনো উপলক্ষ্য-নিরপেক্ষ ভাবে আমি লিখেছি কিনা তুমি জিজ্ঞাসা করেছ। বুঝতে পারছি এই গানটি নিয়ে দেশের কোনো কোনো মহলে যে দুর্বাক্যের উদ্ভব হয়েছে তারই প্রসঙ্গে প্রশ্নটি তোমার মনে জেগে উঠল।... তোমার চিঠির জবাব দিচ্ছি কলহের উষ্মা বাড়াবার জন্যে নয়, ঐ গান রচনা সম্বন্ধে তোমার কৌতূহল মেটাবার জন্যে।

একদিন আমার পরলোকগত বন্ধু হেমচন্দ্র মল্লিক বিপিন পাল মহাশয়কে সঙ্গে করে একটি অনুরোধ নিয়ে আমার কাছে এসেছিলেন। তাঁদের কথা ছিল এই যে, বিশেষভাবে দুর্গামূর্তির সঙ্গে মাতৃভূমির দেবীরূপ মিলিয়ে দিয়ে তাঁরা শারদীয়া পূজার অনুষ্ঠানকে নূতনভাবে দেশে প্রবর্তিত করতে চান, তার উপযুক্ত ভক্তি ও উদ্দীপনা-মিশ্রিত স্তবের গান রচনা করবার জন্যে আমার প্রতি তাঁদের ছিল বিশেষ অনুরোধ। আমি অস্বীকার করে বলেছিলুম এ ভক্তি আমার আন্তরিক হতে পারে না; সুতরাং এতে আমার অপরাধের কারণ ঘটবে। বিষয়টা যদি কেবলমাত্র সাহিত্যক্ষেত্রের অধিকারগত হত তা হলে আমার ধর্মবিশ্বাস যাই হোক আমার পক্ষে তাতে সংকোচের কারণ থাকত না; কিন্তু ভক্তির ক্ষেত্রে, পূজার ক্ষেত্রে, অনধিকার প্রবেশ গর্হণীয়। আমার বন্ধুরা সন্তুষ্ট হন নি। আমি রচনা করেছিলুম “ভুবন-মনোমোহিনী’, এ গান পূজামণ্ডপের যোগ্য নয় সে কথা বলা বাহুল্য। অপর পক্ষে এ কথাও স্বীকার করতে হবে যে, এ গান সর্বজনীন ভারতরাষ্ট্রসভায় গাবার উপযুক্ত নয়, কেননা এ কবিতাটি একান্তভাবে হিন্দুসংস্কৃতি আশ্রয় করে রচিত। অহিন্দুর এটা সুপরিচিত ভাবে মর্মঙ্গম হবে না।

আমার ভাগ্যে অনুরূপ ঘটনা আর-একবার ঘটেছে। সে বৎসর ভারত সম্রাটের আগমনের আয়োজন চলছিল। রাজসরকারের প্রতিষ্ঠাবান আমার কোনো বন্ধু সম্রাটের জয়গান রচনার জন্যে আমাকে বিশেষ করে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। শুনে বিস্মিত হয়েছিলুম, সেই বিস্ময়ের সঙ্গে মনে উত্তাপেরও সঞ্চার হয়েছিল। তারই প্রবল প্রতিক্রিয়ার ধাক্কায় আমি জনগণমনঅধিনায়ক গানে সেই ভারতভাগ্যবিধাতার জয়ঘোষণা করেছি, পতন-অভ্যুদয়বন্ধুর পন্থায় যুগযুগধাবিত যাত্রীদের যিনি চিরসারথি, যিনি জনগণের অন্তর্যামী পথপরিচায়ক- সেই যুগ যুগান্তরের মানবভাগ্যরথচালক যে পঞ্চম বা ষষ্ঠ বা কোনো জর্জ্ই কোনোক্রমেই হতে পারেন না সে কথা রাজভক্ত বন্ধুও অনুভব করেছিলেন। কেননা তাঁর ভক্তি যতই প্রবল থাক্, বুদ্ধির অভাব ছিল না। আজ মতভেদবশত আমার প্রতি ক্রুদ্ধ ভাবটা দুশ্চিন্তার বিষয় নয়, কিন্তু বুদ্ধিভ্রংশটা দুর্লক্ষণ।

এই প্রসঙ্গে আর-এক দিনের ঘটনা মনে পড়ছে, সে বহুদিন পূর্বের কথা। তখনকার দিনে আমাদের রাষ্ট্রনায়কদের অঞ্জলি তোলা ছিল রাজপ্রাসাদের দুর্গম উচ্চ শিখর থেকে প্রসাদকণাবর্ষণের প্রত্যাশায়। একদা কোনো জায়গায় তাঁদের কয়েকজনের সান্ধ্য বৈঠক বসবার কথা ছিল। তাঁদের দূত ছিলেন আমার পরিচিত এক ব্যক্তি। আমার প্রবল অসম্মতি সত্ত্বেও তিনি বারবার করে বলতে লাগলেন আমি না গেলে আসর জমবে না। শেষ পর্যন্ত ন্যায্য অসম্মতিকেও বলবৎ রাখবার শক্তি বিধাতা আমাকে দেন নি। যেতে হল। ঠিক যাবার পূর্বক্ষণেই আমি নিম্নোদ্ধৃত গানটি রচনা করেছিলেম- "আমায় বোলো না গাহিতে' ইত্যাদি। এই গান গাবার পরে আর আসর জমল না। সভাস্থগণ খুশি হন নি।

সুধারানী সেনকে লিখিত

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

তুমি যে প্রশ্ন করেছ এ রকম অদ্ভুত প্রশ্ন পূর্বেও শুনেছি।

পতন অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থা। যুগ যুগ ধাবিত যাত্রী,

হা চিরসারথি তব রথচক্রে। মুখরিত পথ দিনরাত্রি–

শাশ্বত মানব-ইতিহাসের যুগযুগধাবিত পথিকদের রথযাত্রায় চিরসারথি ব'লে আমি চতুর্থ বা পঞ্চম জর্জের স্তব করতে পারি, এরকম অপরিমিত মূঢ়তা আমার সম্বন্ধে যাঁরা সন্দেহ করতে পারেন তাঁদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আত্মাবমাননা।

ইতি ২৯| ৩| ২৯ (?)

কলকাতা। জুন, ১৮৮৯

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত পত্র

রামগড়। ২০ জ্যেষ্ঠ, ১৩২১ ৩ জুন ১৯১৪

ভাই জ্যোতিদাদা, ...গান অনেক তৈরী হয়েচে। এখনো থামচে না–প্রায় রোজই একটা না একটা চলছে। আমার মুস্কিল এই যে সুর দিয়ে আমি সুর ভুলে যাই। দিনু কাছে থাকলে তাকে শিখিয়ে দিয়ে বেশ নিশ্চিন্ত মনে ভুলতে পারি। নিজে যদি স্বরলিপি করতে পারতুম কথাই ছিল না। দিনু মাঝে মাঝে করে, কিন্তু আমার বিশ্বাস সেগুলো বিশুদ্ধ হয় না। সুরেন বাড়ুজ্যের সঙ্গে আমার দেখাই হয় না–কাজেই আমার খাতা এবং দিনুর পেটেই সমস্ত জমা হচ্চে। এবার বিবি সেটা কতক লিখে নিয়েছে। কলকাতায়... এ-সব গান গাইতে গিয়ে দেখি কেমন ম্লান হয়ে যায়–তাই ভাবি, এগুলো হয়তো বিশেষ কারো কাজে লাগবে না।

ইন্দিরাদেবীকে লিখিত

১

১৩ জানুয়ারী ১৯৩৫

গানের কাগজে রাগ রাগিণীর নাম-নির্দেশ না থাকাই ভালো। নামের মধ্যে তর্কের হেতু থাকে, রূপের মধ্যে না। কোন্ রাগিণী গাওয়া হচ্ছে বলবার কোনো দরকার নেই। কী গাওয়া হচ্ছে সেইটেই মুখ্য কথা কেননা তার সত্যতা তার নিজের মধ্যেই চরম। নামের সত্যতা দশের মুখে, সেই দশের মধ্যে মতের মিল না থাকতে পারে। কলিযুগে শুনেছি নামেই মুক্তি, কিন্তু গান চিরকালই সত্যযুগে।

২

? ২ জুন ১৯৩৬

আমার আধুনিক গানে রাগ-তালের উল্লেখ না থাকাতে আক্ষেপ করেছিস। সাবধানের বিনাশ নেই। ওস্তাদরা জানেন আমরা গানে রূপের দোষ আছে, তার পরে যদি নামেরও ভুল হয় তা হলে দাঁড়াব কোথায়? ধূর্জটিকে দিয়ে নামকরণ করিয়ে নিস।

অষ্টমখন্ড চিঠিপত্র

প্রিয়নাথ সেনকে লিখিত

১৯১৫?

গানের কবিত্ব সম্বন্ধে যা লিখেছ সবই মানি। কেবল একটা কথা ঠিক নয়। মাথায় কবিতা সম্বন্ধে কোনো থিওরিই নেই। গান লিখি, তাতে সুর বসিয়ে গান গাই–ঐটুকুই আমার আশু দরকার–আমার আর কবিত্বের দিন নেই। পূর্বেই বলেছি ফুল চিরদিন ফোটে না–যদি ফুটত তো ফুটতই, তাগিদের কোনো দরকার হত না। এখন যা গান লিখি তা ভালো কি মন্দ সে কথা ভাববার সময়ই নেই। যদি বল তবে ছাপাই কেন, তার কারণ হচ্ছে ওগুলি আমার একান্তই অন্তরের কথা–অতএব কারও-না-কারও অন্তরের কোনো প্রয়োজন ওতে মিটতে পারে–ও গান

যার গাবার দরকার সে একদিন গেয়ে ফেলে দিলেও ক্ষতি নেই, কেননা আমার যা দরকার তা হয়েছে। যিনি গোপনে অপূর্ণ প্রয়াসের পূর্ণতা সাধন করে দেন তাঁরই পাদপীঠের তলায় এগুলি যদি বিছিয়ে দিতে পারি, এ জন্মের মতো তা হলেই আমার বকশিশ মিলে গেল; এর বেশি এখন আমার আর শক্তি নেই। এখন মূল্য আদায় করব এমন আয়োজন করব কী দিয়ে, এখন প্রসাদ পাব সেই প্রত্যাশায় বসে আছি। তোমরা সেই আর্শীবাদই আমাকে কোরো–হাটের ব্যাপারী এখন দ্বারের ভিখারী হয়ে যেন দিন কাটাতে পারে।

পথে ও পথের প্রান্তে

নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লিখিত পত্র

[শান্তিনিকেতন] ৮ অগস্ট ১৯২৯

গদ্যরচনায় আত্মশক্তির, সুতরাং আত্মপ্রকাশের, ক্ষেত্র খুবই প্রশস্ত। হয়তো ভাবীকালে সংগীতটাও বন্ধনহীন গদ্যের গূঢ়তর বন্ধনকে আশ্রয় করবে। কখনো কখনো গদ্যরচনায় সুরসংযোগ করার ইচ্ছা হয়। লিপিকা কি গানে গাওয়া যায় না ভাবছ?

কোপেনহেগেন। ৮ অগস্ট ১৯৩০

য়ুরোপের সংগীত প্রকাণ্ড এবং প্রবল এবং বিচিত্র, মানুষের বিজয়রথের উপর থেকে বেজে উঠছে। ধ্বনিটা দিগ্‌দিগন্তের বক্ষস্থল কাঁপিয়ে তুলছে। বলে উঠতেই হয়-বাহবা! কিন্তু, আমাদের রাখালী বাঁশিতে যে রাগিণী বাজছে সে আমার একলার মনকে ডাক দেয় একলার দিকে সেই পথ দিয়ে যে পথে পড়েছে বাঁশবনের ছায়া, চলেছে জলভরা কলসী নিয়ে গ্রামের মেয়ে, ঘুঘু ডাকছে আমগাছের ডালে, আর দূর থেকে শোনা যাচ্ছে মাঝিদের সারিগান-মন উতলা করে দেয়, চোখটা ঝাপসা করে দেয় একটুখানি অকারণ চোখের জলে। অত্যন্ত সাদাসিধে, সেইজন্যে অত্যন্ত সহজে মনের আঙিনায় এসে আঁচল পেতে বসে।

নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লিখিত পত্র

শান্তিনিকেতন ১১। ১২। ৩৮

...সম্প্রতি বউমা স্থির করেছিল মায়ার খেলা নৃত্যাভিনয় করতে হবে। তাই তার পুনঃসংস্কারে লেগেছি, যেখানে তার অভাব ছিল পূরণ করচি কাঁচা ছিল শোধন করচি–গানের পরে গান লেখা চলচে এক একদিনে চারটে পাঁচটা। যৌবনের তরঙ্গে মন দোদুল্যমান–জীর্ণ শরীরটাকে কোথায় কোথায় দূরে ভাসিয়ে দিয়েছে। গানের সুরে যে রকম সৃষ্টির বদল করে দেয় এমন আর কিছুতে নয়। ঘোর শীতের সময় আমার তরুণ জন্ম রাগিণীলোকে অতীতের সমুদ্রপার থেকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে বসন্তের দুর্দান্ত হাওয়া–মনের মধ্যে কূজন চলচে, গুঞ্জন চলচে–যে-সব লোক বাইরে থেকে কাজের বা অকাজের হাওয়া নিয়ে আসে তাদের মনে হয় বিদেশী লোক–কেননা তাদের মধ্যে সুরের স্পর্শ একটুও নেই। স্বর-সাধনায় উত্তরসাধিকা – কিন্তু মন্দভাগ্য আমি–কে কোথায়। – পত্র ৪৫১, দেশ ৩ চৈত্র ১৩৬৮, পৃ: ৫৯৬

দিলীপকুমার রায়কে লিখিত

১

১৮ অক্টোবর ১৯২৯

গীতাঞ্জলির কয়েকটি গানের ছন্দ সম্বন্ধে কৈফিয়ত চেয়েছ। গোড়াতেই বলে রাখা দরকার– গীতাঞ্জলিতে এমন অনেক কবিতা আছে যার ছন্দোরক্ষার বরাত দেওয়া হয়েছে গানের সুরের ‘পরে। অতএব, যে পাঠকের ছন্দের কান আছে তিনি গানের খাতিরে এর মাত্রা কম-বেশি নিজেই দুরস্ত করে নিয়ে পড়তে পারেন, যাঁর নেই তাঁকে ধৈর্য অবলম্বন করতে হবে।

১। ‘নব নব রূপে এসো প্রাণে’–এই গানের অন্তিম পদগুলির কেবল অন্তিম দুটি অক্ষরের দীর্ঘ হ্রস্ব স্বরের সম্মান স্বীকৃত হয়েছে। যথা ‘প্রাণে’ ‘গানে’ ইত্যাদি। একটিমাত্র পদে তার ব্যতিক্রম আছে। ‘এসো দুঃখে সুখে এসো মর্মে’–এখানে ‘সুখে’র একার’কে অবাঙালি রীতিতে দীর্ঘ করা হয়েছে। ‘সৌখ্যে’ কথাটা দিলে বলবার কিছু থাকত না, তবু সেটাতে রাজি হই নি। মানুষ চাপা দেওয়ার চেয়ে মোটর ভাঙা ভালো।

২। ‘অমল ধবল পা-লে লেগেছে মন্দ-মধুর হাওয়া’–এ গানে গানই মুখ্য, কাব্য গৌণ। অতএব তালকে সেলাম ঠুকে ছন্দকে পিছিয়ে থাকতে হল। যদি বলো পাঠকেরা তো শ্রোতা নয়, তারা মাফ করবে কেন। হয়তো করবে না–কবি জোড়হাত করে বলবে, ‘তাল-দ্বারা ছন্দ রাখিলাম, ত্রুটি মার্জনা করিবেন।’

৩। ৩৪ নম্বরটাও গান।[১] তবুও এর সম্বন্ধে বিশেষ বক্তব্য হচ্ছে এই যে, যে ছন্দগুলি বাংলার প্রাকৃত ছন্দ, অক্ষর গণনা করে তাদের মাত্রা নয়।...

৪। ‘নিভৃত প্রাণের দেবতা’–এই গানের ছন্দ তুমি কী নিয়মে পড় আমি ঠিক বুঝতে পারছি নে। ‘দেবতা শব্দের পরে একটা দীর্ঘ যতি আছে, সেটা কি রাখ না? যদি সেই যতিকে মান্য করে থাক তা হলে দেখবে ‘দেবতা’ এবং ‘খোলো দ্বার’ মাত্রায় অসমান হয় নি। এ-সব ধ্বনিগত তর্ক মোকাবিলায় মীমাংসা করাই সহজ। লিখিত বাক্যের দ্বারা এর শেষ সিদ্ধান্তে পৌঁছনো সম্ভব হবে কিনা জানি নে। ছাপাখানা-শাসিত সাহিত্যে ছন্দোবিলাসী কবির এই এক মুশকিল– নিজের কণ্ঠ স্তব্ধ, পরের কণ্ঠের করুণার উপর নির্ভর। সেইজন্যেই আমাকে সম্প্রতি এমন কথা

শুনতে হচ্ছে যে, আমি ছন্দ ভেঙে থাকি... আকাশের দিকে চেয়ে বলি–‘চতুরানন্, কোন্ কানওয়ালাদের’ পরে এক বিচারের ভার।’

৫। ‘আজি গন্ধবিধুর সমীরণে’ –কবিতাটি সহজ নিয়মেই পড়া উচিত। অবশ্য, এর পঠিত ছন্দে ও গীত ছন্দে প্রভেদ আছে।

৬। ‘জনগণমনঅধিনায়ক’ গানটায় যে মাত্রাধিক্যের কথা বলেছ সেটা অন্যায় বল নি। ঐ বাহুল্যের জন্যে ‘পঞ্জাব’ শব্দের প্রথম সিলেব্‌লটাকে দ্বিতীয় পদের গেটের বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখি-

পন্। জাব সিন্ধু গুজরাট মরাঠা ইত্যাদি।

‘পঞ্জাব’কে ‘পঞ্জব’ করে নামটার আকার খর্ব করতে সাহস হয় নি, ওটা দীর্ঘকায়াদের দেশ। ছন্দের অতিরিক্ত অংশের জন্যে একটু তফাতে আসন পেতে দেওয়া রীতি বা গীতি বিরুদ্ধ নয়।

১ – ‘আমার মিলন লাগি তুমি আসছ কবে থেকে’ ।

২

১০ নভেম্বর ১৯২৯

১। ‘আবার এরা ঘিরেছে মোর মন’–এই পঙ্‌ক্তির ছন্দোমাত্রার সঙ্গে ‘দাহ আবার বেড়ে ওঠে ক্রমে’র মাত্রার অসাম্য ঘটেছে এই তোমার মত। ‘ক্রমে’ শব্দটার ‘ক্র’র উপর যদি যথোচিত ঝোঁক দাও তা হলে হিসাবের গোল থাকে না। বেড়ে ওঠেক্‌রমে’–বস্তুত সংস্কৃত ছন্দের নিয়মে ‘ক্র’ পরে থাকাতে ‘ওঠে’র ‘এ’ স্বরবর্ণে মাত্রা বেড়ে ওঠা উচিত। তুমি বলতে পারো আমরা সাধারণত শব্দের প্রথমবর্ণস্থিত ‘র’ফলাকে দুই মাত্রা দিতে কৃপণতা করি। ‘আক্রমণ’ শব্দের ‘ক্র’কে তার প্রাপ্য মাত্রা দিই, কিন্তু ‘ওঠে ক্রমে’র ‘ক্র’ হ্রস্বমাত্রায় খর্ব করে থাকি। আমি সুযোগ বুঝে বিকল্পে দুই রকম নিয়মই চালাই।

২। ভক্‌ত। সেথায়। খোলো দ্বা। ০০র্। –এইরকম ভাগে কোনো দোষ নেই। কিন্তু তুমি যে ভাগ করেছিলে। র ০০। এটা চলে না; যেহেতু ‘র’ হসন্ত বর্ণ, ওর পরে স্বরবর্ণ নেই, অতএব টানব কাকে।

৩। ‘জনগণ’ গান যখন লিখেছিলেম তখন ‘মারাঠা’ বানান করি নি। মারাঠিরাও প্রথম বর্ণে আকার দেয় না। আমার ছিল ‘মরাঠা’। তার পরে যাঁরা শোধন করেছেন তাঁরাই নিরাকারকে সাকার করে তুলেছেন, আমার চোখে পড়ে নি।

৩

যেখানে আর্টের উৎকর্ষ সেখানে গুণী ও গুণ’দের ভাবের উচ্চশিখর। সেখানে সকলেই অনায়াসে পৌঁছবে এমন আশা করা যায় না–সেইখানেই নানা রঙের রসের মেঘ জমে ওঠে–সেই দুর্গম উচ্চতায় মেঘ জমে বলেই তার বর্ষণের দ্বারা নীচের মাটি উর্বরা হয়ে ওঠে। অসাধারণের সঙ্গে সাধারণের যোগ এমনি করেই হয়, উপরকে নীচে বেঁধে রেখে দিলে হয় না। যারা রসের সৃষ্টিকর্তা তাদের উপর যদি হাটের ফর্মাশ চালানো যায়, তা হলেই সর্বনাশ ঘটে। ফর্মাশ তাদের অন্তর্যামীর কাছ থেকে। সেই ফর্মাশ-অনুসারে যদি তারা চিরকালের জিনিস তৈরি করতে পারে, তা হলেই আপনিই তার উপরে সর্বলোকের অধিকার হবে। কিন্তু, সকলের অধিকার হলেই যে হাতে হাতে সকলে অধিকার লাভ করতে পারে, ভালো জিনিস এত সস্তা নয়। বসন্তে যে ফুল ফোটে সে ফুল তো সকলেরই জন্যে, কিন্তু সকলেই তার মর্যাদা সমান বোঝে এ কথা কেমন করে বলব? বসন্তে আমের মুকুলে অনেকেরই মন সায় দিলে না ব’লেই কি তাকে দোষ দেব? বলব ‘তুমি কুমড়ো হলে না কেন’? বলব কি–গরিবের দেশে বকুল ফুল ফোটানো বিড়ম্বনা–সব ফুলেরই বেগুনের ক্ষেত হয়ে ওঠা নৈতিক কর্তব্য? বকুল ফুলের দিকে যে অরসিক চেয়ে দেখে না, তার জন্যে যুগ-যুগান্তর ধরেই বকুল ফুল যেন অপেক্ষা করে থাকে; মনের খেদে এবং লোকহিতৈষীদের তাড়নায় সে যেন কচুবন হয়ে ওঠাবার চেষ্টা না করে। গ্রীসে সর্বসাধারণের জন্যেই সফোক্লীস এস্কিলাসের নাটক রচিত ও অভিনীত হয়েছিল, কেবল বিশিষ্ট কতিপয়ের জন্যে নয়। সেখানকার সাধারণের ভাগ্য ভালো যে, তারা কোনো গ্রীসীয় দাশুরায়ের শরণাপন্ন হয় নি। সাধারণকে শ্রদ্ধাপূর্বক ভালো জিনিস দিতে থাকলে ক্রমশই তার মন ভালো জিনিস গ্রহণ করবার উপযুক্ত হয়ে ওঠে। কবিকে আমরা যেন এই কথাই বলি–‘তোমার যা সর্বশ্রেষ্ঠ তাই যেন তুমি নির্বিচারে রচনা করতে পারো।’কবি যদি সফল হয় তবে সাধারণকে বলব–‘যে জিনিস শ্রেষ্ঠ তুমি যেন সেটি গ্রহণ করতে পারো।’যারা রূপকার, যারা রসস্রষ্টা, তারা আর্টের

সৃষ্টি সম্বন্ধে সত্য ও অসত্য, ভালো ও মন্দ, এই দুটি মাত্র শ্রেণীভেদই জানে; বিশিষ্ট কতিপয়ের পথ্য ও ইতর-সাধারণের পথ্য বলে কোনো ভেদ তাদের সামনে নেই। শেক্‌সপীয়র সর্বসাধারণের কবি বলে একটা জনশ্রুতি প্রচলিত আছে, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি হ্যাম্‌লেট কি সর্বসাধারণের নাটক? কালিদাস কোন্ শ্রেণীর কবি জানি নে, কিন্তু তাঁকে আপামর সাধারণ সকলেই কবি বলে প্রশংসা করে থাকে। জিজ্ঞাসা করি–যদি মেঘদূত গ্রামের দশজনকে ডেকে শোনানো যায়, তা হলে কি সেই অত্যাচার ফৌজদারি দণ্ডবিধির আমলে আসতে পারে না? সর্বসাধারণের মোক্তার যদি কালিদাসের আমলে বিক্রমাদিত্যের সিংহাসন বেদখল করে কালিদাসকে ফর্মাশে বাধ্য করতেন, তা হলে মেঘদূতের জায়গায় যে পদ্যপাঠ তৈরি হত, মহাকাল কি সেটা সহ্য করতেন? আমাকে যদি জিজ্ঞাসা করো এ সমস্যার মীমাংসা কী, আমি বলব–মেঘদূত গ্রামের দশজনের জন্যেই, কিন্তু যাতে সেই দশজনের মেঘদূত নিজের অধিকার উপলব্ধি করতে পারে, তারই দায়িত্ব দশোত্তরবর্গের লোকের। যে দশজন মেঘদূত বোঝে না, তাদের খাতিরে মেঘদূতের বদলে পদ্ম-ভ্রমরের পাঁচালিতে সস্তা অনুপ্রাসের চক্‌মকি ঠোকা কবির দায়িত্ব নয়। কৃত্রিমতা সকল কবি সকল আর্টিস্টের পক্ষেই দূষণীয়, কিন্তু যা সকলেই অনায়াসে বোঝে সেটাই অকৃত্রিম আর যা বুঝতে চিত্তবৃত্তির উৎকর্ষসাধনের দরকার সেটাই কৃত্রিম এ ধরনের কথা অশ্রদ্ধেয়।

৪

২৯ জুলাই ১৯৩৭

কীর্তনগীত আমি অনেক কাল থেকেই ভালোবাসি। ওর মধ্যে ভাবপ্রকাশের যে নিবিড় ও গভীর নাট্যশক্তি আছে সে আর-কোনো সংগীতে এমন সহজভাবে আছে বলে আমি জানি নে। সাহিত্যের ভূমিতে ওর উৎপত্তি, তার মধ্যেই ওর শিকড়, কিন্তু ও শাখায় প্রশাখায় ফলে ফুলে পল্লবে সংগীতের আকাশে স্বকীয় মহিমা অধিকার করেছে। কীর্তনসংগীতে বাঙালির এই অনন্যতন্ত্র প্রতিভায় আমি গৌরব অনুভব করি।... কখনো কখনো কীর্তনে ভৈরোঁ প্রভৃতি ভোরাই সুরেরও আভাস লাগে, কিন্তু তার মেজাজ গেছে বদলে–রাগরাগিণীর রূপের প্রতি তার মন নেই, ভাবের রসের প্রতিই তার ঝোঁক। আমি কল্পনা করতে পারি নে হিন্দুস্থানী গাইয়ে কীর্তন

গাইছে, এখানে বাঙালির কণ্ঠ ও ভাবার্দ্রতার দরকার করে। কিন্তু, তৎসত্ত্বেও কি বলা যায় না যে এতে সুরসমবায়ের পদ্ধতি হিন্দুস্থানী পদ্ধতির সীমা লঙঘন করে না? অর্থাৎ, য়ুরোপীয় সংগীতের সুরপর্যায় যে রকম একান্ত বিদেশী কীর্তন তো তা নয়। ওর রাগরাগিণীগুলিকে বিশেষ নাম দিয়ে হিন্দুস্থানী সংগীতের সংখ্যা বৃদ্ধি করলে উপদ্রব করা হয় না। কিন্তু, ওর প্রাণ, ওর গতি, ওর ভঙ্গি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

৫

২৯ অক্টোবর ১৯৩৭

'ছন্দা'য় তোমার 'কথা বনাম সুর' প্রবন্ধে তোমার তর্কটা খুব জোরালো হয়েছে। কিন্তু, তর্কে বিজ্ঞান বা গণিত ছাড়া আর কোনো-কিছুর মীমাংসা হতে চায় না। যদি কেউ হুংকার দিয়ে বলেন বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় আম্র বলা যেতে পারে একমাত্র ফজলিকে–যদি তার আয়তন, তার ওজন, তার আঁটির বিশালতা প্রমাণস্বেরূপে সে ব্যবহার করে–যদি বলে গুরুত্বহীন অন্য সমস্ত আমকে সংস্কৃত নামে অভিহিত করা চলবে না, বড়ো জোর গ্রাম্য ভাষায় 'আঁব' নামেই তাদের পরিচয় দেওয়া যেতে পারে–তা হলে জামাইষষ্ঠীর দিনে ফজলি আম দিয়ে তার সম্মান রক্ষা করা শ্বশুরের পক্ষে নিরাপদ হবে, কিন্তু ইতরে জনাঃ বিচিত্র আমের বিচিত্র রস সম্ভোগ ক'রে সমজদার নাম খোয়াতে কুণ্ঠিত হবে না। ওস্তাদেরা ফজলি-সংগীতের কলমের চারা বানাতে থাকুন যুগ যুগান্তর ধরে, তৎসত্ত্বেও মানুষের হৃদয়পদ্মে সৃষ্টিকর্তা ঘুমিয়ে পড়বেন না।
সুরের সঙ্গে কথার মিলন কেউ রোধ করতে পারবে না। ওরা পরস্পরকে চায়, সেই চাওয়ার মধ্যে যে প্রবল শক্তি আছে সেই শক্তিতেই সৃষ্টির শক্তিতেই সৃষ্টির প্রবর্তনা। শ্রেণীর বেড়ার মধ্যে পায়ের বেড়ির ঝংকার দিয়ে বেড়ানোকেই যে ওস্তাদ সাধনা বলে গণ্য করে, তার সঙ্গে তর্ক কোরো না; শ্রেণীর সে উপাসক, শাস্ত্রের সে বুলি-বাহক, পৃথিবীর নানা বিপদের মধ্যে সেও এক বিশেষজাতীয়–কলাবিভাগে সে ফাসিস্‌ট্।

৬

৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৮

মত বদলিয়েছি। জীবনস্মৃতি অনেক কাল পূর্বের লেখা। তার পরে বয়সও এগিয়ে চলেছে, অভিজ্ঞতাও। বৃহৎ জগতের চিন্তাধারা ও কর্মচক্র যেখানে চলছে, সেখানকার পরিচয়ও প্রশস্ততর হয়েছে। দেখেছি চিত্ত যেখানে প্রাণবান্ সেখানে সে জ্ঞানলোকে ভাবলোকে ও কর্মলোকে নিত্যনূতন প্রবর্তনার ভিতর দিয়ে প্রমাণ করছে যে, মানুষ সৃষ্টিকর্তা, কীটপতঙ্গের মতো একই শিল্পপ্যাটার্নের পুনরাবৃত্তি করছে না। আমার মনে আজ আর সন্দেহমাত্র নেই যে, কলুর বলদের মতো চোখে ঠুলি দিয়ে বাঁধা গণ্ডির মধ্যে নিরন্তর ঘুরতে থাকা সংগীতের সাহিত্যের কিংবা কোনো ললিতকলার চরম সদগতি নয়। হিন্দুস্থানী কালোয়াতের কণ্ঠব্যায়ামের তারিফ করতে রাজি আছি, এমন-কি তার রসভোগ থেকেও বঞ্চিত হতে চাই নে। কিন্তু, সেই রস চিত্তকে যদি মাদকতায় অভিভূত করে রাখে, অগ্রগামী কালের নব নব সৃষ্টিবৈচিত্র্যের পিছনে আমাদের বিহ্বলভাবে কাত করে রেখে দেয়, খাঁচার পাখির মতো যে বুলি শিখেছি তাই কেবলই আউড়িয়ে যাই এবং অবিকল আউড়িয়ে যাবার জন্যে বাহবা দাবি করি, তা হলে এই নকলনবিশি-বিধানকে সেলাম করে থাকব তার থেকে দূরে–নূতন সাধনার পথে খুঁড়িয়ে চলব সেও ভালো, কিন্তু হাজার বছর আগেকার রাস্তায় শিকল-বাধা শাগ্‌রেদি করতে পারব না। ভুল ভ্রান্তি অসম্পূর্ণতা সমস্তর ভিতর দিয়ে নবযুগবিধাতার ডাক শুনে চলতে থাকব নবসৃষ্টির কামনা নিয়ে। বাঁধা মতের প্রবীণদের কাছে গাল খাব–জীবনে তা অনেকবার খেয়েছি–কিন্তু আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্রে আমি কিছুতেই মানব না যে, আমি ভূতকালের ভূতে-পাওয়া মানুষ। আজ য়ুরোপীয় গুণীমণ্ডলীর মধ্যে এমন কেউ নেই যে বলে না যে, অজন্তার ছবি শ্রেষ্ঠ ছবি, কিন্তু তাঁদের মধ্যে এমন বেওকুফ কেই নেই যে ঐ অজন্তার ছবির উপর কেবল দাগা বুলিয়ে যাওয়াকেই শিল্পসাধনার চরম বলে মানে। তানসেনকে সেলাম করে বলব, ‘ওস্তাদজি, তোমার যে পথ আমারও সেই পথ।’অর্থাৎ, নবসৃষ্টির পথ। বাংলাদেশ একদিন সংগীতে গণ্ডিভাঙা নবজীবনের পথে চলেছিল। তার পদাবলী তার গীতকলাকে জাগিয়ে তুলেছিল দাসী করে নয়, সঙ্গিনী করে, তার গৌরব রক্ষা করে। সেই বাংলাদেশে আজ নতুন যুগের যখন ডাক পড়ল তখন সে হিন্দুস্থানী অন্তঃপুরে প্রাচীরের আড়ালে কুলরক্ষা করতে পারবে না–তখন সে জটিলার শাসন উপেক্ষা করে যুগলমিলনের পথে চরম সার্থকতা লাভ করবে। এ নিয়ে নিন্দে জাগবে, কিন্তু লজ্জা করলে চলবে না।

মত বদলিয়েছি। কতবার বদলিয়েছি তার ঠিক নেই। সৃষ্টিকর্তা যদি বার বার মত না বদলাতেন তা হলে আজকের দিনের সংগীতসভা ডাইনসরের ধ্রুপদী গর্জনে মুখরিত হত এবং

সেখানে চতুর্দন্ত ম্যামথের চতুষ্পদী নৃত্য এমন ভীষণ হত যে যারা আজ নৃত্যকলায় পালোয়ানির পক্ষপাতী তারাও দিত দৌড়। শেষ দিন পর্যন্ত যদি আমার মত বদলাবার শক্তি অকুণ্ঠিত থাকে তা হলে বুঝব এখনো বাঁচবার আশা আছে। নইলে গঙ্গাযাত্রার আয়োজন কর্তব্য। আমাদের দেশে সেই শান-বাঁধানো ঘাটেই লোকসংখ্যা সব চেয়ে বেশি।